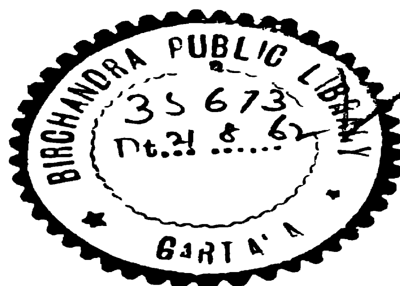
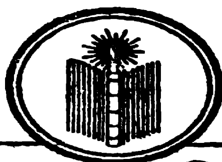
আত্ম স্মৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড



শ্রীসজনী কান্ত দাস



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও মুদ্রণ : ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

৯ ভাদ্র ১৩৬৩

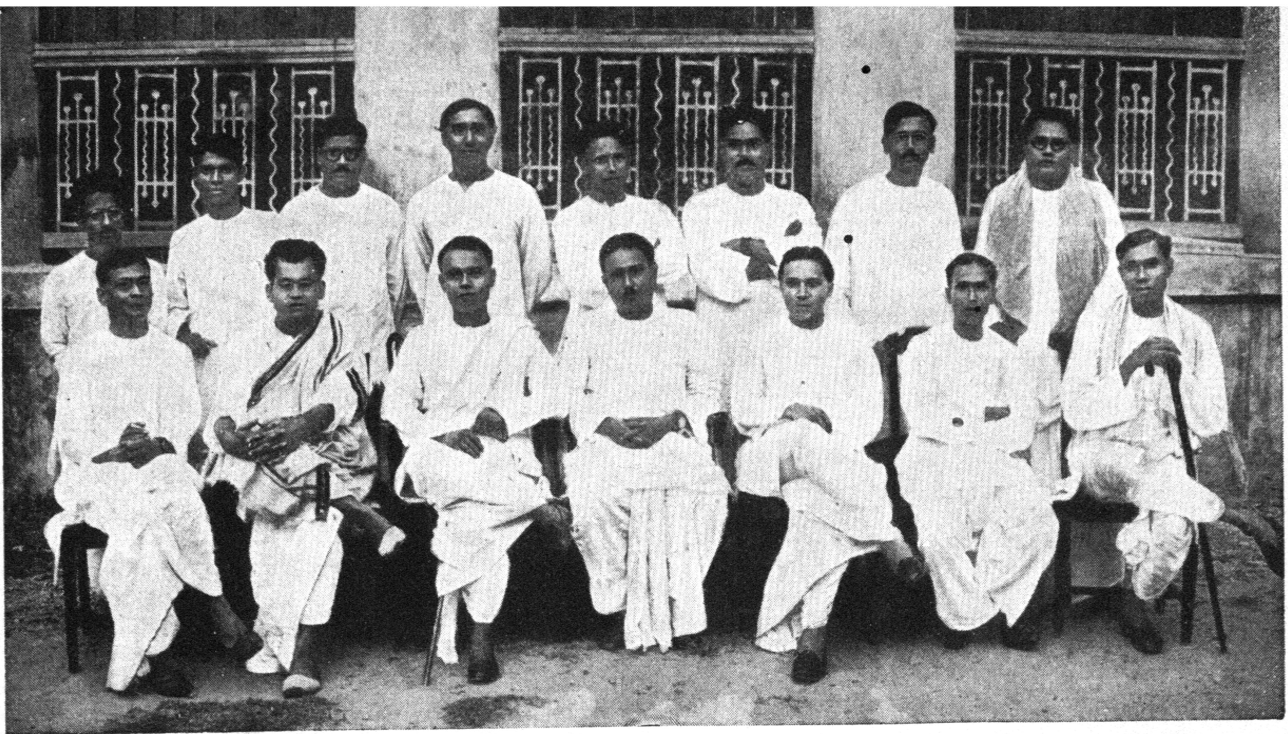
মূল্য পাঁচ টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত
এবং
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



বন্ধু, তোমার নাটকের প্লট মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
উদাসী আজিও একাকিনী কাঁদে মাঠে ;
থার্ড ক্লাস সেই র'য়ে গেল থার্ড ক্লাস—
তবে কেন ছিঁড়ে চ'লে গেলে মায়াজাল ?
বাস্তবিকার আসরে আজিও হরিকুমারেরা বসি
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতেছে নাকী সুরে,
শেষ না হইতে, দিবা, তুমি কেন ছেড়ে গেলে দিবাকরী,
বলিয়া গেলে না, কোথা থাকে তব ত্রিলোচন কবিরাজ !
বন্ধু, তুমি তো দেখে গেলে নাকো মানময়ী গার্ল-স্কুলে
বদনের মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে হাজারে হাজারে আসে,
ঘৃতকুম্ভটি প্রাঙ্গণে আছে প'ড়ে—
দধিকর্দমে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ ।

। সূচী ।



দাঁড়াইয়া—(বাম হইতে) নীরদ চৌধুরী, গোপাল হালদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, হরিপদ রায়, গিরিধর চক্রবর্ত্তী।

বসিয়া—(বাম হইতে) সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রথীন হালদার, মোহিতলাল মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনকালী রায়।

আত্মস্মৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বিষাদ-যোগ

দ্বিতীয় খণ্ডের ধরতাই-স্বরূপ প্রথম খণ্ডের শেষ (উনবিংশ) তরঙ্গ হইতে একটু উদ্ধৃতি প্রয়োজন :

> ১৩৩৪ সালের আশ্বিনে মাসিকের আরম্ভ হইতে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস কালকে 'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোগপর্ব বলিতে পারি। সাপ্তাহিকের পুরাতন রথী ও পদাতিকেরা তো ছিলেনই, নানা দিগ্‌দেশ হইতে শুধু আদর্শের আকর্ষণেই আরও অনেকে একে একে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন—কুরুক্ষেত্রের আয়োজন ক্রমেই জমজমাট হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই উদ্যোগপর্বেই ভীষ্মপর্বের বিষাদ-যোগ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিপক্ষীয় দলের সমর্থকদের ষড়যন্ত্রে বা চক্রান্তে আমাদের একমাত্র ভরসা ও আদর্শ স্বয়ং জনার্দন সাময়িকভাবে 'শনিবারের চিঠি'কে নয়, একমাত্র আমাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বিরূপতাজনিত বিষাদ-যোগ দিয়াই 'আত্মস্মৃতি'র দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনাবিল প্রীতি যে-ব্যাপারের মূলে, তাহাই ঘটনাচক্রে তাঁহার চোখে বিপরীতরূপে প্রতিভাত হইবার কাহিনী আমার পক্ষে অতিশয় মর্মান্তিক।

১৩৩৪ শ্রাবণ মাসে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্র রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' গীতিনাট্যখানিকে পুরোভাগে রাখিয়া প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

ইহাতে সন্নিবিষ্ট বিচিত্র সুরের সুমধুর সঙ্গীতগুলি গান হইয়া কানের ভিতর দিয়া আমার মর্মে তখনও প্রবেশ করে নাই। 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায় নিতান্ত কবিতারূপে সেগুলিকে পড়িয়াছিলাম; পড়িতে ভাল লাগে নাই, শ্রুতিমধুরও ঠেকে নাই। মনে হইয়াছিল, ভাবের দিক দিয়া তাহা পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ এবং অক্ষম অনুকরণ, ছন্দ ও মিল শিথিল। একদিন নিরবচ্ছিন্ন অবসর পাইয়া সেই কথাগুলিই প্রবন্ধের আকারে লিখিয়া ফেলিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'কল্পনা' 'খেয়া' প্রভৃতি এবং প্রচলিত পুরাতন গানগুলি হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া 'নটরাজে'র পংক্তির সহিত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে, 'নটরাজ' রবীন্দ্র-প্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, ২৪।১ ঘোষ লেনের বাসায় এবং বিপিনবাবুর চায়ের দোকানে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে একাধিকবার পড়াও হইল; সকলেই তারিফ করিলেন, কোনও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। খেয়ালের বশে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু উহা প্রকাশ করিবার তাগিদ নিজের মনে অনুভব করি নাই। স্বভাবতই অনিচ্ছুক চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, লেখাটি আমার দপ্তরেই পড়িয়া থাকে। পরে বিপিনবাবুর চায়ের দোকানের আড্ডার বন্ধু "শচীন বাঙাল" অধুনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম সমঝদার, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরেজী-বাংলা একাধিক গ্রন্থের লেখক ডক্টর শচীন সেন একদিন জোর করিয়াই প্রবন্ধটি লইয়া যান, বলেন, তুই যখন ছাপবি না, ওটা আমার "অরসিক রায়" বেনামে 'আত্মশক্তি'তে ছাপিয়ে দেব। তিনি তখন 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকের সহিত যুক্ত। আমার অপরাধ হইয়াছিল লেখকসুলভ মোহের বশে "না" বলিতে পারি নাই। পরবর্তী ভাদ্র ও আশ্বিনের পর পর পাঁচ সংখ্যা 'আত্মশক্তি'তে যখন আমার "নটরাজ" প্রবন্ধ বাহির হয়, তখন বিশেষ উৎসাহ অনুভব করি নাই এবং শেষ পর্যন্ত সে ব্যাপার স্মরণেও ছিল না। এমন

উদাসীন ছিলাম যে, প্রবন্ধের "কপি" সংগ্রহ করিয়া রাখার আবশ্যকতাও অনুভব করি নাই। চিন্তালেশহীন অবোধ বালক ঢিলটি নিক্ষেপ করিয়াই খুশী ছিল, আম পড়িল কি পাখি মরিল—সে সম্বন্ধে ভাবিয়াও দেখে নাই। সে চকিত হইয়া উঠিল তখনই, যখন ঢিলটি ফিরিয়া তাহারই গায়ে আসিয়া লাগিল।

অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'র আন্দোলন তরুণদের সমর্থক রবীন্দ্র-পরিবেশভুক্ত কয়েকজন প্রধানকে আমাদের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন দুই অধ্যাপক—অপূর্বকুমার চন্দ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই দলে ছিলেন।* 'শনিবারের চিঠি'র অপরাধে রবীন্দ্রপৃষ্ঠপোষিত সদ্য-প্রকাশিত 'বিচিত্রা'র প্রতি পুরাতন 'প্রবাসী'কে ঈর্ষাদুষ্ট প্রমাণ করিবার চেষ্টাও গোপনে গোপনে চলিয়াছিল, অরসিক রায়ের "নটরাজ" প্রবন্ধটিকে তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতে চেষ্টা করিলেন। শেষে স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্র আমাকে পর পর দুই দিন পাকড়াও করিয়া বিশ্বভারতী আপিসে লইয়া গেলেন এবং স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্যের সহিত জ্ঞাপন করিলেন, কাজটা আমি ভাল করি নাই। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আমার গহন মনে কি কি গূঢ় উদ্দেশ্য গোপন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্দ্র তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম, নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম আমার অসাবধানে-ফেলা-জল অনেক নীচ পর্যন্ত গড়াইয়াছে। আমি সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সরাসরি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন সাব্যস্ত করিলাম। সোজাসুজি সামনে যাইবার সাহস হইল না, একখানি দীর্ঘ পত্রযোগে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম। পত্রটি অংশত এই :—

* 'রবীন্দ্রজীবনী'—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সং, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩২।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

শ্রীচরণকমলেষু,

সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র কয়েক সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আপনার 'নটরাজ' গীতিনাট্যখানির সমালোচনাটি লইয়া কিছুদিন যাবৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে একটু আন্দোলন চলিতেছিল পরম্পরায় তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার কিছু জবাবদিহি করিবার আছে কি না ভাবিয়া তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া এতকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই বা পত্র লিখি নাই। কিন্তু গত পরশু ও কাল প্রশান্তবাবুর সহিত দুই-একটি কথাবার্তার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, অবিলম্বে আপনার নিকট আমার নিজের দিকটা খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক, নতুবা আমার সহিত অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জড়াইয়া অকারণে তাহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা চলিতে পারে।

সমালোচনাটি আমার লেখা। অরসিক রায়ের নামের আড়ালে আমি যে-কারণেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, ভাবিয়াছিলাম ওই নামটিই ওই প্রবন্ধটি সম্পর্কে অন্য আলোচনার অবকাশ দিবে না। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি বাংলা দেশে লেখার দ্বারা লেখার বিচার হয় না, লেখকের কুলজীকোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়। এ দেশের লোকেরা সত্য-অনুসন্ধিৎসু, গোপনতম সত্যটি তাহারা টানিয়া বাহির করিবেই ; কারণ কোন বিশেষ বস্তুর উপর স্বকপোলকল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্যটি আরোপ করিতে না পারিলে তাহাদের সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।...

আমি শুনিয়াছি আপনি এই লেখাটি সম্পর্কে একাধিক পত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিতে নাকি লেখা আছে আমি অপরের প্ররোচনায় প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম,...ইহাও কেহ বলিয়া থাকিবেন যে, যেহেতু আমি 'প্রবাসী' অফিসের বেতনভোগী কর্মচারী এবং যেহেতু 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই হেতু শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দিয়া এই প্রবন্ধ লিখাইয়া 'বিচিত্রা'কে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাকে জানাইতেছি যে আমার লিখিত উক্ত সমালোচনাটিতে সত্য, মিথ্যা, বাতুলতা, প্রলাপ,

ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ আমার, অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র প্ররোচনা বা অংশ নাই।...

যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বেনামীতে 'মেঘনাদ বধে'র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, যিনি বয়সের হিসাব ভুলিয়া গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ [বড় দাদা], চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত সত্যের খাতিরে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী নৈতিক ভয় দূর করিবার জন্য "সত্যের আহ্বান" করিয়াছিলেন, তিনিই যদি আজ কাহাকেও স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া গোপন অনুসন্ধান ও হীন চরবৃত্তির প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।...বাংলা দেশের মানুষকে আপনি ৬৭ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন, আমার ভয় হয়, পাছে যাহারা নিরন্তর আপনাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের ফেরে পড়িয়া আপনি ভুল করেন।...

আমার এই ২৬ বৎসরের জীবনে মানুষকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাই নাই, সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি বহুবর্ষ যাবৎ এই পৃথিবীর হালচাল দেখিয়া আসিতেছেন, আপনি ভুল করিবেন না, এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি। আপনার অনেক ভক্ত আছে। কেহ কাছে থাকিতে পায়, কেহ পায় না। দূরে যাহারা থাকে তাহাদের ভক্তি বিন্দুমাত্র কম নহে। অন্তত, আমার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ এবং এতকাল খোরাকও রবীন্দ্রনাথই যোগাইতেছেন। আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন তাহা হইলেই আমার চরমতম শাস্তি ঘটিবে। আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া অন্তত সেই শাস্তিটুকু হইতে আমাকে রেহাই দিবেন।—প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

বেলা তিনটা নাগাদ 'প্রবাসী'-অফিসের পিওন-বুক-ভুক্ত করিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চিঠিটি পাঠাইয়া দিলাম। কবি প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের সম্বর্ধনা গ্রহণের জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমার পত্র এই অবস্থায় তাঁহাকে অতিশয় উত্ত্যক্ত করিয়া থাকিবে, কারণ তিনি বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব লিখিয়া তখনই ডাকে দেওয়ান। রবীন্দ্রনাথের

সামান্য চিঠিপত্রেও কখনও সাধু-চলিত ভাষার সংমিশ্রণ দেখি নাই; কিন্তু সেদিন তিনি এমনি রাগিয়া গিয়াছিলেন যে, গুরুচণ্ডালী দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার পত্রটি হুবহু এই:

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আত্মশক্তিতে কয়েক সংখ্যা ধরে নটরাজের যে সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ প্রকাশ হয়েছিল সেটা তোমার লেখা বলে আমি জানতুম না বা সন্দেহ করি নি। বাইরে থেকে চিঠি পাই। তার উত্তরে লিখি, যাঁদের আমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করি তাঁরা আমার নিন্দা-প্রচারে আনন্দ বোধ করেন, এত বার বার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি যে ইহাতে আমি বিস্মিত হই না এবং এ কথা লইয়া আলোচনা করিতে আমার লেশমাত্র ইচ্ছা নাই।

নিঃসন্দেহ আমার দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় মন্দ লেখা বিস্তর আছে। সেইগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া ইতিপূর্বে তুমি কখনো লেখ নাই। সম্প্রতি যদি আমার কোনো লেখা মন্দ হইয়া থাকে সেটা কি পাঁচখানা কাগজ ভরাইবার মতো এতই অসহ্য মন্দ? এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয়ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মশক্তিতে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমার পক্ষে সহজ কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

মেঘনাদ বধের সমালোচনা যখন লিখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫। তা ছাড়া তখন মাইকেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিম ও মহাত্মাজির সঙ্গে আমার যে দ্বন্দ্ব তাহা নৈতিক; তাহা কর্তব্যের বিশেষ প্ররোচনায়। বঙ্কিমের কোনো গ্রন্থের সাহিত্যিক সমালোচনা যদি করিতাম তবে প্রধান ঝোঁক দিতাম তাঁহার গুণের উপর, ত্রুটির উপর নহে, কারণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধাই পজিটিভ গুণকে বড় করিয়া দেখে। এই জন্যেই রাজসিংহের সমালোচনা করিয়াছিলাম।

এত কথা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি তোমার কথা জানাইয়াছ বলিয়াই লিখিতে হইল। ইতি ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুঃখের বিষয়, এই চিঠিখানি লিখিয়াও তাঁহার সমস্ত রাগটা পড়িল না। এই হতভাগ্যের অপরাধে সমগ্র দেশের উপর তাঁহার রাগের শেষটুকু বর্ষিত হইল, আমার পক্ষে সর্বনাশা ওই ১৩ই ডিসেম্বর (১৯২৭) অপরাহ্ণে। রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মধুর সম্বর্ধনার উত্তরে সভাস্থ সকলের এবং পরদিন দেশবাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটু বেসুরা গাহিলেন। উহার প্রকৃত মর্ম একমাত্র আমিই বুঝিলাম, অন্য সকলের নিকট অজ্ঞাত রহিল। তিনি বলিলেন :

দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে, কাছের মানুষের কোনো দাবী আমি রক্ষা করি, কোনো দাবী আমি রক্ষা করতে অক্ষম, কেউ বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান, কেউ বা পান না, এই সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হ'য়ে ওঠে; নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগ-দ্বেষের ধূলিনিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি-বিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্ত কালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আলপিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে, তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এই রকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে-খর্বতা তা আমি অনেক কাল থেকে অনুভব করে এসেচি। দেশের লোকের সভায় এরই সঙ্কোচ আমি এড়াতে

পারিনে।...এদেশে, এমন-কি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়,—জানি যে, কত কি ঘরাও কারণে ও ঘর-গড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

১৪ই ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই ভাষণ পড়িয়া ও বেলা দশটায় রবীন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া আমি মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আশা

১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৭-এর পত্রে আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড অভিমান প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি তিনি বিরূপ হন নাই। ওই ১৩ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র-পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ তিনি এই বলিয়া শেষ করিয়াছিলেন—

> সৃষ্টিশক্তির যখন দৈন্য ঘটে তখনি মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃত-রস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালী কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেচেন "খুন"। পুরাতন "রক্ত" শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হ'লে বুঝব সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক্ লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে। সাহিত্যে এই রকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিউমার্কেটে "খুন" ফরমাস করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক।

সুনীতিকুমারের নিকট লিখিত যে পত্রে ('আত্মস্মৃতি', ১ম খণ্ড পৃ. ২৫৭) রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র "ক্ষমতার অসামান্যতা অনুভব" করার কথা বলিয়াছিলেন তাহাও ১৯২৮ সনের ৮ই জানুয়ারি (২৩ পৌষ, ১৩৩৪) লিখিত। প্রথম খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ৪ঠা মার্চ, ১৯২৮ (২০ ফাল্গুন, ১৩৩৪) তারিখের পত্রও

'শনিবারের চিঠি' সম্বন্ধে তাঁহার অ-বিরূপতার আর একটি প্রমাণ। বস্তুত, "নটরাজ" লইয়া 'আত্মশক্তি'তে আমার নির্বোধ হঠকারিতা আমার প্রতি ব্যক্তিগত অভিমানেরই কারণ হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ বা অভিমান 'শনিবারের চিঠি'কে স্পর্শ করে নাই। 'আত্মশক্তি'-ঘটিত দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে আমি তাঁহাকে আর একবার উত্ত্যক্ত করিতে ছাড়ি নাই। 'প্রবাসী'র অল্প মাহিনার চাকুরি আমার আত্মীয়-স্বজনের পছন্দমাফিক ছিল না। তাঁহারা বলিতেন, পরমার্থিক উন্নতি যতই হউক, ওই চাকুরিতে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাঁহাদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে পরে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আসলে এইরূপ ব্যবহার একমাত্র 'প্রবাসী'রই বৈশিষ্ট্য নয়, বাংলা দেশে সাময়িকপত্র-সেবার সাধারণ পুরস্কারই এই। যাহা হউক, ওই সময় কলিকাতা মহাকরণিকে বাংলা অনুবাদক-পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনদৃষ্টে আত্মীয়েরা আমাকে আর স্বস্তিতে থাকিতে দিলেন না। দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্র প্রয়োজন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিবেদন করা মাত্রই দীর্ঘ এবং সুদীর্ঘ পরিচয়-পত্র দিলেন। বন্ধুরা বলিলেন, এতৎসহ রবীন্দ্রনাথের কলম হইতে সামান্য কিছু যুক্ত হইলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে এক পত্রাঘাত করিয়া বসিলাম। জানাইলাম, ১৬ই ফেব্রুয়ারির (১৯২৮) মধ্যে প্রশংসাপত্র আমার হস্তগত হওয়া চাই। ১৫ই তারিখে নিষ্পত্র চার ছত্র ইংরেজী রচনা রবীন্দ্রনাথের সহি-সম্বলিত হইয়া আমার নিকট পৌঁছিল—

Santiniketan, Feb. 13, 1928

I know Babu Sajanikanta Das and I can certify that he is an author whose mastery of Bengali language and knowledge of our literature is remarkable.

Rabindranath Tagore

কবির সহৃদয়তায় ও বদান্যতায় মরমে মরিয়া গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়া ফেলিলাম, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রের অপমান ঘটিতে দিব না, সরকারী ভাল চাকুরি মাথায় থাক্। সুতরাং ১৯২৮ সনের দরখাস্ত আজও পর্যন্ত অ-প্রেরিতই রহিয়া গিয়াছে, 'প্রবাসী'র মায়া কাটাইব কাটাইব করিয়াও তখন কাটাইতে পারি নাই। এই আত্মঘাতী সঙ্কল্পের দ্বারা আমি যে কবিকে কতখানি সম্মান করিলাম তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না। তাঁহার সহিত আমার দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ রহিয়াই গেল, এদিকে আত্মীয়েরাও আমার প্রতি বিরূপ হইলেন।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে আমার গ্রহ-সংস্থানে রবির কুপিত দৃষ্টি সত্ত্বেও অন্যান্য নানা দিক দিয়া ভাগ্যকে সুপ্রসন্নই বলিতে হইবে। জীবনের এতকাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বৈচিত্র্যহীন শ্যামল সমতল ক্ষেত্রেই প্রধানত আমার বিহার ছিল; বিদেশ বলিতে একবার মাত্র কাশী গিয়াছিলাম। অবশ্য মানভূমকে আমি বঙ্গবহির্ভূত বলিয়া কখনই ধরি না। এই বৎসরের প্রারম্ভে হিমালয় এবং মধ্যভাগে সাগর-দর্শন ঘটিল। কূপমণ্ডুক মন প্রসারতা লাভ করিল। প্রকৃতির উত্তুঙ্গ ও উত্তাল পরিধি আমার কবি-মনে যথেষ্ট আলোড়ন তুলিল। কিন্তু ইহার অধিক যাহা লাভ করিলাম তাহা হইতেছে কালিম্পংয়ে অন্তরীণ-বদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং পুরীর সমুদ্রতীরে একসঙ্গে তরুণ সাহিত্যিকদ্বয় অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের সাক্ষাদ্দর্শন।

এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা দেশের চিত্র-শিল্পীদের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুযোগ আমার মত আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের ঘটে নাই। ভাস্কর-শিল্পী-সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সহিত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড্ডায় প্রথম সাক্ষাৎ অচিরকাল মধ্যে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যে পরিণত হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক যুগে কখনও গভীর রাত্রে, কখনও রাত্রির শেষ যামে খামখেয়ালী

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের মোটর-বিহারের সঙ্গী হইয়া বহুদিন দেবীপ্রসাদের শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটস্থ আবাসিক স্টুডিওতে হানা দিয়াছি। চিরতরুণ চিরহাস্যময় উদারহৃদয় বাবুজী—দেবীপ্রসাদের বৃদ্ধ পিতা—আমাদিগকে সাদর আপ্যায়ন জানাইয়া ভাজি-লুচি-সহযোগে সোৎসাহে অতিথি-সৎকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কখনও অপ্রস্তুত করিতে পারি নাই। আমাদের হৈ-হুল্লোড়ে তিনি সর্বদা অবাধে যোগ দিয়াছেন। পিতাকে মধ্যস্থ রাখিয়া পুত্রের সহিত আমার প্রেম দিনে দিনে প্রগাঢ় হইয়াছে। ছবি-আঁকা, মূর্তি-গড়া, খাওয়া, গল্পগুজব একসঙ্গে চলিতেছে, বাবুজীর স্নেহাশীর্বাদ চন্দ্রাতপের মত আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে। দেবীপ্রসাদ তখনও প্রসিদ্ধ হন নাই, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা বাবুজীর সঙ্গে আমাদের চিত্তকেও উদ্বেল করিতেছে। তাঁহার বিচিত্র অনন্যচিত্ত অধ্যবসায়ের সাক্ষী আজ আমরাই আছি। শিল্পীর নিশীথ সাধনা শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিবার সুযোগই লাভ করিতাম তাহা নহে, তিনি আমাদিগকে নানা ভাবে উপকরণ হিসাবেও ব্যবহার করিতেন, আমাদিগকে জড়পদার্থ জ্ঞানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আঁকাইয়া বাঁকাইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান চিত্রে বা মূর্তিতে প্রয়োগ করিতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়িতেছে, তাঁহার বিখ্যাত রঙিন চিত্র "মুসাফিরে"র যষ্টিধৃত একটা হাত তাঁহার কিছুতেই মনঃপূত হইতেছে না—বার বার আঁকিতেছেন, বার বার মুছিতেছেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে মুসাফিরের ভঙ্গিতে লাঠি ধরিয়া বসিতে হইল, আমার হাতের ছায়া ছবিতে চিরদিনের জন্য রহিয়া গেল। ছবিটি ১৩৩৪, আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। দেবী-প্রসাদ তখন শিশু-সাহিত্য রচনা করিতেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত শৈশবের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইদানীং যৌবনের সাহিত্য তিনি প্রচুর রচনা করিয়াছেন, বন্ধুত্বের বশে তিনি এই বিষয়ে আমাকে গুরুর মর্যাদা দিয়া ধন্য করিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় শিল্পীবন্ধু শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। বয়সে তিনি আমার চেয়ে বড়, কিন্তু তাঁহার মন এমনই উপাদানে গঠিত যে তাহাতে কখনও বার্ধক্যের ছোপ লাগিবে না। আমার মত যাঁহারা তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ-সৌহার্দ্য পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন, তাঁহার তুল্য ভাবুক রসিক এবং রসস্রষ্টা শিল্পীসমাজে দুর্লভ। তিনি সংসার-বিরাগী হইয়া, দীর্ঘকাল হিমালয়ের নিঃসঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তাঁহার 'কৈলাস ও মানস-সরোবর'। সংসারের আকর্ষণ প্রবলতর হইলে তিনি যখন ফিরিয়া আসেন, তখনই আমার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু আমাকে শান্তিনিকেতন হইতে নির্দেশ দেন, মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বাসায় শিল্পী প্রমোদকুমারের সহিত আমি যেন সাক্ষাৎ করি। প্রথম দর্শনেই প্রেম জন্মে। তিনি আমাকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া 'ভাই' বলিয়া গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল সে সম্পর্ক অটুট আছে। প্রমোদকুমার সেই কালে বিপুল বহরের ছবি আঁকিতেন, অধিকাংশই পৌরাণিক বিষয়ে। সেই সকল ছবি বহন করিতে আমি গলদঘর্ম হইয়া উঠিতাম। প্রমোদকুমার আজ বাংলা-সাহিত্যে তন্ত্রসাধনার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সে যুগে তাঁহার মুখে শুধু অবিমিশ্র হিমালয়-বন্দনাই শুনিতে পাইতাম।

তৃতীয় শিল্পীবন্ধু শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দলে স্বদেশী ডাকাতিতে লিপ্ত সন্দেহে তিনি ধৃত হন, পরে সন্দেহের বশেই কালিম্পংয়ে তাঁহাকে নজরবন্দী রাখা হয়। ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসে আমি কালিম্পং যাই। একমাত্র দ্রষ্টব্য হিমালয় দেখিতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না, কমলালেবুর বাগানের আকর্ষণও দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং মানুষের সন্ধানে মন দিলাম। সেখানে স্বাস্থ্যকামী আর আপিসমুখী এই দুই শ্রেণীর লোক, পুলিসের ভয়ে তখন সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত। ধরপাকড় তখনও

খুবই চলিতেছে। চৈতন্যদেবের খবর পাইলাম, ভয়ে তাঁহার সহিত কেহ আলাপ পর্যন্ত করে না; তিনি পাহাড়ীদের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। সাহসে ভর করিয়া একদিন তাঁহার আস্তানায় গেলাম। সঙ্কীর্ণ অগোছালো ঘর, রঙে তুলিতে ছবিতে বিচিত্র। দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। শিল্পী সেখানে ছিলেন না। কাছেই বৌদ্ধ-গুম্ফায় ছবি আঁকিতে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখি গুম্ফার অভ্যন্তরে তাঁহার ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি। রক্ষকের সহিত বন্ধুত্ব জমাট বাঁধিয়াছে, তিনি যাবতীয় সযত্নরক্ষিত অন্যের অদৃষ্ট প্রাচীন পট শিল্পীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, শিল্পী নিবিষ্ট চিত্তে বুদ্ধলীলা ধ্যান করিতেছেন। নিজেই নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার কাছে তো বাঙালীরা কেহ পুলিসের ভয়ে আসে না, আপনার ভয় করিল না? আমি বলিলাম, আমি শিল্পীকে দেখিতে আসিয়াছি, বিপ্লবীকে নয়; এই পরিবেশে আপনার সত্যকার মূর্তি আমি দেখিতে পাইতেছি। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে বিলম্ব হইল না। আমি কলিকাতায় ফিরিবার কালে সঙ্গে তাঁহার কয়েকটি ছবি লইয়াই ফিরিলাম না, একজন ভাবুক সাধকের স্মৃতি আমার চিত্তে অক্ষয় হইয়া রহিল। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত চিত্র "কালিম্পংয়ের ভুটিয়া ভিখারী" শ্রাবণের (১৩৩৪) 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়া দিলাম। চৈতন্যদেবের শিল্পসাধনা যে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হইবে—এ অনুমান আমি প্রথম পরিচয়েই করিতে পারিয়াছিলাম। চৈতন্যদেবের সহিত 'বঙ্গশ্রী'র যুগে সম্পর্ক গাঢ়তর হইয়াছিল।

বৈশাখে নগাধিরাজ হিমালয় দিলেন শিল্পীকে, আশ্বিনে পুরীর সমুদ্রসৈকতে দেখিলাম সাহিত্যিকদ্বয়কে। অচিন্ত্যকুমার তাঁহার আত্মজীবনী 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

> পুরীতে বেড়াতে গিয়েছি, সঙ্গে বুদ্ধদেব আর অজিত। একদিন দেখি সমুদ্র থেকে কে উঠে আসছে। পুরাণে-মহাভারতে দেখেছি

কেউ কেউ অমনি উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে। তাদের কারুর হাতে বিষভাণ্ডও হয়তো ছিল। কিন্তু এমনটি কাউকে দেখব তা কল্পনাও করতে পারি নি। আর কেউ নয়, স্বয়ং সজনীকান্ত।

একই হোটেলে আছি। প্রায় একই ভোজনভ্রমণের গণ্ডির মধ্যে। একই হাস্যপরিহাসের পরিমণ্ডলে।

সজনীকান্ত বললে, শুধু বিষভাণ্ড নয়, সুধাপাত্রও আছে। অর্থাৎ বন্ধু হবারও গুণ আছে আমার মধ্যে।*

অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস-উপমা-প্রবণতা স্বভাবতই তাঁহার স্মৃতিকে প্রতারিত করিয়াছে। আশ্বিনের 'শনিবারের চিঠি' বাহির করিয়া মাত্র তিন দিনের জন্য সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরী বেড়াইতে গিয়া এক পাণ্ডার আশ্রয়ে ভাড়া-করা ঘরে ছিলাম। পরস্পর সাক্ষাৎ অবশ্য একাধিকবার হইয়াছিল, কিন্তু আলাপের প্রসঙ্গ কখনও সাহিত্য-প্রসঙ্গে পৌঁছায় নাই। সাহিত্যের যাহা চিরন্তন বিষয় তাহারই সন্ধানে সকলেই এতই ব্যাকুল ছিলাম যে, প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অচিন্ত্যকুমার এইখানে আমার মুখ দিয়া এক গাদা কথা বলাইয়াছেন এবং নব-সাহিত্যবন্দনা বিষয়ক একটি কবিতাও আবৃত্তি করাইয়া লইয়াছেন। মগজে কল্পনা এবং হাতে কলম থাকিলে এ সবে আটকায় না। কবিতাটি যে আমি পরবর্তী পৌষ মাসে রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলাম ইহা জানা থাকিলে অচিন্ত্যকুমার সাবধান হইতে পারিতেন।

পুরীর সমুদ্রকে সাক্ষী রাখিয়া 'কল্লোল'-পক্ষ ও 'শনিবারের চিঠি'-পক্ষে সেদিন যে মিলন হইয়াছিল তাহার প্রভাব শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে স্পর্শ করে নাই। অচিন্ত্যকুমার বন্ধুপদবাচ্য হইয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া পরস্পর নিমন্ত্রণ-আদান-প্রদানও হইয়াছে। অচিন্ত্যকুমারের "তিরিশ গিরিশে"র বাসায় গিয়া আমরা রসগোল্লা খাইয়াছি এবং আমার ঘোষ লেনের বাসায় আসিয়া তাঁহারা চা খাইয়াছেন। পুরী-পর্ব এই পর্যন্ত।

---

* কবি শ্রীঅজিতকুমার দত্ত সেই দলে ছিলেন না।

"সাহিত্য-ধর্মে"র যুদ্ধে এই সময়ে আমরা আরও সমর্থন লাভ করিলাম, রবীন্দ্র-স্নেহ-বিপর্যয়ের মধ্যে ইহাই হইল সান্ত্বনা। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় একটি পত্রে আমাকে লিখিলেন—

দৈবক্রমে "সাহিত্য" শব্দের মূল অর্থ সমাজ; সমাজের ইষ্ট বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া বাঙ্‌ময় রচনা সাহিত্য নাম পাইয়াছে। মানুষের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ; এই তিন গুণ হইতে যেমন বায়ু-পিত্ত-কফ তিন ধাতু কল্পনা; তেমনই জ্ঞান, কর্ম, রস এই তিন ভাগে তাহার প্রয়োজন বিভক্ত করিতে পারি। অতএব, সাহিত্যের তিন ভাগ, (১) জ্ঞান-সাহিত্য যেমন দর্শন বিজ্ঞান, (২) ক্রিয়ার সাহিত্য যেমন স্থাপত্য অন্নপাক; (৩) রস-সাহিত্য, যেমন পদ্যে কাব্য, গদ্যে উপন্যাস। উপস্থিত আলোচনায় রস-সাহিত্য লক্ষ্য। দেখা যাইতেছে সমাজের হিতচিন্তাই রসের লক্ষ্য। সমাজধর্ম সে-ধর্ম, যাহা থাকিলে সমাজ সম্ভব হয়, সাহিত্যধর্ম সে-ধর্ম, যাহা থাকিলে সাহিত্য সম্ভব হয়। ইহার অধিক বলিতে পারা যায় না। কাজেই সীমা কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু আর একটু স্পষ্ট করা যাইতে পারে। বহুজন সমাজের যে বিধির প্রশংসা করে, যেমন সদাচার, সে বিধিদ্বারা সমাজ নিয়মিত হয়। সেইরূপ, সাহিত্যধর্ম, সে-ধর্ম বহুজন যে-ধর্মের স্তুতি করে। ইহার প্রকাশ-রীতি সম্বন্ধে আমাদের আলঙ্কারিকগণ তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারের উপর কথা কহিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

'পুরাতন-প্রসঙ্গে'র লেখক প্রবীণ অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখিলেন—

কুক্ষণে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বাংলা সাহিত্যে "বস্তুতন্ত্র" শব্দটি আমদানী করিলেন।...আজিকার এই আধুনিক বস্তুতন্ত্রতার দুঃশাসন সভামধ্যে কলালক্ষ্মীর বস্ত্রহরণ করিতেছে দেখিয়া প্রবীণ সমাজ লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন।...ইহা একটা সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিমা। সেই ভঙ্গিমায় রূঢ়তা আছে, পৌরুষ নাই; বর্বরতা আছে, বীর্য নাই; ক্ষুধা আছে, সংযম নাই। ইহাদিগকে তরুণ দল বলিলে ঠিক এই সকল সাহিত্যসেবীর সংজ্ঞানির্দেশ করা হয় না। ইহারা কি বলিতে চাহেন, ইহাদের কণ্ঠ হইতে নূতন কোনও বাণী উদ্‌গিরিত হইতেছে কিনা, বহু

আয়াসেও তাহা ধরা যায় না। কোনও নূতন প্রেরণা, কোনও অজ্ঞাতপূর্ব দার্শনিকতত্ত্ব,—এমন কিছু, যাহা সংসারকে সৌন্দর্যস্নাত ও কল্যাণমণ্ডিত করিবে? যদি না থাকে, তাহা হইলে এই সাহিত্যিক বিক্ষোভের, এই বীভৎস ভঙ্গীর সার্থকতা কি?

তরুণদের কবিতার বিষয় এবং ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া ১৩৩৪ মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে আমার "চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর, ঢাকাই পরোটা খাই" এবং ফাল্গুনে "আমি যে প্রথমতম" বাহির হয়। জবাবে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও অজিতকুমার তিনজনে মিলিয়া "ঢাকা-টিক্কি" নামক একটি কবিতা রচনা করিয়া 'শনিবারের চিঠি'তেই প্রকাশার্থ পাঠান। অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগে' লিখিয়াছেন, ইহা "কবিতার অনুপ্রাস নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপের প্রত্যুত্তর।" 'কল্লোল যুগ' পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত এই পাঁচ স্তবকের কবিতাটির প্রথম স্তবকটি দেখিলেই বুঝা যাইবে, ইহাতে কেবল শব্দের অনুপ্রাসই ছিল, অর্থের বালাই ছিল না:

ফাগুনের গুণে 'সেগুনবাগানে' আগুনে বেগুন পোড়ে,
ঠুনকো ঠাটের 'ঠাঠারি বাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক;
ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেঁকুর ঢিঢিক্কারেতে ঢোঁড়ে,
সং 'বংশালে' বংশের শালে বংশে সেঁধেছে শিক।

পাশাপাশি আমার "আমি যে প্রথমতম" কবিতাটি পড়িলেই এ-পক্ষে ও-পক্ষে সাহিত্যিক তফাতটা ধরা সহজ হইবে:

তাজা-বয়লার কয়লাকুঠির ময়লা-গাদার ধারে,
গয়লা-বধূর* পয়লা সোয়ামী ফেরে কম্পাস ঘাড়ে।
বিশাই তাহার নাম—
যত বাড়ে বেলা বোঝা ঠেলে ঠেলে ছোটে তত কালঘাম।
ফার্লং দূরে লং সাহেবের অবলং বাংলায়,
ধানী গয়লানী সানি দানি' ঘানী-বলদে পানি পিলায়।

* "গয়লা-বধূ" শুধু অনুপ্রাসের খাতিরে।

পাশে হাসি' হাসি' বাঁশী-চাপরাসী কাশির ইশারা করে,
কটক-চটকে ভুলিয়া কামিনী চলিল ফটক 'পরে—
বিশাই দেখিল হায়,
পহেলি সহেলি 'বহেলি তাহারে আন্ বাড়ি পানে যায়।
মেঘল হইল দীঘল বদন মুঘল-চিত্রসম,
দাঁড়ায়ে বিশাই—ভাবে, দুনিয়ায় কে বুঝে বেদন মম?
কহিল, "প্রেয়সী ধানী,
শীতল করুক শয্যা তোমার আমার চোখের পানি।
ধূধূ মরুভূমি হেথায় আমার, ক্লান্ত পথিক চলি—
আমার বুকের সাহারা শ্যামাক তোমার বনস্থলী।
নিরালা যাত্রা মম
প্রিয়তম তব যে হবে হউক, আমি যে প্রথমতম।"

সুতরাং ত্রয়ীর "টরেটক্কা"-কাব্য অমনোনীত হইয়া ফেরত গেল; সমুদ্রবেলায় সদ্য-রচিত বালুঘর সামান্য আঘাতেই ভাঙিয়া চুরমার হইল।

আমার ব্যঙ্গকবিতাটি পড়িয়া শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। বাঙালী জাতির তৎকালীন চরিত্র-শৈথিল্য এবং শিল্প-সাহিত্য ও জীবনে তাহার প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র বক্রোক্তি আজিও স্মরণ করিবার যোগ্য। তিনি লেখেন:

"গয়লা-বধূর পয়লা সোয়ামী" ক্যারিকেচার বলে লোকে বুঝতে পারবে তো? আজকালকার বাজারে ঐ রকম ভাষা ও ভাবই যে সাব্লাইম! তরুণের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযান কেন? তাঁরা কিছু বলেছেন নাকি? হরতাল ছাড়া কিছু করেছেন নাকি? আমার তো মনে হয় তাঁদের এতটা আস্ফালনের জন্য তাঁরা মোটেই দায়ী নন। ভ্রম, সমস্তটাই হচ্ছে ট্রান্স্‌মিশন অব ফোর্সেস,—কুলোর ওপর ভাঙা কলায়ের নৃত্য। আপনারা ভয় পাবেন না, যাকে প্যাথলজিকাল মনে করছেন, সেটা একেবারেই ফিজিকাল; গ্রীষ্মকালে কোল্ডব্লাডেড অ্যানিমালের টেম্পারেচার বাড়ে, সেটা জ্বর নয়। আমাদের এ এক অপূর্ব দেশ! এখানে সাম্যের ধারণা জাগলে লোকে পৈতে পরে বামুন

হতে চায়। এখানে সমানাধিকারবাদের ফলে মেয়েদের খোঁপা কমে না, পুরুষের খোঁপা বেড়ে যায়।

উদ্বিপরা ঝিতে আপত্তি করলে চলবে কেন? ওছাড়া লোক কোথায়? আমরা যখন রাণী, বাণী, শ্যামা, এলা, বেলা, স্টেলার কথা লিখি, তখন যে মনে পড়তে থাকে ঐ ঝিটাকে। উর্বশী মেনকার কটাক্ষে কাজ হ'ত। ঝির বেলায় চাই হেমেন্দ্র মজুমদারিজম্—তা না হ'লে প্রেম জাগবে কেন? যাঁদের অবশ্য হায়ার সেন্সিবিলিটিজ তাঁদের এতটা দরকার হয় না। তাঁদের এক-গাল ভাত বেশী খাইয়ে দিতে হয়। প্রমাণ 'পথের দাবী'র ভারতী। তিনি নামলেন জুতো পায়ে—কিন্তু কথা কইলেন সাবিত্রী রাজলক্ষীর সুরে—"আর দুটি ভাত খাও।"

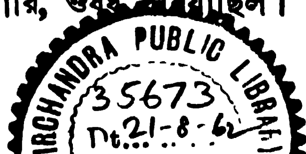
এই বৎসরের শেষের দিকে অর্থাৎ মাঘ মাসে চিত্রশিল্পী শ্রীমুকুল দের সহিত পরিচয় ঘটিল। তিনি লণ্ডনের নাইট্‌স্‌ব্রিজে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নিজস্ব স্টুডিওর পাট তুলিয়া দিয়া সদ্য দেশে ফিরিয়াছেন, ড্রাই-পয়েণ্ট এচিংয়ে তাঁহার বিশেষ নাম হইয়াছে; কলিকাতা গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ-পদপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। 'প্রবাসী'তে তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ভার আমার উপর পড়িল। উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া পরিচয় হইল। ফাল্গুন মাসে আটপৃষ্ঠাব্যাপী আমার সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইল। নিমন্ত্রণ-যাতায়াত-চিত্রোপহার সবই হইল; কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোথায় কিসের যেন অভাব ছিল, "সিটি-লাইট্‌স্"-এর নৈশ প্রেম দিনের আলোকে স্থায়ী হইল না, ভালবাসা ত্বক ভেদ করিয়া গভীরে প্রবেশ করিল না। এই বিচিত্র আত্মসর্বস্ব শিল্পী মানুষটির সহিত বন্ধুত্ব আজিও সেই প্রথম স্তরেই আছে, তবে খণ্ডিত হয় নাই। ইঁহারই সহোদর শিল্পী শ্রীমান মনীষী দের সহিত পরে আমার ঘনিষ্ঠ স্নেহসম্পর্ক ঘটিয়াছিল।

আজকাল বোম্বাই-সিনেমা-গানের বিকৃত অনুকৃতিতে আমাদিগকে যেমন পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে এবং-লাউড স্পীকারের জ্বালায় শয়নে

স্বপনে উদ্বেজিত হইতে হয়, সেই সময় নজরুলী-গজলের স্থানকাল-পাত্রনিরপেক্ষ আক্রমণও ছিল সেইরূপ মারাত্মক। বাড়িতে বাড়িতে স্নানঘরে অবিশ্রাম কলজলপতনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ছেলেমেয়েদের করুণ "কে বিদেশী" গান অভিভাবকদের অতিশয় উত্ত্যক্ত করিত। দিলীপকুমার-পরিচালিত কয়েকটি আসরে স্বয়ং নজরুল স্বদেশী গানে ইস্তফা দিয়া এই গজল-গান একটু বেশী প্রচার করিতেছিলেন; গ্রামোফোন কোম্পানিগুলিতেও তখন তিনি প্রধান সঙ্গীত ও সুর-কার। লাউড স্পীকারের রেওয়াজ না থাকিলেও ঘরে ঘরে এবং পানবিড়ির দোকানে গ্রামোফোনে গজল গান অবিরাম চলিতে থাকিত। স্রেফ ব্যঙ্গ করিয়া এই মন্দাকিনী-স্রোত রোধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম। ঠিক ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইতে হয় নাই, কারণ বহু সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন রসিক আমাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। পৌষ সংখ্যার "কচি ও কাঁচা"য় কবি বাইরনের (নজরুলেরই কল্পিত নাম) মুখ দিয়া গাওয়াইয়া দিলাম:

জানালায় টিকটিকি তুই টিকটিকিয়ে করিস নে আর দিক।
ও-বাড়ির কল্‌মিলতা কিসের ব্যথায় ফাঁক করেছে চিক॥
বহুদিন তাহার লাগি রাত্রি জাগি গাইনু কত গান।
আজিকে কারে জানি নয়না হানি হাসল সে ফিক ফিক॥ ইত্যাদি

ফাল্গুন সংখ্যায় বাহির করিলাম "জলসা"—দিলীপী নাচগানের আসরকে ব্যঙ্গ করিয়া। তখনও উদয়শঙ্কর-কনকলতা-অমলানন্দীর আবির্ভাব ঘটে নাই, শ্রীমতী রেবা রায় তখন শ্রেষ্ঠ নৃত্য-পটীয়সী। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া লেখা আমার "জলসা"র অন্তর্গত "হাঘরে"-নৃত্যের গান বিশেষ সোরগোলের সৃষ্টি করিল। "জলসা"য় দুইটি গজল-গানও সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলাম, মূল গজল গানগুলিকে ছাপাইয়া সেইগুলিই দীর্ঘকাল কলিকাতার পথে ঘাটে গীত হইতে শুনিয়াছি। সুতরাং অনুমান করিতে পারি, ঔষধ ধরিয়াছিল। আমার গজল দুইটির কথা ছিল এই:



কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
বাঁশী-সোহাগে ভিরমি লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের ক'নে।
ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা, বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা—
বোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা শ্যাওলা-পড়া নীল গগনে।
কুকুরবালা অনেক রাতে দেয় নাক' মুখ এঁটো পাতে,
বিড়াল-বধূ দুধ ও ভাতে তেয়াগি কাঁদে হেঁসেল-কোণে।
সাবল হাতে সিঁধেল চোরে—ভাসে সে স্বরে নয়ন-লোরে,
দোহাই তোরে আর বেঘোরে মারিও নাক' গরিব জনে॥

দ্বিতীয় গজলটি এই :

তেপায়ায় ট্যাঁকঘড়ি তুই টিক্‌টিকিয়ে ক'স কি নিশিদিন!
কচি সব পাড়ার ছুঁড়ি—ওই যা, থুড়ি, বালিকা আই মীন—
তারা সব হয় না বড়, জল্‌দি কর, বাড়াও বয়স ভাই,
এখনও বুঝতে নারে ঠোরে-ঠারে চোখের আলাপিন।
আজো যে ফ্রক প'রে হায়, ঘুরে বেড়ায়, চায় না আঁখি তুলে,
কবে যে ঘোমটা চিরি, ধীরি ধীরি বাজবে আঁখি-বীণ?
কবে যে দখ্‌নে হাওয়ার বুঝবে পাওয়ার প্রেম-টাওয়ারে উঠে,...
ঘড়ি তুই চল্‌ ছুটিয়া টিক্‌টিকিয়া বাড়িয়ে গতি ক্ষীণ।
তোরে যে ফি বছরে অয়েল ক'রে তোয়াজ করি কত,
সময়ে পারিস না কি দিতে ফাঁকি, ওরে সুইস-জীন্‌॥

বৎসরের শেষ মাসে অর্থাৎ চৈত্রে আমার প্রথম উপন্যাস 'জীবনের খরস্রোতে'র প্রথম কিস্তি "ডলি" বাহির হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, ইহা আমার শেষ উপন্যাসও বটে। অর্থাৎ উপন্যাস রচনার শুরুতেই আমার শেষ। ইহাই বৎসরকাল পরে রঞ্জন প্রকাশালয়ের দ্বিতীয় উপন্যাসরূপে পুস্তকাকারে বাহির হয়। নাম বদলাইয়া 'অজয়' রাখি। রঞ্জনের প্রথম উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। যে উপন্যাস আমার মনে ছিল তাহার ভূমিকা-মাত্র আমি লিখিতে পারিয়াছিলাম, আসল গল্প আর লেখা হয় নাই। সেই ভূমিকাই 'অজয়'। 'কল্লোল যুগে' অচিন্ত্যকুমার লিখিয়াছেন :

> তখন একটা বাগ্‌ভঙ্গি চলেছে আধুনিকদের লেখায়। সেটা হচ্ছে গল্পে-উপন্যাসে ক্রিয়াপদে বর্তমানকালের ব্যবহার। এ পর্যন্ত রাম বললে, রাম খেল, রাম হাসল ছিল—এখন শুরু হল রাম বলে, রাম খায়, রাম হাসে। সর্বনাশ, প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম যে, 'শনিবারের চিঠি' ব্যঙ্গ শুরু করল। অথচ সজনীকান্তর প্রথম উপন্যাস 'অজয়ে' এই বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ।

অচিন্ত্যকুমারের এই সমালোচনা সমীচীন। আসলে আমি গোড়ায় আধুনিকদের গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও রচনাভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই 'জীবনের খরস্রোতে' লিখিতে আরম্ভ করি। কিন্তু এক কিস্তি লিখিতে না লিখিতেই নিজের প্যাঁচে নিজে ধরা পড়ি। আমার কবিসত্তা ব্যঙ্গ করিতে গিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। উহা আমার নিজেরই কবি-জীবনের কাহিনী হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ভূমিকামাত্র। তবে স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, লিখিতে-লিখিতে আমি অনুভব করি নিত্যবর্তমান ক্রিয়াপদে ভাবের গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

এই সময়েরই আর একটি ঘটনার কথা অচিন্ত্যকুমার লিখিয়াছেন :

> সজনীকান্ত একদিন 'কল্লোল'-আপিসে এসে উপস্থিত হল। আড্ডা জমাতে নয় অবিশ্যি, কখানা পুরানো কাগজ কিনতে নগদ দামে। উদ্দেশ্য মহৎ, সাধ্যমত প্রচার করতে কাউকে। ভাবখানা এমন, একটু প্রশ্রয় পেলেই যেন আড্ডার ভোজে পাত পেড়ে বসে পড়ে। আসলে সজনীকান্ত তো 'কল্লোলে'রই লোক, ভুল করে অন্য পাড়ার ঘর নিয়েছে। এই রোয়াকে না বসে বসেছে অন্য রোয়াকে।...প্রেমেন শুয়ে ছিল তক্তপোশে। বললুম, "আলাপ করিয়ে দিই—"...
>
> কলির ভীমের মত প্রেমেন হঠাৎ হুমকে উঠল : "কে সজনী দাস ?"
>
> এ একেবারে দরজায় খিল চেপে চাপিয়ে ঘর বন্ধ করে দেওয়া। আলো নিবিয়ে মাথার উপরে লেপ টেনে দিয়ে ঘুমুনো। প্রশ্নের উত্তর থাকলেও প্রশ্নকর্তার কান নেই। আবার শুয়ে পড়ল প্রেমেন।

সজনীকান্ত হাসল হয়তো মনে মনে। ভাবখানা, কে সজনী দাস, দেখাচ্ছি তোমাকে।

টেকনিক বদলাল সজনীকান্ত। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রেমেনকে বন্ধু করে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে শৈলজা। ক্রমে ক্রমে নজরুল, পিছু পিছু নৃপেন।

শক্তিধর সজনীকান্ত। লেখনীতে তো বটেই; ব্যক্তিত্বেও।

এই উক্তি মোটামুটি সত্য হইলেও ঘটনার পূর্বাপরতা ঠিক নাই, এবং অচিন্ত্য-কল্পনার হাইড্রলিক প্রেসারে সময়ের পরিধি কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে। অচিন্ত্যকুমার আরও কয়েকটি নাম করিতে ভুলিয়াছেন—যথা অচিন্ত্যকুমার, অজিতকুমার, 'যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং স্বয়ং দীনেশরঞ্জন দাশ। কিন্তু সজনীকান্ত মোটেই টেকনিক বদলায় নাই। সৃষ্টির আদিকাল হইতে যে-টেকনিকে বুনো হাতী এবং বন্য ব্যাঘ্রও পোষ মানে, সেই চিরন্তন টেকনিকেই ইঁহারা বশ মানিয়াছেন।

দীর্ঘ আটাশ বৎসর পরে আজ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের সালতামামি করিতে বসিয়া দেখিতেছি, ঝড়ঝঞ্ঝাবিরহবিচ্ছেদকণ্টকিত হইলেও এই বৎসরেই আমার জীবনের যাবতীয় শুভ-সূচনা লক্ষিত হইয়াছে। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ইহা আরম্ভ-বৎসর; এবং বনস্পতির সাময়িক বিরূপতা সত্ত্বেও ছোট-বড় বহু পাদপপত্র-বীজনে আমার অরণ্যজীবন শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়াছে। এই বৎসরকে আমি নানা কারণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সরকারী চাকুরির যূপকাষ্ঠে বাঁধা পড়িতে পড়িতে এই বৎসরেই আমি চিরতরে বাঁচিয়া গিয়াছি, যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরে শনিমণ্ডলকেও জ্যোতিষ্মান করিয়াছেন তাঁহাদের স্পর্শ বা দৃষ্টি এই বৎসরেই অনুভূত হইয়াছে এবং 'প্রবাসী'র গতানুগতিক সহ-সম্পাদকীয় কর্তব্য ধীরে ধীরে আমার শ্বাসরোধ করিয়া আমাকে মুক্তির জন্য বিচলিত করিয়াছে। সে

মুক্তি পাইতে এক মাসের অধিক বিলম্ব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের সূচনাও এই বৎসরে—'অজয়' রচনার সঙ্গে সঙ্গে। এই বৎসরের সমাপ্তিতেই সাহিত্যিক যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলাম :

বুয়ারে-ইংরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছে, যুদ্ধ কভু ভাল নয়—
মশা ও ছারপোকা দু হাতে মেরে মেরে কেহ কি করিয়াছে ক্ষয় ?…
বুয়ারে-ইংরাজে যুদ্ধ বুড়া রাজা লিখিলা এই লিপিখান—
"দু দল দুই দলে করুক বিনিময় চুরুট, চা ও মিঠাপান।
বেচারা এক পাশে আছি,
আমারে ছুঁয়ো নাক' করিয়া বুড়ি, যদি বা খেল কাণামাছি।
পাঞ্জা লড়িবার সুবিধা নাহি পাও, বগলে দিও কাতুকুতু,
মিটিবে গুঁতাগুঁতি, হস্তে এঁটোপাত আদরে ডাক দিলে তুতু।"

এই সাদর আহ্বানেই শেষ পর্যন্ত বুয়ার-ইংরেজের যুদ্ধ মিটিয়াছিল, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে।

তৃতীয় অধ্যায়

"গুণ হইয়া দোষ হইল"

১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী'-প্রেসের দীর্ঘকালের ম্যানেজার ও মুদ্রাকর অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় নিজে স্বতন্ত্র ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন। তিনি সুবিখ্যাত ব্রাহ্মপ্রচারক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের অনুজ ছিলেন। 'প্রবাসী' যখন ব্রাহ্মমিশন প্রেসে ছাপা হইত, তখন তিনিই ছিলেন উক্ত প্রেসের ম্যানেজার। 'প্রবাসী' স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অনুগামী হইয়া গোড়া হইতেই নূতন প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার মত অমায়িক মিষ্টস্বভাবের লোক ছাপাখানা-লাইনেও আমি কম দেখিয়াছি। ম্যানেজারের পদ শূন্য থাকিতে পারে, কিন্তু মুদ্রাকরের পদ আইনত শূন্য থাকিতে পারে না। হাতের কাছে আর কাহাকেও না পাইয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় সরাসরি আমাকেই ওই পদে বহাল করিলেন। রাতারাতি সহ-সম্পাদক-পদ হইতে মুদ্রাকর-পদে উন্নীত হইলাম অর্থাৎ আমার পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। মাসিক ৯৫৲ টাকা হইতে এক ধাক্কায় ১৪৫৲। এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিল বলিয়াই ওখানে টিকিয়া গেলাম, নতুবা সহ-সম্পাদকের একঘেয়ে রুটিনমাফিক কাজে আমার দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, পালাই-পালাই করিতেছিলাম। তখন সম্পাদকীয় বিভাগে আমার উপরওয়ালা ছিলেন পাঁচ জন; স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহকারী চতুষ্টয়—শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এবং শ্রীপ্রভাত সান্যাল। ইঁহাদের মধ্যে জীবিতেরা কেহই আর 'প্রবাসী'র সহিত যুক্ত নহেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পর 'প্রবাসী'র দীর্ঘস্থায়ী সহ-সম্পাদকের ট্র্যাডিশন ভঙ্গ হইয়াছিল। এই ট্র্যাডিশন

পুনঃস্থাপন করিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। আমি পদান্তরিত হইবার অত্যল্পকালমধ্যে সম্পাদকীয় বিভাগে বিপর্যয় উপস্থিত হয়; প্যারীমোহন বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় যান শ্রীরাজশেখর বসুর সহায়তায় বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রচার-সচিব হইয়া; প্রভাত সান্যাল ই. বি. রেলের কি একটা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্পাদকীয় বিভাগ অচল হইবার উপক্রম। তখন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং অধুনা 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার) চেষ্টায় ও আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতার কোনও বিদেশী সওদাগরী আপিসের স্টেনোগ্রাফার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী বাংলা দুই পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে আগমন করেন ১৯২৯ সনের জানুয়ারি মাসে। কেদারনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ উভয়েই তখন ১৪ নং পার্সিবাগান লেনের বসুভ্রাতৃগণের (শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর) "উৎকেন্দ্র-সমিতি"র নিয়মিত সভ্য এবং সেই বাবদেই পরস্পর পরিচিত। ব্রজেন্দ্রনাথ তখনই নানা প্রসিদ্ধ ইংরেজী-বাংলা মাসিকপত্রে গবেষণামূলক ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন এবং আচার্য যদুনাথ ও পরশুরামের বইয়ের নিখুঁত প্রুফ দেখিয়া প্রুফসংশোধনবিশারদ বলিয়া তাঁহার নামডাক হইয়াছে। সুতরাং সহ-সম্পাদক হিসাবে তিনি দুর্লভ সংগ্রহ। কৃতিত্ব কেদারনাথের। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলকে সংগ্রহ করার কৃতিত্ব আমার। সুদূর বরিশালের এই দরিদ্র যুবকটি পাঠ্যাবস্থাতেই এমন বিপন্ন হন যে, চাকুরি ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার আবেদনে প্রথম দিনেই আমার মন ভিজিয়াছিল। আমি তাঁহাকে ছাপাখানার প্রুফরীডার-পদে বহাল করিয়াছিলাম ১৯২৮ সনের শেষে। তিনি নিজের যত্নে ও একনিষ্ঠ সাধনায় ধাপে ধাপে উন্নতি করিয়া গবেষণার ক্ষেত্রে নাম

করিয়াছেন এবং আজিও কৃতিত্বের সহিত 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'য়ের সহ-সম্পাদকত্ব করিতেছেন। ৩রা অক্টোবর ১৯৫২ ব্রজেন্দ্রনাথ চাকুরি করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নূতন বন্দোবস্তে আমার যাহাই হউক, 'শনিবারের চিঠি'র খুব সুবিধা হইল। মিষ্টভাষী অবিনাশচন্দ্রের প্রেসের বিলের তাগাদা মাঝে মাঝে এতই মর্মান্তিক হইয়া উঠিত যে, ভাবিতাম ছাড়িয়া-ছুড়িয়া পালাই। তিনি চাকুরি ছাড়িবার মুখে এই তাগাদা চরমে উঠিয়াছিল। তখন 'শনিবারের চিঠি' ছাপা-বাবদ প্রেসে বেশ কিছু ধার হইয়াছিল। খোদ কর্তার কাছে প্রায়ই এই সূত্রে অনুযোগ করা হইত। ইহার মধ্যে আর একটা কথা ছিল। 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে মালিকপুত্র অশোক ও কর্মচারী সজনীকান্তের ঘনিষ্ঠতা আপিস এবং সম্পাদকীয় বিভাগের কেহই বড়-একটা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। আমি যতদিন 'প্রবাসী'তে ছিলাম, এই বিরাগ অন্তঃশীলা ফল্গুর মত প্রবহমাণ ছিল।

আমি ছাপাখানার ম্যানেজার হইবামাত্রই বিরুদ্ধবাদীরা দেখিলেন, ভক্ষকই রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। দুই-দশ দিনের মধ্যেই খোদ কর্তার কানভারী করিবার গোপন চেষ্টা হইল। ফলে মুদ্রাকর-জীবনের এক সপ্তাহের মধ্যে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ (২১ মে, ১৯২৮) সোমবার সকালে ছাপাখানায় ঢুকিয়াই একেবারে প্রিভি কাউন্সিল হইতে এক ক্রুদ্ধ আদেশ পাইলাম:

21st May, 1928

কল্যাণীয়েষু,

প্রিয় সজনীকান্ত,...[অমুকের] মুখে শুনিলাম, তুমি বলিয়াছ, প্রবাসী আফিসের সহিত 'শনিবারের চিঠি' amalgamated হইয়াছে। আমার অজ্ঞাতে ইহা হইতে পারে না। আমি ইহাতে একেবারেই সম্মত নহি জানিবে। এরূপ বন্দোবস্ত না করিলে যদি তোমাদের

কাগজ না চলে, তাহা হইলে উহা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিও। প্রেসের সহিত উহার account শোধ আছে কিনা, দেখিবে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"শুভাকাঙ্ক্ষী" পাঠও ছিল না। বুঝিলাম, অবস্থা সঙ্গীন। প্রথম দিককার অনুযোগ মিথ্যা, সুতরাং জবাব ছিল। কিন্তু শেষের অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত পংক্তিটি মারাত্মক রকম সত্য। অশোক চট্টোপাধ্যায় অথবা আর কাহারও সহিত পরামর্শেরও সময় ছিল না, কর্তা সঙ্গে সঙ্গে জবাব চাহিয়াছেন। আমার যাবতীয় ডিপ্লোম্যাটিক বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া একটি জবাব মুসাবিদা করিলাম। প্রথম অভিযোগের উত্তরে লিখিলাম :

> বাহিরের আর পাঁচটা কাজ যেমন হইয়া থাকে 'শনিবারের চিঠি'ও প্রবাসী প্রেসে সেই ভাবে ছাপা হয়। বাহিরের অন্য কাজের সহিত আপনি যেমন সম্পর্করহিত, 'শনিবারের চিঠি'র বেলাতেও তাই। তবে আপনি যদি মনে করেন ইহাতে আপত্তিকর রচনাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি বলিলেই ইহার মুদ্রণ অন্য ছাপাখানায় স্থানান্তরিত করিব। আমাকে যদি জানাইবার অসুবিধা হয় আমি খুদ্দাকে [অশোক] বলিব, তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, একটি বাহিরের পার্টির সহিত প্রেসের যেরূপ বন্দোবস্ত 'শনিবারের চিঠি'র সহিতও তদ্রূপ, তাহার অধিক নহে। আপনার সহিত ইহার যে কোনও সম্পর্ক নাই, সে কথা আমরা আমাদের পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপিত করিয়াছি দেখিয়া থাকিবেন।

হিসাব ব্যাপারে যাহা লিখিলাম, তাহার মোদ্দা কথাটা এই যে, 'শনিবারের চিঠি' গরিব এবং আমাদের একান্ত শখের জিনিস। ঠিক সময়ে টাকা না দিলেও ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। যদি কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় এই কারণে বলি, ইহার জন্য আমার বেতন জামিন রহিল।

পিওন পত্র লইয়া টাউনশেণ্ড রোডে চলিয়া গেল। বিকালে ছুটি হইবার পূর্বেই জবাব পাইলাম :

কল্যাণীয়েষু,

[অমুক] শনিবারের চিঠির বন্দোবস্ত ভুল বুঝিয়াছিল। যেরূপ বন্দোবস্তের কথা তুমি লিখিয়াছ, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। এবং তাহা করিবার জন্য খুড়ুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিবারও দরকার নাই। তোমরা তোমাদের কাগজে লিখিয়াছ যে, উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই এবং আমিও লোককে তাহাই বলি; এইজন্য আমি amalgamationএ আপত্তি করিয়াছিলাম। কারণ, আমি উহা supervise করিতে চাই না, পারিবও না।

প্রেসের টাকা দিতে অল্প-স্বল্প বিলম্ব বাহিরের অন্য কাজেরও হয়।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আসলে স্নেহপরায়ণ পিতা পুত্রদের যেমন অতিশয় ভালবাসিতেন তেমনই ভয়ও করিতেন। পাছে এই ব্যাপার লইয়া অশোক আঘাত পান—এই কারণে তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গ চাপা দিলেন, আর উঠিতে দিলেন না। মামলা সূত্রপাতেই মিটিয়া গেল এবং 'শনিবারের চিঠি' আরও বৎসরাধিককাল 'প্রবাসী' প্রেসের আশ্রয়েই রহিয়া গেল। সে আশ্রয় ঘুচাইলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কেমন করিয়া তাহা বলিতেছি।

নূতন বিরাগের গোড়াপত্তন হইল বৈশাখেই। সম্পাদক নীরদচন্দ্র একটি বেনামী প্রবন্ধ লিখিলেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—পেন্সিল ড্রয়িং", "তাঁহার 'কালি-কলমের পেশা'র পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে"। প্রবন্ধটি মোটের উপর নিরীহ অথচ উচ্চাঙ্গের রচনা। লেখক প্রমথ চৌধুরী ও মানুষ প্রমথ চৌধুরীর রচনা ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক এমন সরস লেখা আর প্রকাশিত হয় নাই। নীরদচন্দ্র লেখক ও মানুষের সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রভূত জ্ঞান ও মুনশীয়ানা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ ব্যাজস্তুতিমূলক হইতে বাধ্য। হইয়াছিলও তাহাই। ফলে চিন্তালেশহীন বঙ্গীয় বিদগ্ধমহলে বিক্ষোভের উত্তাল

তরঙ্গ উত্থিত হইল। তাহার ফেনপুঞ্জ রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। ইহা স্বাভাবিক, শুধু জামাতা হিসাবে নয়, বন্ধু ও ভাষায় তখন সমানধর্মী বলিয়া চৌধুরী মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ-সমীহ করিতেন। তাঁহার ক্ষোভ যে ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হইতেছে লোকপরম্পরায় তাহা জানিতে লাগিলাম।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধ লইয়া যে গোলযোগ শুরু হইয়াছিল, ১৩৩৫ সালের বৈশাখে নীরদ-চন্দ্রের এই প্রবন্ধও অনুরূপ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

> প্রমথবাবুর জীবন একটা ট্র্যাজেডি। প্রমথবাবু "পলিটিকস্, ইকনমিকস্, শিক্ষা, সমাজ, হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ইত্যাদি যে কোন একটা অথবা সব কটা নিয়ে অতি গম্ভীর ও অতি রাগত ভাবে নানারূপ প্রভুসম্মত বাণী ঘোষণা" করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি নয়। তাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডি ইহাই যে এই বৈদগ্ধ্য-বর্জিত বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করার ফলে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার অতি তুচ্ছ রসিকতাকেও লোকে একটা গুরু-গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া ভুল করিয়া বসে। আমরা বিষবৃক্ষের ফলের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু বিষবৃক্ষে কি ফুল ফুটে না? প্রমথবাবু বৈদগ্ধ্য-বিষবৃক্ষের ফুল। যে সমাজ তাঁহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিত সে সমাজ আর নাই। যে সমাজ কোনো অবস্থাতেই তাঁহাকে লেখক, দার্শনিক, পণ্ডিত, যুগপ্রবর্তক বলিয়া ভ্রম করিয়া তাঁহাকে মনে কষ্ট দিত না, সে সমাজ আজ কোথায়?...বড় দেরি হইয়া গিয়াছে। প্রমথবাবুর স্বধর্মী ধর্ম-অর্থ-কামশাস্ত্রজ্ঞ পাটলিপুত্রকদের ধূলি আজ ধরণীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া দিকে দিকে উড়িতেছে। তাই যে বিদগ্ধচূড়ামণি, নগর ও উজ্জয়িনী, বিদিশা ও কৌশাম্বীর গৌরব ও মুকুটমণি হইতে পারিত, সে অদৃষ্টের ফেরে "ফিলিস্টিন"-শাসিত কলিকাতা-শহরে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্য বোঝা বহিতেছে।

এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আলোচনা ও কটূক্তির ঝড় উঠিল, একসঙ্গে পঞ্চাশটা তোপ এদিকে ওদিকে

সেদিকে গর্জিয়া উঠিল। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ-চন্দ্র বাগচি প্রমুখ মহাপণ্ডিতেরাও রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের উচ্চাসন হইতে আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করিলেন। আমরা সংখ্যালঘু, আমাদের অক্ষৌহিণীতে মাত্র দুই পদাতিক—সম্পাদক নীরদচন্দ্র এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক সজনীকান্ত। আমরা এই সকল আক্রমণকারীর সম্মুখীন না হইয়া একটু তির্যক পথ ধরিলাম। এইরূপ করিবার সঙ্গত কারণ প্রতিপক্ষই যোগাইয়াছিলেন। প্রথমে এই কয়েকটি সাময়িক পত্র রণদামামায় ঘা দিলেন—'ফরোয়ার্ড' 'বাংলার কথা' 'আত্মশক্তি' 'নবযুগ' 'কালি-কলম' 'নাচঘর'। ইহারা কেহই সরাসরি জবাব দিলেন না। 'বাংলার কথা' বলিলেন, প্রবন্ধলেখক "অতিশয় কৃশ," সুতরাং তাহার রুচি নীচ হওয়াই স্বাভাবিক; 'আত্মশক্তি' বলিলেন, লেখক "অতিশয় বেঁটে" হওয়াতেই এইরূপ ঘটিয়াছে; 'নবযুগ' বলিলেন, লেখক উন্মাদরোগগ্রস্ত এবং অকারণে "রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়"; বাপ তুলিতেও ইহারা দ্বিধা করিলেন না।* এই বিপুল "বদজবান"কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমরা খোদ প্রমথ চৌধুরীকে শরজর্জরিত করাই সাব্যস্ত করিলাম। জ্যৈষ্ঠে আমি লিখিলাম, "বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দান"—তাঁহার 'সনেট পঞ্চাশৎ'এর যাবতীয় দুর্বলতা বিশ্লেষণ ও "প্যারডি" করিয়া দেখাইলাম। বলা বাহুল্য, প্রশংসাচ্ছলে সবিনয়ে বলা হইলেও লেখাটিতে যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ও ইয়ার্কির অসম্মান ছিল। তবে আমার বিশ্বাস, কাব্যহিসাবে 'সনেট পঞ্চাশৎ'এর অসার্থকতা কথঞ্চিৎ প্রকট করিতে

* পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল যাঁহাদের আয়ত্তে আছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি দেখিতে পারেন: 'বাংলার কথা' ২২শে বৈশাখ ১৩৩৫; 'Forward' May 13 1928; 'আত্মশক্তি' ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

পারিয়াছিলাম। চৌধুরী মহাশয়ের আদর্শে রচিত আমার দুইখানি সনেট সর্বাধিক আঘাত হানিয়াছিল এবং সে সময় মুখে মুখে চলিয়াও গিয়াছিল। এই যুগের পাঠকদের কাছে সেই জোড়া সনেট পুনরায় নিবেদন করিতেছি :

বালিগঞ্জ

সার্থক ধরেছ নাম ওগো বালিগঞ্জ।
বারিধির বেলা নহ তবু তালী নীল।
তাই বুঝি পথে পথে উড়ে গাংচিল—
মৎস্য-লোভে এক ঠ্যাঙে বসে যেন খঞ্জ।
মধুরে বহিছে হেথা সদাই প্রভঞ্জ,
মনে নাই, বুকে নাই, ঘরে নাই খিল ;
ধনে মানী সকলেই, উচ্চকুলশীল—
তোমাতে যে বাসা বাঁধে হৃদি তার রঞ্জ।

সানি পার্ক, রেনি পার্ক, লাভলক প্লেস—
নিশাশেষে প্রেয়সীর যেন কণ্ঠাশ্লেষ।
দিক-দৌড়া মাঠে তব ঘোড়ার টহল,
বয়-বাবুর্চিরা ঢুলে দেয়ালে হেলিয়ে,—
তুমি এই নগরীর বেগম-মহল,
সবে ডাক অভিসারে নয়ন খেলিয়ে ॥

বেগুন

আলু নহ, কচু নহ, তুমি যে বেগুন।
লজ্জায় বেগুনী বুঝি কালো তব দেহ!
পোড়ায়ে কাঠের আঁচে সাথে তিল-স্নেহ
নুন আর লঙ্কা, তুমি নহ তো বে-গুণ।
বৃক্ষমাঝে মূল্যবান যেমন সেগুন,
আনাজেতে তুমি তথা ; গরিবের গেহ

আলো করি ঝোলো যেন বিভু-"অম্বুলেহ"—
সীমাহীন বারিধির কোরাল লেগুন।*

ভাজিতে, অম্বলে, ঝোলে কিম্বা নিম-সঙ্গে
বসন্তেরণ† রঙ্গ ভাঙ্গ অপাঙ্গ ভ্রূভঙ্গে।
বেসনলেপিত অঙ্গে ভাজি হয়ে তৈলে
সুরা-সহযোগে তুমি ফাউলের বাবা,
গরীবের চলে নাক' তুমি সখা নইলে,
হিন্দুর প্রয়াগ তুমি, মুসলিমের কাবা॥

জ্যৈষ্ঠে নীরদচন্দ্র আরও মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—জের"। স্পষ্টত বলিয়া ফেলিলেন:

> প্রমথবাবুর যে বৈশিষ্ট্য সকলের আগে লোকের চোখে পড়ে, সেটা তাঁহার রচনার গুণ অথবা দোষ নয়, তাঁহার টেম্পারামেণ্টের বিশেষত্ব। তাঁহার সকল রচনাতেই এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখিতে পাই। এই মার্কা-মারা বিশেষত্বের একটা সৌন্দর্য ও আকর্ষণ আছে তাহা আমরা মানি। সমাজবিশেষে ইহার প্রয়োজনীয়তাও আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের দেশে, আমাদের কালে, প্রমথবাবুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের এই উগ্র ও অবিরত আত্মপ্রকাশ ও তাঁহার ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল ফ্রিভোলিটি—শিক্ষা, সাহিত্য ও "কালচারে"র পক্ষে একটা গুরুতর অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ও-পক্ষে গালাগালির বন্যা প্রবলতর হইল। আমরাও সংযত থাকিতে পারিলাম না। আক্রমণে আক্রমণে আমাদের সরস চিত্তও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেটা আমাদের অপরাধ সন্দেহ নাই। আষাঢ়ে ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষের সাহায্য লইয়া আমি লিখিলাম "পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী" প্রবন্ধ, পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড; ইহাতে তাঁহার সংস্কৃত-পাণ্ডিত্যের যে কতখানি অভাব তাহা

---

* Coral Lagoon

† মা শীতলা।

দেখাইলাম। হালকা ইয়ার্কি এবারে গভীর অসম্ভ্রম হইয়া উঠিল। ফলে আমরা আমাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক বহু বিদগ্ধজনের বিরাগভাজন হইলাম। রবীন্দ্রনাথ "নটরাজ" ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ ছিলেন। "প্রমথ চৌধুরী" ব্যাপারে তাঁহার ক্ষুব্ধতা ক্রোধে পরিণত হইল। তাঁহার ক্রোধ আমাদের ক্ষতির কারণ হইতে বিলম্ব হইল না।

এই কলহ-কচকচির মধ্যে একা মোহিতলাল বাংলা-সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধ ও আলোচনা দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র ওজন ঠিক রাখিয়া চলিলেন। শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র ও আমার নিছক দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সমালোচনামূলক ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ারও দাঁড়িপাল্লার দক্ষিণ দিক সামাল দিয়া চলিতেছিল। মোটের উপর তখন আমাদের কলমে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের যেন বান ডাকিয়াছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা আত্মসমালোচনামূলক হওয়াতে অনেকের প্রশংসালাভও করিয়াছিল। বনবিহারীবাবুর "সাম্য" কবিতাটি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বহু সভায় এই কবিতার আবৃত্তি হইয়াছে, বহু রসিক ইহা মুখস্থ করিয়াছেন। প্রথম স্তবকটি এই :

হিস্টলজির পাতায় না কি মিললো প্রমাণ,
বর্তমানের ওম্যানরা সব ম্যানের সমান।
কাজেই স্ত্রীরা ফেল্‌লো ছেঁটে ঘাড়ের রোঁয়া,
ভু নাক দিয়ে ছাড়লো চুরুট-বিড়ির ধোঁয়া,
ভোট কুড়ালো, ফুঁড়লো কলেজ।
তেল পুড়ালো, ঢুঁড়লো নলেজ।
লিখলো নভেল, লিখলো নভেল,—লিখলো নভেল।
চেনাই কঠিন নর কি নারী, আস্‌লি না ভেল।

শিল্পী শ্রীহরিপদ রায়ের অপরূপ চিত্র লেখাটিকে আরও চমকপ্রদ করিয়াছিল। "বিচিত্রা"-ভবনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভার আমার রচিত কবিতার ক্যাপশনসহ যে "চিপোর্ট" (চিত্র+রিপোর্ট) বৈশাখে বাহির হইল তাহাও হরিপদ রায়ের

কার্টুন-কেরামতির বিশিষ্ট নিদর্শন। বস্তুত তিনি কার্টুন-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কমার্শিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে চলিয়া যাওয়াতে বাংলা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সেদিনের যুগাবনতিকে ব্যঙ্গ করিয়া আমার "সোনার পাথরবাটি" (বৈশাখ, ১৩৩৫) কবিতাটি এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, পরে কাজী নজরুল ইসলাম ইহাতে সুরযোজনা করিয়া স্বয়ং কলিকাতা বেতার-আসরে গাহিয়াছিলেন। অংশত তাহা এই :

হায় রে—
'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা!"—
বারি নাই একবিন্দু তবু পূর্ণ ঘড়া।
মন নাই মনস্তত্ত্ব যায় গড়াগড়ি,
মাথা নাই মগজের বহরেতে মরি।
পৌরুষ নাহিক আছে দর্প পুরুষের,
বিদ্যা নাই পেটে তবু ফোয়ারা বাক্যের
নিত্য উৎসারিত হয় হাটে মাঠে বাটে,
যে গরু দেয় না দুধ মরি তার চাটে।
হায় রে!…

হায় রে—
যে গুটি পাকিল পুন কাঁচিয়া তা যায়,
ধর্ম এসে ঠেকিয়াছে গোবর-ন্যাতায়।
বোমা কেঁচে হ'ল কালী-পূজার আতস
প্রেমে প'ড়ে বিপ্লবীর বিষম ধাধস।
পূজার মণ্ডপ হ'ল গাঁজার আসর,
রাষ্ট্রে ধর্মে ভূতো ক্ষেন্তি জাগিছে বাসর।
পড়িছে দশের পিঠে বেটনের গুঁতা,
হোটেলে বোতল শুঁকে নেতাদের ছুতা—
হায় রে!

আমাদের এই মানসিক অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া একটা হদিস বাৎলাইতে অধ্যাপক রঙীন হালদার 'শনিবারের চিঠি'র আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বন্ধুবর গোপাল হালদারের সুবাদে আমাদেরও দাদা, 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতে শুভানুধ্যায়ী ও সমর্থক। তিনি তখন পাটনা বি. এন. কলেজের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। সেখান হইতেই আমাদের অকুণ্ঠিত তারিফ করিতেন। "আর্ট ও মনোবিকলন" মতে অতি-আধুনিক লেখকদের অন্তরগহনের কামনারহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করিলেন। জ্যৈষ্ঠের প্রথম প্রবন্ধরূপে ইহা প্রকাশিত হইল। সোরগোল পড়িয়া গেল। কে লিখিল, কে লিখিল—প্রশ্ন চারিদিক হইতে উত্থিত হইল। গিরীন্দ্রশেখর আমাদের সমর্থক ছিলেন, তাঁহাকে দায়ী করা গেল না কারণ লেখক, গিরীন্দ্র-শেখরের "মনো-ব্যাকরণ" সংজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথের "মনোবিকলন" সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মনোবিকলনগত সমর্থন পাইয়া আমাদের জোর বাড়িল। অধ্যাপক হালদারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আজও পর্যন্ত বাতিল হইয়া ইতিহাসের কুক্ষিগত হয় নাই। সুতরাং তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে :

> আজকাল বাংলা মাসিক-সাহিত্যে সাইকো-অ্যানালিসিসের নামে যা চলিতেছে তা দেখিলে মনে হয়, অশিক্ষিতপটুত্ব আর যেখানেই চলুক বিজ্ঞানে চলে না। আচার্য ফ্রয়েড যদি বাংলা পড়িতে পারিতেন, তবে বোধ হয় তিনি পুস্তকপ্রণয়ন বন্ধ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন।...আজকালকার নবীন সাহিত্যিকের দল ফুল-ফলের সঙ্গে সারের কোনো প্রভেদ নাই বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা পড়িলে মনে হয়, মানুষ সজ্ঞানে কামোপহত হইয়াই ঘুরিয়া মরিতেছে। মনোবিকলনের মতে মানুষের বহু চিন্তা, বহু ইচ্ছা অ-জ্ঞানের যৌন-এষণা দ্বারা নিয়মিত হয় সন্দেহ নাই; এবং ইহা মানসিক নিয়তিরই (psychical determinism) অন্তর্গত। অ-জ্ঞানের যৌন ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইলেই যে, সকল চিন্তা সকল ক্রিয়াজ্ঞানের ক্ষেত্রেও

যৌনতার দিকে ধাবিত হইবে—তা নয়। সুতরাং, পৌরুষ-কামোন্মাদের (satyriasis) ও নারীয়-কামোন্মাদের (nymphomania) চিত্র আঁকিয়া যদি কেহ বলেন, ফ্রয়েডের মতে এই-ই আসল মানুষের চিত্র, তবে সেই সত্যান্বেষী মনোবিদ্‌কে অপমানই করা হইবে।···ফ্রয়েড কখনও "কামকে জীবনের কাম্য বস্তু" বলেন নাই, এবং আধুনিক সাহিত্যের এই যৌন অতিবেদনের (sexual hyperaesthesia) সহিত ফ্রয়েডের মনোবিকলনের কোনো সম্পর্ক নাই।

মোটের উপর, এবার আমরা আটঘাট বাঁধিয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম, ক্ষুরধার শাণিত ব্যঙ্গের তরবারি পাণ্ডিত্যের খাপে মুড়িয়া শুধু যুদ্ধজয় নয়, বিপক্ষকে তাক লাগাইবারও বাসনা জন্মিয়াছিল। এই ব্যাপারে শুধু একাধিক বঙ্গীয় পণ্ডিতই আমাদের সাহায্য করেন নাই, বিদেশী মহাপণ্ডিতদের কোটেশন সংগ্রহও বড় কম করি নাই। কিন্তু এই সাফাই সংগ্রহ আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। শুধু প্রতিপক্ষের কোটেশন-লাঞ্ছিত উত্তেজনাই আমাদিগকে স্বধর্মভ্রষ্ট করিয়াছিল। আমাদের সম্পাদক নীরদচন্দ্র তখন কোটেশন-প্রয়োগে অদ্বিতীয় ছিলেন—এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। লারসফুকো-প্যাস্কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত তাঁহার নখাগ্রে ছিল। সুতরাং কোটেশন-সংগ্রামে প্রতিপক্ষকে অচিরাৎ হটিতে হইল; নিছক ব্যঙ্গের দিক দিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ও এ বিদ্যায় কম পারদর্শী ছিলেন না। আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই কোটেশন-কণ্টকিত পাণ্ডিত্যযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যে এই পর্বেই শেষ হইয়াছে, নিতান্ত টেক্‌নিকাল প্রবন্ধ ছাড়া কেহ বড় একটা কোটেশন ব্যবহার করেন না। সাধারণ জনপ্রিয় প্রবন্ধে বিদেশী বা স্বদেশী পণ্ডিতদের নজিরও আজকাল দৃষ্টিকটু বিবেচিত হয়—বড় একটা দেখা যায় না; আমাদের ব্যঙ্গে চূড়ান্ত প্রয়োগের দ্বারা এই পদ্ধতির প্রায় জীবনান্ত ঘটাইয়াছিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

"ধর্মরক্ষা"

ঈর্ষা হইতেও হীনতর রিপু হইতেছে মদ বা গর্ব, এবং মাৎসর্য বা পরশ্রীকাতরতা অপেক্ষা মারাত্মক হইতেছে ধর্মের বা পর-কল্যাণের ভান। "প্রমথ চৌধুরী" প্রসঙ্গে বারংবার আক্রান্ত হইয়া আমরা অকারণে উদ্ধত ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলাম। প্রতিপক্ষ দলে ঈর্ষা করিবার মত কাহাকেও না পাইয়া আমরা পাণ্ডিত্যমদভরে স্বয়ং চৌধুরী মহাশয়কেই নস্যাৎ করিতে বসিলাম। পরশ্রীকাতরতায় প্রবৃত্তি না হওয়াতে সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া অতি-পাণ্ডিত্যের ভানও করিয়া ফেলিলাম। আমাদের শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ এই বাড়াবাড়িতে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে বিলম্ব হইল না; তিনি সম্মানের উপহার অর্থাৎ "কম্‌প্লিমেণ্টারি" 'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী সংখ্যা স্বহস্তে "রিফিউজড্"—"অগ্রাহ্য" লিখিয়া ফেরত পাঠাইলেন। প্রধানতম পৃষ্ঠপোষকের এই বিমুখতায় সাময়িক মদোন্মত্ত আমাদের শঙ্কা বা লজ্জা হওয়া দূরে থাকুক, আমরা চৌধুরী মহাশয়কে অপদস্থ করিবার জন্য আরও নির্মম হইয়া উঠিলাম।

অবশ্য কিছু উত্তেজনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতেও আসিয়াছিল। প্রমথ-প্রসঙ্গে যতই মনোমালিন্য ঘটুক, রবীন্দ্রনাথের স্নেহে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার একটা সুযোগ স্বয়ং মা সরস্বতী ঘটাইয়াছিলেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন—২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮, কলিকাতায় সিটিকলেজ-সংলগ্ন রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে সরস্বতীর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার দাবিতে কলেজের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের সংঘর্ষজনিত গোলযোগের সূত্রপাত হয়। অন্যায় কারণে আন্দোলনের

নামে ছাত্রসমাজের ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার ইহাই আরম্ভ, আমি আমার জ্ঞানে এইরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনা ইহার পূর্বে ঘটিতে দেখি নাই। সুতরাং ইহা একটি গুরুতর জাতীয় শুভাশুভমূলক ঘটনা, ঘটনাটিকে ঐতিহাসিকও বলা চলিতে পারে। তদানীন্তন বহু স্থানীয় প্রসিদ্ধ নেতা অন্যায় জানিয়াও এই ব্যাপারে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়া নেতৃত্ব কায়েম করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে. এল. ব্যানার্জি), শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতারা পুরোভাগে দাঁড়াইলেন; অমৃতলাল বসু, পঞ্চানন তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্তক বংশধর বিজয় সিংহ প্রভৃতি হিন্দু-কুলতিলকরাও কোমর বাঁধিয়া যোগ দিলেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘোর লাল কালিতে ছাপা প্রচারপত্রে "হিন্দু রিলিজিয়ন ইন্‌সাল্টেড, ডোণ্ট জয়েন সিটি কলেজ" প্রত্যাদেশের মত জনসাধারণের ভীতির সঞ্চার করিল। সিটি কলেজের যায়-যায় অবস্থা। চারিদিকে "সাজ-সাজ, মার-মার, ভাঙ-ভাঙ" রব উঠিল; কাটতি-বৃদ্ধির সুযোগ বুঝিয়া কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র চমকপ্রদ ছবি এবং মিথ্যা ও কল্পিত সংবাদ ছাপিয়া ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। পথে পথে, পার্কে পার্কে সভা; হ্যাণ্ডবিল এবং কেচ্ছা ও ছড়া-পুস্তক যে কত বাহির হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। সিটি কলেজের নিরীহ কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গনিলেন, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ অকারণে এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়া কোণঠাসা হইতে বসিলেন। ক্ষিপ্ত ছাত্রসমাজকে শান্ত করিবার জন্য 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার আসরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হইলেন। 'শনিবারের চিঠি'র মারফতে আমরা কয়েকজনও সিটিকলেজ-পক্ষে যোগ দিলাম, তবে নিতান্ত শান্ত নিরীহ ভূমিকায় নয়, কিঞ্চিৎ "যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি" ভাবে। আমাদের উষ্মা যে ন্যায়ানুমোদিত—এই বিশ্বাস আমাদের ছিল। কেন ছিল তাহা বুঝাইতে আসল ঘটনার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, কয়েকটি সংবাদপত্রের সংবাদে

ও চিঠিপত্রে নিছক মিথ্যা বিবরণী তখন প্রচারিত হইয়াছিল। ঘটনা এই :

রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের কয়েকজন ছাত্র সেখানেই প্রতিমা স্থাপনপূর্বক সরস্বতীপূজা করিতে চাহিলে কর্তৃপক্ষ তাহাতে রাজী হন না। পরে তাঁহাদের অনুমতি অনুসারেই স্থির হয়, ছাত্রাবাসের বাহিরেই পূজা হইবে। কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রেরা রাতারাতি ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার বন্দোবস্ত করিলে ছাত্রাবাসের পরিচালক অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় তাহাতে বাধা দেন। ইহা সত্য যে, তিনি এই সময়ে অধ্যাপকোচিত স্থৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশ্য এই কারণে তিনি ও কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনধিকারী ছাত্রেরা অন্যায় অধিকার সাব্যস্তের এই সুযোগ ছাড়েন নাই, তাঁহাদের তাতাইবার লোকেরও অভাব হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা শহরময় রটিয়া গেল যে, মৈত্র মহাশয় শুধু সরস্বতী-প্রতিমাই ভাঙিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করেন নাই, লাঠির আঘাতে কলেজের দারোয়ানদের নিত্যপূজিত শিবলিঙ্গও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বাস্, আর যায় কোথায়! বহুদিনের বহু লোকের যত্নে ও অর্থে তিলে তিলে গড়িয়া তোলা একটি জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিবার পক্ষে সেদিন এই সম্পূর্ণ মনগড়া সংবাদই যথেষ্ট বিবেচিত হইল। এইরূপ ঘটনা সেই প্রথম বলিয়া আমরাও কোমর বাঁধিয়া প্রতিবাদ করিতে ছুটিয়াছিলাম; আজ হইলে নিশ্চয়ই সে সাহস করিতাম না। তখনও "চল্‌বে না, চল্‌বে না" শ্লোগান বা ধ্বনির আবির্ভাব এ দেশে ঘটে নাই।

যাহা হউক, এক-সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইলাম। রবীন্দ্রনাথ 'মডার্ন রিভিউ'য়ে এক পত্র এবং ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে "সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী-পূজা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এই প্রবন্ধের

মূল পাণ্ডুলিপি এবং পর পর দুইবার ব্যাপক পরিবর্তন সম্বলিত প্রুফ আমার নিকট আছে। অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, সত্য কথা বলিবার জন্যও রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'তে আমরা ছিলাম বেপরোয়া। আমরা বলিতে একা প্রায় আমিই, অন্যেরা ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কের দরুন কড়া কিছু লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। আমি নির্ভেজাল হিন্দু, সুতরাং হিন্দুর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিতে আমার দ্বিধা হইবার কথা নয়; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দের নজির সম্মুখে জ্বলজ্বল করিতেছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও তৎকালীন ব্রাহ্মপ্রধানদের সাময়িক সঙ্কীর্ণতার দরুন তখন হিন্দুত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার মন্তব্যেও জোর পাইলাম। তিনি লিখিলেন:

> আমাদের দেশে বরযাত্রীরা প্রায়ই নিরুপায় কন্যাকর্তার অতিথি-রূপে তাকে অন্যায় উৎপীড়ন করে থাকে। তাতে প্রমাণ হয়, যেখানে নিরাপদে জোর খাটাতে পারি সেখানে উপদ্রবের দ্বারা অন্যকে অপদস্থ ক'রে নিজের প্রভুত্ব প্রমাণ করাতে আমাদের আনন্দ। এই মনোবৃত্তিকে গৃহস্থের ঘরে, বা শিক্ষার ক্ষেত্রে, বা রাষ্ট্রিক দলাদলিতে যদি আমরা সর্বদা প্রবল হতে দেখি, যদি দেখি পরের মতকে গায়ের জোরে চাপা দিতে, পরের বৈধ স্বাতন্ত্র্যকে অবৈধ উপদ্রবের দ্বারা বিপর্যস্ত করতে আমাদের সঙ্কোচ নেই, তবে সেটা কি গভীর উদ্বেগের বিষয় নয়? প্রতিমাপূজার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও যে সিটি কলেজকে দেশের সকল সম্প্রদায় অনায়াসে এতকাল স্বীকার ও ব্যবহার ক'রে এসেছে আজ তাকে নানা উৎপাতে ধ্বংস ক'রে দেওয়া দুঃসাধ্য না হতে পারে কিন্তু এই আঘাতে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায়ের মনে যে কাঁটা-গাছ রোপণ ক'রে দেওয়া হবে, সেটা দিয়ে আমাদের এই শতধাবিচ্ছিন্ন দুর্ভাগা দেশে আস্ফালন করাতে কি পৌরুষ আছে, না তাতে ধর্মবুদ্ধি বা কর্মবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়? সবশেষে এঁদের কাছে আমার এই

বক্তব্য, নীতিকথা যখন যেমন সুবিধা তখন তেমন ক'রে বলা চলে না। পরের প্রতি আমার ব্যবহারে ও আমার প্রতি পরের ব্যবহারে কর্তব্য-নীতির পার্থক্য করা অসঙ্গত। ভারত-রাজ্য-শাসন যাঁদের হাতে তাঁরা খৃষ্টান,—জোর আমাদের সকল পক্ষের চেয়েই তাঁদের বেশি। সেই সঙ্গে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি খৃষ্টানের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও খৃষ্টান কর্তৃপক্ষ আমাদের গৃহে, দেবালয়ে, বিদ্যায়তনে জোর ক'রে খৃষ্টান উপাসনা-বিধির প্রবর্তন করেন নি।...যাঁরা গোবর জল, পাঁক ও পানের পিকবর্ষণ, জুতোর মালা ও লগুড়াঘাতের সাহায্যে তাঁদের পবিত্র ধর্মকে জয়যুক্ত করবার পৌরুষ প্রকাশে উদ্যত ও এই রোমাঞ্চকর অধ্যবসায়ে দেশাত্মবোধী ধার্মিকদের কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্চেন, অন্তত বাধা বা লেশমাত্র তিরস্কার পাচ্চেন না, একান্ত মনে আশা করি, তাঁদেরই শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ গুরুদের কাছ থেকে আমাদের ম্লেচ্ছ কর্তারা যেন ধর্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ না করেন।

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলির প্রয়োজনীয়তা আজিও নিঃশেষিত হয় নাই। অন্যায় অবাঞ্ছিত জবরদস্তি শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, সমাজে ও রাষ্ট্রে দিনে দিনে ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আমি আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে একটি মারাত্মক কালাপাহাড়ী স্যাটায়ার "হিন্দু রিলিজিয়ন ইনসাল্‌টেড—(স্বপ্নদর্শন)" প্রকাশ করিলাম। অশোক "এই কি হিন্দু জাগরণ" এবং যোগানন্দ "নায়মাত্মা চৌর্য্যেণ বা লভ্যতে" লিখিলেন বটে; কিন্তু আমার রাইফেলী বুলেটের তুলনায় সেগুলি মৃদু লাঠিচার্জ মাত্র বলিয়া বোধ হইল। 'মধু ও হুলে' আমার নিবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রাবণে বাহির হইল আমার "ধর্ম্মরক্ষা"—সচিত্র ব্যঙ্গ-কবিতা। সিটি কলেজকে ধ্বংস করিতে অ্যালবার্ট হলে যে বিরাট সভা হইয়াছিল তাহাকেই ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম। কবিতাটি সেকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল, নেতাদের সদৃশ-প্রতিকৃতি-সম্বলিত কার্টুন আঁকিয়া শ্রীহরিপদ রায় বিশেষ বাহবা পাইয়াছিলেন। আমি

যাবতীয় বক্তার কুলজী-কোষ্ঠী ধরিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। এই সিটি কলেজের সরস্বতী-পূজা ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্র আমাদের "টার্গেট" হইয়াছিলেন, পরে দীর্ঘকাল প্রধানত এই রাগেই তাঁহার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়াছিলাম। "ধর্ম্মরক্ষা" কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ :

অ্যালবার্ট হলে মহতী সভা,
টিকিতে বাঁধিয়া রক্তজবা
আসে দর্শক, আসিল শ্রোতা—
যেন বর্ষার খরস্রোতা
গঙ্গা নদীর গেরুয়া বান,
টিকি খাড়া আর খাড়া যে কান।
সভা গমগম স্টেজের মতো,
গোটা ও অটুট চেয়ার যত,
দেয়ালে ছিল না পানের পীচ,
সমানে ভরিল উপর নীচ।
কেশব সেনের মূর্তিখানা
বক্ষে সবার দেয় যে হানা;
বামেতে দত্ত অশ্বিনীর—
তাঁর দিকটায় জমিল ভিড়!

*   *

খোকা ভগবান আসিল নিজে
চোখের জলেতে বেজায় ভিজে।
বুকেতে কি জানি ঘটিল দোষ,
সাক্ষী বৈদ্য কুলীন বোস।
দেবদ্বিজে অতিভক্তিমান,
সন্ধ্যা করিয়া তামাক খান।
জগন্নাথের মহিমা জানে
চুল ছিঁড়ে আসে টিকির টানে।

ম্লেচ্ছেরে কহি প্যাক্ট-বচন
টিকির ধর্মে দেছেন মন।

* *

কেম্‌ব্রিজে আজ গজায় টিকি,
এল নবযুগ বৈদ্যুতিকী।
ছোটে গোঠে গোঠে খোকার বাণী
নববেদ বলি তারে বাখানি।
পণ্ডিতে কয়, "কল্কি নিজে
ধারণ করিল বি-পি-সি-সি যে!"
বিবাহযোগ্যা পান নি ক'নে
কেহ নাই বামে সিংহাসনে।
পদধূলি দিয়ে সে দুখ ভুলে,
নাক ডাকে শুধু চিতিয়ে শুলে।
হিন্দুয়ানির পাণ্ডা পাঁড়—
জয়রব তাই উঠিল তাঁর।...

আমার 'বঙ্গরণভূমে' কাব্যে সম্পূর্ণ কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই প্রমথ-দূষণ-ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ শান্ত হইবেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। সেই শ্রাবণেরই (১৩৩৫) 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের খাস কলমচী শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর নামে 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রবন্ধ বাহির হইল—"সাহিত্য-ব্যবসায়"। ইহা দক্ষতর হস্তের বেনামী লেখা বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিলেন। তবে হাতের লেখার মত রবীন্দ্রনাথের ভাষাও যে চক্রবর্তী মহাশয় অনুকরণ করিতে পারিতেন না, এমন কথা আমরা ভাবি নাই। তিনি যে যথেষ্ট মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রবন্ধটির উদ্ধৃতাংশ হইতেই তাহা উপলব্ধি হইবে:

এ কথা সত্য, বাংলা ভাষায় সম্প্রতি সহসা তারুণ্যের আস্ফালন সহকারে সাহিত্যবিকার দেখা দিয়েচে। সেটা বিলিতি ব্যাঙো এবং

দরিদ্র নারায়ণের আর্তস্বর, কুশ্রী-কাল্পনিকতা, আত্ম-ঘোষণা ও মহত্ত্বের প্রতি অশ্রদ্ধায় মিশ্রিত ব্যাপার। অতি-তারুণ্যের পিছনে যশোবণিক সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট ছিল, অধ্যাপনজীবীদেরও অসদ্ভাব ঘটে নি, কিন্তু মোটামুটি রচনায় তাঁরা প্রকাশ্যত বিধর্মী; ধার্মিক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হ'ল সর্বশেষে। এই সমাজ-সংস্কারকের দল সাহিত্যের কমলবনে প্রবেশ করেন পঙ্কোদ্ধারের সাধুসঙ্কল্পে; রাতারাতি এঁরা সাহিত্যের নীতি, আদর্শ, গতিবিধির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ক'রে দেবেন, প্রশংসাপত্র, ব্যঙ্গচিত্র, অভদ্র সমালোচনা এঁদের হুকুমজারি, সাহিত্য-সিংহাসনে এঁরা শাসনদণ্ডধারী।...এই মলিন পন্থায় সাহিত্য-সমালোচনার সংযম ও শিষ্টাচার পরিত্যাগ ক'রে একদল বিদ্যাদাম্ভিক লেখক শ্রেষ্ঠমান্য সাহিত্য-স্রষ্টা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে ইতরভাবে আক্রমণ করলেন।

অর্থাৎ আমরা সরস্বতী-পূজার ব্যাপারে হিন্দুধর্ম-ধুরন্ধরদের চোখে হইলাম বিধর্মী কালাপাহাড় এবং সাহিত্যে রবীন্দ্রানুকারীদের নিকট হইলাম ধার্মিক ব্যবসায়ী। রবীন্দ্রনাথের কলমচীর খোঁচা খাইয়া আমাদের উত্তপ্ত মগজ উত্তপ্ততর হইয়া উঠিল; এভারেস্টের দিকেও হাত বাড়াইব কি না এইরূপ জল্পনা আমাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধের রচয়িতা যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—এই জনরব রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছিল। ফলে যাহা ঘটিল ১৩৩৫ শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি' হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি। অশোক চট্টোপাধ্যায় "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধে দশ দফায় অমিয় চক্রবর্তীকে একরূপ "নিকেশ" করিয়া সর্বশেষে লিখিলেন—

ভবিষ্যতে অমিয়বাবু কিছু লিখিলে, আমাদের অনুরোধ যেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষা অলঙ্কার ও ভাবের বৃথা অনুকরণের চেষ্টা না করেন। আটপৌরে সংস্কার ও সাধারণ বুদ্ধির কথা সহজ ভাষায় প্রকাশ করিলে লেখক-পাঠক উভয়েরই সুবিধা।

মোহিতলাল "অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী বনাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এই আলোচনায় লিখিলেন—

> স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানিয়েছেন যে, জনরব মিথ্যা, ও-লেখা তাঁর নয় এবং ও-লেখার সঙ্গে তাঁর সহানুভূতিও নেই। জানি, জনরবটা বাইরের, আর রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ব্যক্তিগত, অর্থাৎ ভিতরের, এতে ক'রে জনরবকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সবটা প্রকাশ করবার অধিকার আমাদের নেই। এই মন্তব্য শুনে আমরা আবার ভাল ক'রে উক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধ প'ড়ে দেখলাম। এবারে আর সংশয় রইল না, সত্যই তো, এ লেখা রবীন্দ্রনাথের হতেই পারে না। অসম্ভব!

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথার উপরেই রহিয়া গেলেন; কিন্তু প্রমথ চৌধুরীকে আমরা ছাড়িলাম না, জের চলিতেই লাগিল। আমরা যখন তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে সচেষ্ট, তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক "ভদ্রবিবুধমণ্ডলী" সমালোচনায় নিম্নোদ্ধৃত উচ্চ আদর্শ দেখাইতে লাগিলেন:

[সম্পাদক নীরদচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া লিখিত]

শনিবারে পাও বুঝি সজনীর চিঠি ?
যাহা দেখ মার শুধু নাসিকার খোঁচা,
বোঁচা-নাক গুরুজীর ছাত্র তুমি ওঁচা।
কাছের কলেজে যাও নাম তার সিটি॥
সজনী গায়েতে দেয় গোলাপী সেমিজ,
পছন্দ হয় না তব,—ভারি বেতমিজ!
কে জানে এমন তুমি ডাহা ইডিয়ট!

সুভাষচন্দ্র সরস্বতী-পূজা ব্যাপারে ছাত্রদের পক্ষে জেদ প্রকাশ করাতেই মামলা মিটিতে দেরি হইয়াছিল। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক এবং তাঁহাকে জড়াইয়া আমি তখনই "মর্ত্য হইতে সরস্বতী-বিদায়" কবিতাটি লিখিয়াছিলাম:

কাতরে ভারতী কন, "শুন শুন দেবগণ,
আমার দুর্গতি ব্যাখানিব,
মর্ত্ত্যেতে বাঙ্গালা নাম আছে অনঙ্গের ধাম"—
সভাজন কহে, "শিব, শিব!"
"সেথায় তরুণ দল জীবনে হয়ে বিফল
ব্রতী হ'ল সাহিত্যিক-ব্রতে,
মাসিক ছাপিয়া তারা অধীনীরে করে তাড়া—
অঙ্গ মোর ভরি দিল ক্ষতে।
বঙ্গের কি গাব গুণ, তরুণ টানিছে গুণ,
নয়ন অরুণ বারুণীতে;
ভাসিতেছি বিভু স্মরি' কলার মান্দাস 'পরি
প্রগতি-কল্লোল-কালিন্দীতে।
অনঙ্গ ধরিয়া অঙ্গ শান্তি মোর করে ভঙ্গ,—
পীড়িতা নিতম্ব-স্তনভারে
লোলুপ-লালসা-লালা মুখ-বুক করে জ্বালা,
ডোবে পদ্ম পঙ্কের পাথারে।
মরাল বাহন মম হয়েছে শকুনি সম,
শ্মশানে করিছে শবাহার,
বীণা ফেলে ঝাঁটাগাছি দেছে, তাই ধ'রে আছি
শতমুখী-সঙ্গীত-আধার।
বিমলিন নগ্ন গায় বসাল আমারে, হায়,
রাজপথে জনতার মাঝে,
কামাতুর দৃষ্টি হানি মোরে করে টানাটানি
বাঁচি আমি যদি মরি লাজে।
হংসপদ্মাসন যার আকাঙ্ক্ষিত কমলার,
বীণা যার মোহিল ত্রিদিব—
অনঙ্গের রঙ্গধামে মর্ত্ত্যে খ্যাত বঙ্গনামে"—
দেবগণ কহে, "শিব, শিব!"
"সে নন্দন-নন্দিতার সীমা নাই লাঞ্ছনার
প্রজাপতি করহ বিহিত,

ক্লেদপঙ্কে করি বাস ছিন্নদেহ নগ্নবাস,
সবি মোর লাগে বিপরীত।
আমার পূজার ছলে মিলেছে তরুণদলে
আমারে করিতে বহিষ্কার,
নিত্য যেথা পূজা মোর সেথায় পশিয়া চোর
ধর্মছলে করে অধিকার।
পূজা যেথা সত্যকার সেথা ঢোকে মিথ্যাচার
মোরে নিয়ে পিশাচের খেলা
সহে না হে চতুর্মুখ, যন্ত্রণায় ফাটে বুক,
হে বিধি, বাঁচাও এই বেলা।"

নীরব চতুরানন সজল হ'ল নয়ন,
ক্ষণ পরে কন মৃদু হাসি,
"বন্ধ এবে যজ্ঞযাগ, দেবতার রাজ্যভাগ
জনগণ লইতেছে আসি;
তুমি মিছা কর শোক, দেবের এ দেবলোক,
মর্ত্যলোকে দেবতা গণেশ
ভোগ পাবে সুরসাল গণবাদ যতকাল
প্লাবিত করিবে বঙ্গদেশ।
"খোকা ভগবান" নামে গজানন বঙ্গধামে
সম্প্রতি খুলেছে রাজ্যপাট,
তুমি মাতা এস চ'লে চড়ি স্বর্গ-চতুর্দোলে,
বঙ্গভূমি হউক স্বরাট।"

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষে আরম্ভ হইয়া প্রায় জুলাইয়ের শেষাশেষি আসিয়া সিটি কলেজের গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ধাক্কার পর এত দিন ধরিয়া এত অধিক ছাত্রকে আর শিক্ষাস্থানভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় নাই। ১৩৩৫ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বিবিধ প্রসঙ্গে" "সিটি কলেজে মিটমাট" শিরোনামায় লিখিলেন:

সিটি কলেজ সমস্যার উপযুক্তরূপ সমাধান হইয়া যাওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। যে সময়ে বাংলার সমগ্র হিন্দুজাতি একজোট হইয়া সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের ভিতর দিয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময়ে এরূপ একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটিয়া আমাদের বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, বহু অন্ধ বা স্বার্থান্বেষী প্রাচীনপন্থী লোক এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া যুবকমহলে নেতার আসন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদিগের মতামত বর্তমান কালের উন্নতিশীল হিন্দুর আদর্শের বিরুদ্ধ হওয়াতে যুবকদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ সুফলপ্রদ না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল।

দেখিতে দেখিতে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র বৎসর ঘুরিয়া গেল, ভাদ্র মাসে (১৩৩৫) উহা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। অর্ধ বৎসর সাপ্তাহিক জীবনশেষে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে যে নকল "জুবিলী সংখ্যা" বাহির করিয়াছিলাম তাহারই ধারা ধরিয়া 'শনিবারের চিঠি' মাসিকের উননবনবতি-শতবার্ষিকী বেশ ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হইল। অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ অবাধ আড্ডা। সেকালে কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজ উদ্দেশ্যহীন আড্ডা দিতে জানিত। সুকিয়া স্ট্রীটের (অধুনা কৈলাস বোস স্ট্রীট) কান্তিক প্রেসে ভাঙা 'ভারতী' দলের আড্ডা, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে গজেনদার (ঘোষ) বাড়িতে সর্বদলীয় সাহিত্যিকদের কিঞ্চিৎ আদিরসাশ্রিত আড্ডা, পটলডাঙায় 'কল্লোল' দলের বোহেমিয়ান আড্ডা, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপর পাশাপাশি বরদা এজেন্সীতে 'কালি-কলমে'র এবং আর্য পাবলিশিং হাউসে শশাঙ্ক-বন্ধুদের অপেক্ষাকৃত উন্নাসিক আড্ডা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে শিশুসাহিত্যস্রষ্টা, ভ্রমণবিশারদ ও যাযাবরদের রাজা-উজীরমারী আড্ডা (যাহা ১৩৩৫ বৈশাখ হইতেই 'রসচক্রে'র আড্ডায় পরিণত হয়), 'উপাসনা' কার্যালয়ে রাজনীতিগন্ধী সাহিত্যিকদের আড্ডা, 'আনন্দবাজার' গৌরাঙ্গ প্রেসে লাপসি-

গেরুয়াভক্ত সঙ্কটত্রাণী সাংবাদিকদের পলিটিকোসোশ্যাল-লিটারারি আড্ডা, 'বঙ্গবাণী' আপিসে বিশ্ববিদ্যালয়-আশ্রিত পণ্ডিত সাহিত্যিকদের আড্ডা এবং 'বিচিত্রা'য় অভিজাত সাহিত্যিকদের আড্ডা প্রধান ছিল—কয়েকটি ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছিল, কয়েকটির ভাঙন-দশা। কিন্তু আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা রসে ও রঙে, চায়ে ও সিগারেটে অন্য সকল আড্ডাকে প্রায় ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যহ প্রায় অষ্টপ্রহরব্যাপী আড্ডা, মুখাগ্নি অনির্বাণ। স্বতন্ত্র ঘর বা আশ্রয় ছিল না, 'প্রবাসী' প্রেসের ম্যানেজারের অপ্রশস্ত কক্ষই আড্ডার জাদুস্পর্শে বৃহদায়তন হইয়া উঠিত। নীরদ, অশোক, যোগানন্দ ও আমি তো সর্বদা থাকিতামই; মোহিত, হেমন্ত, গোপাল, হরিপদ, সুনীতিকুমার, কালিদাস এবং ঢাকা, রংপুর ও পাটনা হইতে আসিলে সুশীল, রবি ও রঙীন নিয়মিত আসিতেন। এতদ্ব্যতীত, কবি হেমচন্দ্র বাগচী, অধুনা-নিরুদ্দিষ্ট কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, বন্ধু সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি জীবনময় রায়, হিরণকুমার সান্যাল, দিলীপ সান্যাল, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ জীবনকালী রায় সুবিধা পাইলেই আসিয়া জুটিতেন। আমাদের আড্ডা সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কৌতুককর কথা স্মরণে আছে। একদিন তিনি একটু অসময়ে আপিসে আসিয়া আমার সহিত ছাপাখানা-সংক্রান্ত কোনও প্রয়োজনীয় কথা বলিবার জন্য দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা এতই মশগুল ছিলাম যে তাঁহাকে লক্ষ্য করি নাই। তিনি তাঁহার স্বস্থানে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, "গিয়েছিলাম তো কিন্তু ধোঁয়ার চোটে বেলুনের মত উড়ে ফিরে এলাম।" এই আড্ডাই 'শনিবারের চিঠি'র প্রাণ ছিল। বিপিনবাবুর রেস্টুরেন্টে এবং মতিবাবুর চায়ের দোকানে (দুইটিই আপার সারকুলার রোডে অবস্থিত ছিল) মাঝে মাঝে আড্ডা স্থানান্তরিত হইত, তখন খরচের ভার পালা করিয়া বহন করা হইত। আমরা কচিৎ কদাচিৎ

গজেনদার আড্ডায়, 'আনন্দবাজার' গৌরাঙ্গ প্রেসের আড্ডায় অথবা 'কালি-কলমে'র আড্ডায় গিয়া যোগ দিতাম। অন্যত্র আমাদের গতিবিধি ছিল না। কিছুকাল পরে অবশ্য 'প্রবাসী' প্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া আমরাই কান্তিক প্রেসের ভাঙা হাটে আসর জমাইয়াছিলাম। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সহিত এই আড্ডাতেই পরিচয় ঘটে।

'শনিবারের চিঠি'র শতবার্ষিকী-আড্ডা স্মরণীয়। এই আড্ডাতেই আমার "শনিবারের চিঠি centenary" কবিতাটি পঠিত হইয়াছিল। নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে সেদিনকার সাহিত্য-পরিবেশের এবং আমাদের ভবিষ্যতের একটা ছবি ছিল, যাহা চিত্তাকর্ষক ও স্মরণীয়:

ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার—
নবনবতি বছর পরে শতেক হবে পার।
* * *
বলত যারা, নোংরা কর ফিরি—
সেদিন তারা সবাই এসে বসবে তোমায় ঘিরি।
জানি তাদের রাত্রি হবে, যোগ দেবে এই মহোৎসবে
কায়াবিহীন তখন সবাই ছায়া অশরীরী।
তাদের নাতি-নাতিনীরা কেউ প্রগল্‌ভ, কেউ সুধীরা,
উপল-পথে কেউ বা চপল ঝরনা ঝিরি-ঝিরি—
যেথায় যত তরুণ আছে রঙিন হবে তোমার আঁচে,
'কালি-কলম', 'প্রগতি' আর 'কল্লোল' সুচ্ছিরি!

"মণি-মুক্তা" তখন হবে খাঁটি,
বীণাপাণি উল্লাসেতে সাজবে পরিপাটী।
সেদিন নরেশ রাধাকমল বস্তি মাঝেই রইবে অমল,
পাখোয়াজে বোল ফোটাবে ধূর্জটিরই চাঁটি।
জানি সেদিন 'হসন্তিকা' পরবে সত্য হাসির টীকা,
"সওদা" ছেড়ে 'ধূপছায়া' তার তুলবে খুঁটিনাটি।

সেদিন তোমায় আড্ডা-ঘরে মিলবে এরা পরস্পরে
আসবে তারা আজকে যারা দুয়ার আছে আঁটি,
"মণি-মুক্তা" তখন হবে খাঁটি।

কত কথাই জাগছে আজি মনে,
প্রকাশ করতে ভাষা না পাই থাকুক সংগোপনে।
ভাবীদিনের প্রেমেন কি সে দৈনিকেতে কলম পিষে
মনের দুখে কাল কাটাবে আঁধার কক্ষ-কোণে?
শৈলজা কি ছুটবে কাশী মুরলী কি ছাড়বে বাঁশি,
গজল-কবি ভজবে নবী ক্রমিক বিবর্তনে!
অচিন্ত্যেরই চিন্তা-জ্বরে আগুন দেবে বুদ্ধ ঘরে,
ডুব দেবে কি শরৎচন্দ্র শ্রীরূপনারায়ণে?
কত কথাই জাগছে আজি মনে।

* * *

মরুর পথে আজকে অভিযান,
পূর্ণিমাতে অমানিশার মিলবে কি সন্ধান?
আজকে যারা আঁধার পথে ক্ষীণ আলোকে কোনো মতে
অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া চলছে গেয়ে গান—
সেদিন শনিমণ্ডলীরা পাহাড়-ভাঙা পথের পীড়া
বুঝবে কি হায়, গলায় প'রে বিজয়-মাল্যখান?
তুমি শুধুই জানবে সখী, কোন্ সোনা আর চকমকি
আজকে নিবিড় অন্ধকারে করল দীপ্তিদান!

* * *

তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে,
নবাত-নব বছর পারের টুকরা কালের তীরে!
যেথায় মোরা কজন মিলে ঝাঁপ দিয়েছি হিমসলিলে
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নীরে।
তারা কি আর করবে মনে জন্মদিনের শুভক্ষণে
দেখবে চেয়ে এড়িয়ে আসা আঁধার চিরে চিরে!

সেদিনে হায় কোন্ ষোড়শী বাতায়নে রইবে বসি'
মোদের ছন্দ বাজবে কি তার চরণ-মঞ্জীরে ?
তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে !

কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি,
ক্ষতি কি তায়, পৃথ্বী বিপুল, কাল সে নিরবধি।
মোরা জানি নূতন এসে নেবে তোমায় ভালবেসে
সাগরপানে বিপুল বেগে বইবে তব নদী।
মোদের শ্মশান-ভস্ম 'পরে জানি সুদূর যুগান্তরে
রইল পাতা ভাবী কবির অচল পাকা গদি।
আজ জেনেছি ছুটবে তুমি প্লাবন করি নূতন ভূমি
নারবে বাধাবন্ধ কোনো রাখতে তোমায় রোধি।
কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি।

'শনিবারের চিঠি' নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারিবে কি না জানি না, আমার আশার একের চার ভাগ পূর্ণ হইয়াছে; সবাই না আসুন অনেকে আসিয়াছেন, আমি নূতনদের হাতে সকল ভার সমর্পণ করিয়া কালের স্রোতে হারাইবার অপেক্ষায় আছি।

সিটি কলেজের হাঙ্গামা মিটিলেও 'শনিবারেব চিঠি'র "ধর্মরক্ষা"র জের কিন্তু প্রথম বৎসরেই মিটিল না। বাংলা দেশের দুর্বলচিত্ত নরনারীদের ধর্মাশ্রমব্যাধির বিরুদ্ধে কঠিন সমরে অবতীর্ণ হইলাম—দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া হইতেই। এই সর্বনাশা ব্যাধি তখনই অত্যন্ত প্রবল ছিল; এখন যে প্রশমিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-নেতারা নিজেদের স্বার্থে এই বিষয়ে কখনই সচেতন হইতে চাহেন নাই, কিন্তু ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে দিনে দিনে দুর্বল করিয়া বাঙালী জাতিকে অধঃপাতের চরম সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছে। ভুয়া গণৎকার ও ভুয়া ধর্মাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ মৃত্যুর প্রায় মুখামুখি দাঁড়াইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি একা কি ভাবে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম, সে কাহিনী শুনাইতেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজদ্বারে

মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই অর্থাৎ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে আমার "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" নামক উপন্যাসের প্রথম কিস্তি বাহির হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালীর মেরুদণ্ড শক্ত ছিল। ভূদেব-রাজনারায়ণের স্বদেশ-স্বধর্মমূলক প্রবন্ধ-পুস্তকাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', স্বামী বিবেকানন্দের রচনা-বক্তৃতা-পত্রাবলী, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-রচিত ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডির জীবনেতিহাস, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ, অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ' প্রভৃতি বাংলা দেশের তৎকালীন যুবসম্প্রদায়কে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া কতকটা চরিত্রবল অর্জন করিতেছিল। এইভাবে বাংলা দেশের "ভদ্রলোক"-সম্প্রদায়ের যুবকেরা যে শক্তি অর্জন করিয়াছিল, রাউলাট বা সিডিশন কমিটির রিপোর্টে তাহার পরিচয় আছে। তাহার পর বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বপ্রেমের ধাক্কায় বাঙালীর পায়ের তলার মাটি সরিয়া গিয়া তাহাকে কতখানি পরমুখাপেক্ষী ও উচ্ছৃঙ্খল করিল সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে তাহারও পরিচয় মিলিবে। বহু বহু শতাব্দীর ভারতীয় ঐতিহ্য এবং উনবিংশ শতকের বনস্পতিতুল্য সাধকদের সুবিপুল সাধনার উপর বাঙালীর ভবিষ্যতের যে ভিত্তি রচিত হইতেছিল, আকস্মিক বিশ্বসঙ্কটে তাহা নড়িয়া গেল, এবং ঝড়ের ঝাপটায় বিদেশ হইতে উড়িয়া আসা কাঁটা গাছের উচ্চ ডালের উপরে বাঙালী-তারুণ্যের পুচ্ছ আন্দোলিত হইতে লাগিল। জীবনের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার খুব স্পষ্ট প্রকট

সাক্ষ্য নাই। সাহিত্যে ছাপাখানার দীর্ঘস্থায়ী কালিতে সেই সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে এবং ইহারই বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিয়াছিলাম।

বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি; গৌরবময় ঐতিহ্য ও সাধনালব্ধ চরিত্রবলের সহিত যুক্ত হইয়া এই ভাবপ্রবণতা যে অঘটন ঘটাইতে পারে স্বদেশী আন্দোলন তাহার প্রমাণ। কিন্তু সর্বনাশা মহাযুদ্ধের ধাক্কায় ইউরোপে স্বভাবত-উদ্ভূত উচ্ছৃঙ্খলতার শৌখিন নকল করিতে গিয়া সমাজে ও সাহিত্যে আমাদের ভাবপ্রবণতা যে দুর্বলতার সঞ্চার করিল আমরা তাহা আজও সামলাইতে পারি নাই। এই প্রসঙ্গে আমি পরে লিখিয়াছিলাম:

মহাযুদ্ধের শেল-শক আর মারণ-বাষ্পে জন্ম লভিল যারা,
ধরার মাটির প্রথম-পরশ-কান্না যাদের ডুবেছে মেশিন-গানে,
এবং যাহারা ঘুমাইয়া ছিল সভাপর্বের বিলাস-ব্যসন মাঝে,
সে ঘুম যাদের ট্রেঞ্চ-শয্যায় তিমির রাত্রে ভেঙেছে আচম্বিতে,
এবং যাহারা গৃহে অনশনে প্রতিদিন পেল প্রিয়-বিয়োগের ব্যথা,
ছিন্নহস্ত ভগ্নচরণ জাগিল যাহারা হস্‌পিটালের বেডে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরায় শিরায় আজো বহে যারা মৃত্যুর যন্ত্রণা,—
উত্তেজনায় উন্মাদ হ'ল যারা,
মৃত্যু যাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিয়া গিয়াছে, "হে বন্ধু, আমি আছি।"
মৃত্যুর ভয়ে জীবনে লইয়া ছিনিমিনি খেলা যারা খেলে সুতরাং—
আমরা তাহারা নহি—সেই কথা এ যুগের কবি স্মরণে কি রাখিয়াছে,
মোদেরে পিষিয়া চাহে না মারিতে ওদের ঘরের শত সমস্যাভারে!

আমরা তাহারা নহি।
তাহাদের ঢেউ আকাশ-সাগর ডিঙায়ে যদিও লেগেছে মোদের গায়ে,
ড্রইং-রূমের টেবিলে মোদের চা'র পেয়ালায় তরঙ্গ তুলিয়াছে:
চুমুকে চুমুকে কথায় কথায় মোরা কয়জন সে ঢেউ করেছি পান,
মোদের উদরে সে ঢেউ পেয়েছে লয়;
পারে নি নড়াতে অনড় মোদের জগন্নাথের রথে—
বিপুল বিরাট ঘুমন্ত রথ চলে নাই এক তিল।

আমাদের যুগ আজো যে মধ্যযুগ—
সিনেমা-রেডিও-টেলিভিসনের কোটিং যদিও পড়েছে তাহার গায়ে—
কোটিং উঠিতে লাগে বা কতক্ষণ!
পোড়া-মাটি আর বালু-পাথরের জড়-রূপটাই মোদের সত্য রূপ।
অনড় মাটির কে গাহিবে জয়গান!
মোদের মুক্তি? আধখানা তার পীরদরগার এখনো সিন্নি মাঝে,
পাদোদক আর তাবিজ-মাদুলি, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে;
বাকি আধখানা গ্যানোর ফিজিক্স, চরকসংহিতায়,
বিজ্ঞান আর দৈবে মিলিয়া প্রায় মাঝামাঝি বিংশ শতাব্দীতে
ঘরে ও বাহিরে অদ্ভুত খেলা খেলিছে বঙ্গদেশে—
এ যুগে মোদের প্রত্যেক ঘরে অহরহ চলে সেই দড়ি-টানাটানি—
কভু বিজ্ঞান কভু দৈবের জয়।
অতি-বিচিত্র কোলাকুলি কভু আদিমে ও আধুনিকে—
জ্ঞানে-সংস্কারে মধুর সমন্বয়!

ভাবপ্রবণ বাঙালীর চরিত্রগত এই সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দৈবের দোহাই পাড়িয়া একদল লোক ব্যবসায় আরম্ভ করিল; ভুয়া গণৎকার ও ভুয়া ধর্মাশ্রমে দেশ ছাইয়া গেল। সাহিত্যে তথাকথিত তারুণ্য আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও জীবনে আসিল কর্মশক্তি ও পুরুষকারের প্রতি বিমুখতা ও অনাস্থা, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া সস্তায় কিস্তি মারিবার অস্বাভাবিক আগ্রহ। গণৎকারের গণনা পয়সা দিয়া খরিদ করিয়া লোকে রেস খেলিতে যায়, ইহা বুঝি। এখানে দৈবের সহিত দৈবেরই কোলাকুলি হইয়া থাকে। কিন্তু জীবনের সর্বঘটে তথাকথিত গুরু ও গণৎকারের প্রাধান্যের মধ্যে যে সাধারণ মানুষের কতখানি অসহায়তা ও পলায়নী মনোভাব লুকাইয়া আছে, কতখানি দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা ঘটিলে এই ঠক-নির্ভরশীলতা জাতিকে পাইয়া বসে তাহা প্রণিধান করিয়া আমি আতঙ্কিত হইয়াছিলাম। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস-সাহেব প্রভৃতি উচ্চ সরকারী

পদস্থেরাও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আকর্ষণে এই দুর্বলতার কবলে পড়িয়াছিলেন। যেদিকে তাকাই সেদিকেই আশ্রম গজাইয়া উঠিতে দেখি। শিষ্যের পক্ষে ভক্তির আতিশয্য ঘটিলেই যে পরমার্থ লাভ হয় তাহা নহে, শিষ্যকে তাহার যাবতীয় আর্থিক উপার্জন, মায় স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত গুরুর চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হয়, তবে মুক্তি। চোখের সামনে অনেক সংসারকে ভাঙিতে দেখিলাম, পিতার অবিমৃষ্যকারিতায় অনেক পুত্র পাগল হইল, অনেক সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়া দিলেন গুরু। আজ সিনেমা-ব্যবসায় সহজলভ্য অর্থসম্পদের লোভ দেখাইয়া গৃহস্থের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে যেরূপ প্রলুব্ধ করিতেছে সেদিন দেখিয়াছিলাম, এই ভুয়া আশ্রমগুলি সেইরূপ করিতেছে। এইরূপ দুই-চারিটি আশ্রমের গুরুদের এমনই প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্মাইল যে, তাঁহাদের কয় স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলে সেক্রেটারির নিকট সে হিসাব লইতে বলিতেন। অনুযোগ করিলে বলিতেন, আমাকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ইঁহারা যদি মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া বসেন তো আমি কি করিব! বাংলা দেশে এই কালে "কাঁধে বাড়ি বলরাম"দের একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই এই নকল গুরুদের "তুমি রাধা আমি শ্যাম" কাল্টের (cult) ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল।

আমি এইরূপ একটি আশ্রমের টাইপ কল্পনা করিয়া "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" লিখিতে আরম্ভ করিলাম। গুরুর প্রতীক হইলেন নকুড় ঠাকুর এবং শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতীক হইল সরমা। এই মোহগ্রস্ত মানুষদের কল্পনা করিয়া লিখিলাম:

> পতঙ্গভুক্ বৃক্ষ যেমন আপনার শিকারকে লালাসিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে জীর্ণ করিতে থাকে, প্রথমটা একটু হাত-পা ছোঁড়া, মূক-বধির অরণ্যভূমিতে কিঞ্চিৎ আর্তনাদ, কিছু ছটফটানি—তারপর সেই অসহায় প্রাণী যেমন বৃক্ষেরই অঙ্গীভূত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং তাহার অপর স্বজাতীয়কে গ্রাস করিবার জন্য বৃক্ষের প্রাণ জীয়াইয়া

রাখে এ যেন তেমনই। কিন্তু সরমা কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছে? প্রসারিত পত্রদল মাথার উপর ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে অতি ধীরে— কিন্তু সে-যে মৃত্যুপাশ, চৈতন্যহীন প্রাণীকে তাহা কে বলিয়া দিবে? দৃষ্টি আছে, চৈতন্য নাই। নিজের অপূর্ব রূপান্তর সে হয়তো দেখিতেছে, কিন্তু অনুভব করিবার শক্তি হারাইয়াছে।

ভাদ্র মাসে "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমে"র সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমার এবং 'শনিবারের চিঠি'র জীবনে নানা বিপর্যয় আরম্ভ হইল। প্রথম বিপর্যয় সম্পাদক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী পদত্যাগ করিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পর্ক ছাড়িলেও তিনি দলছাড়া হইলেন না, এই যা ভরসা। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলেন। আমাকে পরবর্তী আশ্বিন মাস হইতে এই প্রথম 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক পদ গ্রহণ করিতে হইল। মুদ্রাকর প্রকাশক ও সম্পাদক—তিনই এক আধারে বর্তাইল।

মোহিতলাল মজুমদার ঠিক এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। সহায় তিনি রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত নিত্য পরামর্শের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

যাঁহাদের ব্যবসায়ে ঘা লাগিল তাঁহারা বন্ধু ও শত্রু দুই ভাবেই আসিয়া আমাকে বিব্রত করিতে লাগিলেন। উৎকোচ অস্বীকার করাতে বিপরীত ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইল। সন্ধ্যার পর পথে ঘাটে বাহির হওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। রাত্রে বাড়িতেও লোষ্ট্র-বৃষ্টি চলিতে লাগিল। কুৎসিত বেনামী পত্র আসিতে লাগিল।

নিরস্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি আরও উগ্র হইয়া উঠিলাম। আশ্বিন সংখ্যায় পতঙ্গভুক্ বৃক্ষের পতঙ্গজীর্ণকারী পদ্ধতির বাস্তব বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিলাম। এইটুকু বিশ্বাস এখনও আছে— জনসাধারণের নির্জীব জড়ত্বকে বিচলিত করিবার জন্য শাস্ত-দাস্ত-

মধুর-ভদ্র রুচিকে লঙ্ঘন করিলেও আইনবিগর্হিত বর্ণনা করি নাই। কিন্তু তখন নানা কারণে নানা দিকে নানা শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছি। প্রমথ চৌধুরীর প্রসঙ্গে প্রধানেরাও বিরূপ হইয়াছিলেন। সকলের সমবেত শক্তি অকস্মাৎ একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা হইতে পুলিসের বেশে প্রবাসী প্রেসে আসিয়া দর্শন দিল। আশ্বিন সংখ্যায় "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমে"র কিস্তিতে শ্লীলতা-ভঙ্গের অপরাধে আমি ধৃত হইয়া ব্যক্তিগত মুচলেকায় জামিনে মুক্ত হইলাম। আমার বিরুদ্ধে শুধু তথাকথিত ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাবই কাজ করে নাই, আমাদের শরাহত সাহিত্য-সমাজের রুই-কাৎলা হইতে চুনো-পুঁটি পর্যন্ত অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে তৎপর হইয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে, শ্রীবিষ্ণু দে এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি কৌতুককর ছেলেমানুষী পত্র লিখিয়াছিলেন, বস্তুত তিনি তখন লেখা ছাপিতে আরম্ভ করিলেও কাঁচা ছেলেমানুষই ছিলেন।

আমি কিন্তু ইহাতেও দমিলাম না। "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" ধারাবাহিকভাবে চলিতে লাগিল। ১৯২৮ সনের অক্টোবরে অপরাধমূলক অংশটি বাহির হইয়াছিল। ১৯২৯ সনের গোড়ায় ধৃত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যেই আরও একটি মামলায় ধৃত হইয়া রাজদ্বারে নীত হইয়া দশ টাকা জরিমানা দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতার পার্ক সার্কাসে নিখিল-ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল, ইহা কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশন। ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল আমি তাহাতে স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। দীর্ঘ আট বৎসর পরে কলিকাতায় এই সাধারণ অধিবেশন। এমন বিপুল সমারোহের সহিত কংগ্রেসের অনুষ্ঠান ইহার পূর্বে আর হয় নাই। পণ্ডিত মতিলাল

নেহরু সভাপতি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জি. ও. সি. বা অধিনায়ক। তাঁহার প্রতি বিরূপতা বশতই এই বিপুল যজ্ঞে শুধু দর্শকই ছিলাম, কোনও অংশ গ্রহণ করি নাই। প্রবাসী অফিস হইতে একটি বইয়ের স্টল কংগ্রেস-সংলগ্ন প্রদর্শনীতে খোলা হইয়াছিল, নিয়মিত প্রত্যহ সেখানে গিয়া 'শনিবারের চিঠি'র হাসি ও ব্যঙ্গের খোরাক সংগ্রহ করিতাম। এই বিপরীত দর্শনের ফলেই আমার "অভিনয়" কবিতা ও G. O. C. বা "গক" ছবির জন্ম। পরবর্তী কালে "গক" সুভাষচন্দ্র সত্য সত্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র হইয়া আমাদের ব্যঙ্গকে বাতিল ও উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আজ আমরা সকলেই গৌরবান্বিত, তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমাদের পূর্ব লজ্জাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমার "অভিনয়" কবিতার ব্যঙ্গ ব্যর্থ হইলেও এখনও সতর্ক হইতে বাধা নাই। আটাশ বৎসর পূর্বেকার "অভিনয়" স্মরণ করিতেছি :

হ'ল চল্লিশ পার।
বরষে বরষে একই অভিনয় হয়ে গেছে বার বার।
তিন দিন ধ'রে মারমুখো হয়ে মিলিবে বীরেরা মহা হৈ-চৈয়ে,
অ্যামেণ্ডমেণ্ট ও প্রস্তাব লয়ে লেগে যাবে মহামার।
গম্ভীর মুখে বসিবে সকলে ভীষণ খাঁটি ও বেজায় নকলে,
কোন্ ভাষা কত আছয়ে দখলে হবে পরীক্ষা তার।
গোড়ায় হইবে কথা-কাটাকাটি, তাতে না শানালে হবে লাঠালাঠি,
লাল হবে চোখ, লাল হবে মাটি, মিলন চমৎকার!
অনুষ্ঠানের নাই কোনো ত্রুটি, কেহ খায় খানা কেহ ডালরুটি,
দশদিক হতে দশ জন জুটি বচন করিবে সার।
হ'ল চল্লিশ পার।

শেষ স্তবকটির দুইটি মাত্র শব্দ বদল করিলে যাহা দাঁড়ায়, তাহা আজিকার আক্ষেপোক্তিও হইতে পারে :

শীর্ণা ভারতমাতা,
উঠিছে শিহরি ভক্তেরা যত গাহিছে বিজয়গাথা।
চোখে অবিরাম ঝরে বারিধার পারে না বহিতে বুঝি দেহভার,
খ'সে খ'সে ওই পড়ে বার বার মলিন ছিন্ন কাঁথা।
আকাশ-কুসুম করিতে রচন রাম শ্যামে করে বাক্-বরিষণ,
থেকে থেকে ন'ড়ে ওঠে ঘনেঘন ক্যাপ-সুশোভিত মাথা;
জননী নীরবে বসি একধারে শীর্ণ হস্ত ললাটে প্রহারে,
শরীর বিকল তবুও তাঁহারে পিষিতে হইবে জাঁতা।
দেশের অর্থে আপনার নাম করিছে জাহির শুধু রাম শ্যাম,
কংগ্রেস ক্রমে হতেছে সুঠাম বুকের রক্তে গাঁথা।
শীর্ণা ভারতমাতা!

জাতীয় কংগ্রেসের আসল অধিনায়ক জওহরলালকে এই পার্কসার্কাসী কংগ্রেসেই সর্বপ্রথম পিতার স্নেহচ্ছায়া ভেদ করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দেখি; স্বাধীনতা-প্রস্তাব এখানেই প্রথম গৃহীত হয়। আমার রামদাদা-সিরিজের গল্প "আবার উটরাম সাহেবের টুপি"তে ব্যঙ্গচ্ছলে এই কংগ্রেসের একটা প্রায় নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছি। 'মধু ও হুলে' তাহা স্থান পাইয়াছে।

যাহা হউক, একদিন মধ্যরাত্রে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচ-কাওয়াজ দেখিয়া সামরিক ভাবে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত মগজ লইয়া বাসে পার্ক সার্কাস হইতে ফিরিতেছিলাম, সঙ্গে বন্ধুবর গোপাল হালদার। বাসে মানুষের ঠাসাঠাসি, কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া ঝুলিয়া আসিতে আসিতে মেজাজ আরও চড়িয়াছিল। আপার সারকুলার রোডে মানিকতলা রোডের কাছে বাস থামাইবার জন্য ঘণ্টা দিলাম। বাস থামিল না। আরও গরম হইয়া চালককে গালি দিলাম। সেও পাল্টা একটা খারাপ গালি দিল। মানিকতলা বাজারের কাছে গাড়ি থামিতেই আমি ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া ড্রাইভারের আসনে উঠিয়া তাহাকে দুই-এক ঘা দিতেই তাহার চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া দুই জন পুলিস দুই দিক হইতে আসিয়া আমাকে

ধরিয়া ফেলিল। পিছনে চাহিয়া দেখি, বাসটি জনমানবহীন, গোপাল শুধু বিপন্ন বন্ধুকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই—ডিসেম্বরের নিদারুণ শীতে একা দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। পুলিস বাসসহ আমাদের প্রথমে বড়তলা থানায় এবং পরে জুরিসডিকশন মানিয়া আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায় লইয়া গেল। গোপাল জামিন হইল। পরদিন বেলা দশটায় বাঁকশাল কোর্টে গিয়া দশ টাকা জরিমানা দিয়া সগর্বে ফিরিয়া আসিলাম। ইহাও সাহিত্যের বিষয় হইয়াছিল বলিয়াই সাহস করিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি। পরের সপ্তাহেই শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালের 'বাতায়ন' সাপ্তাহিকে আমার একটি দীর্ঘ প্রশস্তি-কবিতা বাহির হইল। দুইটি পংক্তি মনে আছে—

বাস-কণ্ডাক্টারে মারিয়া যে দেয় ফাইন,
তাহার কালচার এবং শিক্ষা সুপারফাইন।

এই গেল দ্বিতীয়। তৃতীয় রাজদ্বার দর্শন অচিরাৎ ঘটিল। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনও সম্পূর্ণ পুস্তকের প্রকাশ বিষয়ে আমার প্রকাশ্য সহযোগিতা ঘোষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' (বিশ্বভারতী সংস্করণ) এবং পুলিনবিহারী দাসের 'লাঠি-খেলা ও অসিশিক্ষা'র কথা বলিয়াছি। ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যরসিক শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি তৎসঙ্কলিত 'বীরভূম বিবরণ' ৩য় খণ্ডের (শ্রাবণ ১৩৩৪) বোলপুর "শান্তিনিকেতন-কথা" অধ্যায়টি লিখিয়া দিই। তিনি সস্নেহে ইহা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমাকে সম্মানিত করেন। ১৯২৮ সনে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সঙ্কলিত 'বনে জঙ্গলে' নামক বহুল-প্রচারিত পুস্তকের 'সন্দেশ' প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত রচনাগুলি বাদে যাবতীয় নামহীন প্রবন্ধ আমিই রচনা করি। তিনি সর্বপ্রথম শতাধিক টাকা দক্ষিণা দিয়া আমাকে সম্মানিত করেন, বই লিখিয়া রোজগার এই প্রথম। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার মানবপ্রেমিক মনীষী বৃদ্ধ

জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' পুস্তকের প্রকাশক হইবার গৌরব আমার ভাগ্যে ঘটে। প্রথম ভারতীয় সংস্করণ দেখিতে দেখিতে চার মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। পরবর্তী এপ্রিল (১৯২৯) মাসের শেষে দ্বিতীয় সংস্করণ হইবামাত্র গবর্মেণ্টের টনক নড়ে।— তাহার পর কি ঘটে সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ'-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ

গত ২৪শে মে তারিখে কলিকাতা পুলিস প্রবাসী কার্যালয় ও প্রবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি খানাতল্লাশি করিয়া ডাঃ জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের প্রণীত 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' নামক পুস্তকের চুয়াল্লিশখানি কপি লইয়া যায় এবং রাজদ্রোহ অপরাধে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসকে গ্রেপ্তার করে। গত ৪ঠা জুন এই মামলার শুনানী হইবার কথা ছিল; কিন্তু মোকদ্দমা তৈয়ারী হয় নাই বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে ১২ই জুন পর্যন্ত সময় লওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পুলিস আবার ৬ই জুন তারিখে রাজদ্রোহ অপরাধে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই মামলা ও পূর্বেকার মামলার শুনানী এক তারিখেই ধার্য হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী এই গ্রেপ্তারের কথা জানিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার অভিমত ৬ই জুন তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই মামলা লইয়া কলিকাতা শহর তোলপাড় হইয়া যায়। সরকার পক্ষের তদানীন্তন অ্যাডভোকেট-জেনারেল সার্ এন. এন. সরকার ব্যতীত হাইকোর্টের প্রায় যাবতীয় প্রখ্যাতনামা উকিল-ব্যারিস্টার, বি. সি. চ্যাটার্জি, এন. সি. সেন, আই. বি. সেন, কেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন।

ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে ৮ই মে হইতে জোড়াবাগানে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এন. আহমদের কোর্টে 'শনিবারের চিঠি'র

মামলাও আরম্ভ হয়। সেখানেও সাহিত্যিক-অ্যাডভোকেট শ্রীকেশব গুপ্ত আমার পক্ষ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক-উকিলেরা সহযোগিতা করেন।

দুইটি মামলা প্রায় চার মাসকাল চলে। বাঁকশাল ও জোড়াবাগান ছোটাছুটিতে আমার হয়রানির অন্ত ছিল না। জোড়াবাগানে শ্রীকেশব গুপ্ত সৎসাহিত্য হইতে হাজারো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া সর্বসমক্ষে একরূপ প্রমাণই করিয়া দিলেন যে, সদুদ্দেশ্যে পাঠকের জুগুপ্সা উৎপাদনের জন্য নৈষ্ঠিক শ্লীলতা লঙ্ঘন শেক্সপীয়র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যিককেই অল্প-বিস্তর করিতে হইয়াছে। তারকনাথ সাধু সরকার পক্ষে এই যুক্তির বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া বিশেষ জুৎ করিতে পারেন নাই। তথাপি আমাকে শাস্তিস্বরূপ শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল। এই ব্যাপারে স্বর্গীয় সাধু মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। তখন আমি তাঁহাকে খোলাখুলি প্রশ্ন করি, এই মামলার পিছনে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্ররোচনা ছিল কি না। তিনি স্পষ্ট নাম করেন নাই, ইঙ্গিতে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন, তোমাকে শাস্তি দেওয়াইবার জন্য এমন লোক আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রই বাংলা দেশে সব কিছু হইতে পারিত। মোকদ্দমাশেষে জজ নসীরউদ্দীন সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, ইয়ং ম্যান, আমার হাত-পা বাঁধা, যেখানে তোমাকে পুরস্কৃত করা উচিত ছিল সেখানে তোমাকে শাস্তি দিতে হইল।

অন্য মামলায় বিচারপতি রক্সবার্গের হুকুমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ও আমার প্রত্যেকের এক হাজার টাকা করিয়া জরিমানা হইল। প্রবাসী অফিস দিবে হাজার টাকা এবং প্রেসকে দিতে হইবে হাজার টাকা। আমি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলাম। চীফ জাস্টিস ও অন্য একজন জজ শেষ পর্যন্ত আপীল

ডিসমিস করিয়া দিলেন। জেল মিটিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে। জরিমানা দিয়া মুক্ত হইলাম।

উপর্যুপরি রাজদ্বারে উপনীত হইয়া ১০৲+৫০৲+১০০০৲ মোট ১০৬০৲ টাকা সেলামী দিলাম। এখন পর্যন্ত রাজার ঋণ আমার নিকট ইহা অপেক্ষা বেশি আর জমে নাই। তবে পরবর্তী কালে আরও তেইশ বার ভারতে ইংরেজের স্বৈরাচারী শাসনের দৃষ্টান্ত সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা ও চিত্র প্রকাশ করিয়া খানাতল্লাশির হাঙ্গামায় পড়িয়াছিলাম, হাঙ্গামা জেল বা জরিমানা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।

ঠিক এই সময়ে ঢাকায় মোহিতলালের অধ্যাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে বন্ধুবর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর অধ্যক্ষপদে স্থায়িত্ব লাভ আমাদের আনন্দের কারণ হইয়াছিল।

'শৃঙ্খলিত ভারত' বা 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিলে কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। ইহা চিরকাল রামানন্দ-চরিত্রের সততা ও দৃঢ়তার একটি দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। পুলিস যেদিন প্রথম প্রবাসী আপিসে খানাতল্লাশি করে, সেদিন ৪৪খানি বাঁধা পুস্তক লইয়া যায়। আবাঁধা পুস্তক সমস্তই দপ্তরীর বাড়িতে ছিল। মামলা চলিবার কালে অতি দ্রুত বিক্রীত হইয়াও বাজেয়াপ্তির হুকুমের দিনে মোটামুটি ৪৫০খানা বাঁধা-আবাঁধা বই থাকিয়া যায়। প্রতিখানির মূল্য পাঁচ টাকা, কিন্তু তখনই প্রায় ডবল দামে বাহিরে বইটি বিক্রয় হইতেছিল। জরিমানার দুই হাজার টাকা তো ডাহা লোকসান, এই অবশিষ্ট বইগুলি ন্যায্যমূল্যে বেচিলেও সে লোকসান উঠিয়া আসিত। একজন পুস্তক-বিক্রেতা মূল্য লইয়া উপস্থিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কড়া হুকুম দিলেন, এক কপি বইও বাহিরে যাইবে না। অফিস-ঘরের ঠিক মাঝখানে বইগুলিকে থাকে থাকে সাজাইয়া রাখা হইল; পুলিস আসিয়া ভ্যানে করিয়া সেগুলি লইয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

চোখের একটু ইঙ্গিত করিলেই নিমেষ মধ্যে বইগুলি নগদ টাকায় রূপান্তরিত হইয়া সিন্দুকে জমা হইতে পারিত।

এদিকে এত হাঙ্গামার মধ্যে "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" ধারাবাহিক ভাবে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চলিয়া সমাপ্ত হইল। কোনও দিক দিয়া আমাদের সাহিত্য-হুল্লোড়ের কিছুমাত্র কম্‌তি পড়ে নাই। আমাদের যেন তখন খুন চাপিয়া গিয়াছে।—প্রমথ চৌধুরীর পর একে একে আরও মহারথীনিপাতের উদ্দেশ্যে অবিশ্রাম শরাঘাত করিয়া চলিয়াছি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—আমি একাই পর পর এই তিন জনকে লক্ষ্য করিয়া মারাত্মক মারাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম; "অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ হনি, ঢাক," "দীনেশ-নামা" ও "নরেশ-নিকষ" আমারই রচনা। দা'ঠাকুর শরৎ পণ্ডিত মহাশয় আমার নাম দিলেন "নিপাতনে সিদ্ধ"। চারিদিকে কলরব উঠিল। চারুচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র আমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন, কিন্তু নরেশচন্দ্র পারিলেন না। তিনি স্বয়ং ব্যবহারজীবী, আইনের ঘোঁৎঘাঁত তাঁহার নখাগ্রে, তিনি 'শনিবারের চিঠি'র মুদ্রাকর, প্রকাশক বা সম্পাদককে না ধরিয়া একেবারে প্রবাসী প্রেসের মালিককে ধরিয়া টান দিলেন। অর্থাৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উকিলের চিঠি দিলেন। তিনি যদি কৃপাপরবশ হইয়া একটু ঊর্ধ্বে লক্ষ্য স্থির না করিতেন, তাহা হইলে নির্ঘাত আমাকেই আবার রাজদ্বারে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার লক্ষ্য একটু বেশি ঊর্ধ্বে হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ফসকাইয়া গিয়াছিল।

শুধু পরহিংসা-ব্যসনে ও রাজদ্বারেই যে এই কালটা কাটিয়াছিল তাহা নয়, কাব্যলক্ষ্মীর পূজা-উৎসবও কম করি নাই। মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যেই আমার 'অজয়,' ও 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' সম্পূর্ণ এবং 'মনোদর্পণ' ও 'বঙ্গরণভূমে'র অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়। বাল্যকালে খুব মনোযোগ দিয়া ভূগোল পড়িয়াছিলাম, পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশের আদিম বিচিত্র মানুষদের প্রকৃতিগত পরিচয় কিছু কিছু জানা ছিল। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সভ্যতাসম্পর্কহীন স্বাভাবিক ভালবাসার কাব্য রচনা করিলাম—'পথ চলতে ঘাসের ফুল'। আমি মনে মনে জানিতাম, আপাতত অসি-চর্ম ধারণ করিলেও এই আমার আসল কাজ। সমরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে নিভৃত নিরালায় নিজের সঙ্গে মুখামুখি হইয়া যখন বসিতাম তখন ভয় হইত। সাহিত্যের পথ বাছিয়া লইয়াছি; কিন্তু এই পথে যিনি আমার একমাত্র আরাধ্য সেই রবীন্দ্রনাথকে বিরূপ করিয়াছি, তাঁহার বরাভয়-কর আর দেখিতে পাই না। শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ, প্রমথ-দীনেশ-জলধর-চারুচন্দ্র সকল প্রধানেরাই মদান্ধের অস্ত্রাঘাতে লাঞ্ছিত। কিন্তু তখনও শনিগোষ্ঠীতে ভাঙন ধরে নাই বলিয়া নিজেও ভাঙিয়া পড়ি নাই। নকল মণিমুক্তার আহরণে ভালমন্দ মাসিক পত্রিকাগুলির উপর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিশীথ শান্তিকে যখন বিঘ্নিত করিতাম, তখন অরণ্যপ্রান্তর-পথের ঘাসের ফুলেরা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিত, আমার কবিমনের যিনি প্রেয়সী তখন তিনি সভয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিতেন; আমার সামরিক মোহ ভঙ্গ হইত, ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতাম:

তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু ব'য়ে যাক ঝরনা,
ডাকছে পাহাড় বন ডাকছে এ দেহ-মন ফেলে দিয়ে এস ঘর-করনা।
দুজনে বসব যেথা ফোটা ফুল বাস দেয় নিবিড় আঁধারে লতাকুঞ্জে,
দেখব মুখানি তব রহি-রহি চমকানো চঞ্চল খদ্যোৎ-পুঞ্জে।
ডুববে পাহাড় বন ডুবে যাবে জ্যোৎস্না ধরণীর উন্মাদ নৃত্যে,
অদূরে গুহার মুখে সিংহের গর্জন শিহর তুলিবে তব চিত্তে।
চুমায় চুমায় শুধু ছাইব অধর দুটি ভুল হবে চরাচর সৃষ্টি,
চকিতে হইবে মনে চাঁদ শুধু ঢালে সুধা, সে সুধা তরল আর মিষ্টি।
এস এস এস সখী, ডাকে ওই জ্যোৎস্না ঝরনার কুলু-কুলু ছন্দে
আবছা রূপার আলো আজকে পড়ল বাঁধা ঘন তিমিরের বাহুবন্ধে।
পূর্ণিমা চাঁদ ওই উঠল বনের চূড়ে ধবধবে পথ-ঘাট জ্যোছনায়।
আমার নয়নে সখী, আঁধার শ্রাবণ-রাতি, এস এস জেলে দাও রোশনাই॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

রঞ্জন প্রকাশালয়

"পথ চলতে ঘাসের ফুল" 'শনিবারের চিঠি'তে (আশ্বিন, ১৩৩৫) অপরূপ চিত্রসজ্জায় বাহির হইয়াছিল; শিল্পী শ্রীহরিপদ রায়। পুস্তকাকারে বাহির করিবার সময় চিত্রগুলি বাদ দেওয়াতে বইখানির আকর্ষণ ও মর্যাদা অনেকখানি খণ্ডিত হইয়াছে। মনে আছে, চিত্রসম্বলিত টুকরা কবিতাগুলি কলহ-বিবাদে বিরূপ বহু সাহিত্য-রসিককে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—হাবলদা, আমাকে তিন দিন সস্নেহে আইসক্রীম খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথেরও কবিতাগুলি ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু আমার কবিজীবনের সর্বাধিক আনন্দ এই প্রসঙ্গে পাইয়াছিলাম নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, ভবানীপুর বেলতলার এক গলিতে। এই অঞ্চলে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের কোনও কাজ ছিল, তাঁহার গাড়িতে আমিও ছিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, গ্যাসের বাতি জ্বালা হইয়াছে। ক্ষুতুদা গাড়িতে আমাকে একলা রাখিয়া কাজে গিয়াছেন। সহসা লক্ষ্য করিলাম, গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়াইয়া দুই জন যুবক বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও অতিশয় নিবিষ্ট চিত্তে 'শনিবারের চিঠি' পড়িতেছে, উৎকর্ণ হইলাম এবং স্বেদপুলককম্পসহ শুনিতে লাগিলাম :

জাগো সখী জাগো রে, বল্‌টিক-সাগরে
উঠল সূর্য যেন গোল পাঁউরুটিটি—
জাগো সখী জাগো রে, হিমজল-সাগরে
গোলরুটি সূর্য সেঁকা তার দু পিঠই।
শ্লেজ-টানা হরিণেরা দাঁড়িয়েছে বাইরে,
জাগো জাগো প্রিয় সখী, রাত আর নাই রে।
যেতে হবে বহু দূর ঝলকায় রোদ্দুর,
চোখ যেন ঝলসায় বাধা পেয়ে তন্দ্রায়।

যেতে হবে বহু দূর বরফে হানিয়া খুর
হরিণেরা ডাকে, জাগো, থেকো নাকো তন্দ্রায়।...

কবিতা তাহার পর অনেক লিখিয়াছি, প্রশংসাও পাইয়াছি কিন্তু এমন ঘাসের ফুলের মত পথের প্রসন্ন হাসিতে আর সম্বর্ধিত হই নাই।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় আশ্বিনেই "প্রটেস্ট" জানাইয়াছিলেন :

সব দেশ ঘুরে এলে
বিবাহিতা পত্নীটিকে ফেলে,
কিন্তু গেলে নাকো চীনে,
জাপানী গেইশাগণও তব প্রেম বিনে
মরে খেয়ে খাবি।...

সুতরাং কার্তিকে চীন-জাপান যাইতে হইল। চীনা উপদেষ্টা মিলিল না, কিন্তু 'জাপান'-বিশেষজ্ঞ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সযত্নে সাহায্য করাতে জাপান অচিরাৎ অধিগত হইল। সমুদ্রতীর হইতে ফুজিশানকে প্রণাম জানাইয়া কুরুমা-(রিকৃশা)-য় চাপিয়া তোকিও এবং সেখান হইতে শহরের উপান্তে এক তাড়িখানায় উপস্থিত হইয়া মাতালদের সঙ্গে গান ধরিলাম :

জীসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে,*
সাকে † দে সাকে দে সাকে দে দে রে।
তোকোনোমায় ‡ আছে বোতল তোলা,
ভেঙে দে, ভেঙে দে, মিছে খোলা,
(কিছু) বেগ্‌নি কি ফুলুরি, ভাজা ছোলা
আনিয়ে নে এই বেলা আনিয়ে নে নে রে।
হোটেলে যাবে কে দর যা বেশি,
চুষবে রেস্ত সবি শেষাশেষি !

* মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুড়ো গেল গড়িয়ে।
† মদ ‡ কুলুঙ্গি।

গেইশা দু-চারটাকে আন্ না ধ'রে,
চুমুকে হবে কি ? টান্ না জোরে,
হাসছে কেন ওরা দাঁড়িয়ে দোরে—
(কিছু) আছে বাকি ? ওদের দে দে দে দে রে।

বলা বাহুল্য, জাপানী ভাষার বুকনি সুরেশচন্দ্রের দান। সেখান হইতে সাংঘাই, গৃহনির্মাণরত ছুতার-মিস্ত্রীর দলে :

কে যাবি রে সাংঘায়ে
আংরাখা নে রাঙ্গায়ে,
ঠক্‌ঠকাঠক্ ঠোক্ হাতুড়ি,
তোল্ কড়ি আর বর্গা তোল্,
হেঁইয়ো জোয়ান, হেঁইয়ো জোয়ান,
করিস মিছা গণ্ডগোল।…

বস্তুত, গুরুতর তপ্তগরম লড়াইয়ের মধ্যে এই হালকা নিছক কাব্যের প্রয়োজন ছিল—আমার চিত্তকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য ; ক্ষুদ্‌দা এই সময়ে কবিতায় আমার সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়াছিলেন। 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' আমি প্রেয়সীকে এই নিবেদন জানাইয়া শেষ করিয়াছিলাম :

তোমার লাগিয়া সখী, গিয়েছিনু বহুদূর পার হয়ে নদী-গিরি-সিন্ধু,
আঁধার তিমির ভেদি' গহন বনের মাঝে আহরিতে ফুলমধুবিন্দু।
বাঘের গুহার মুখে ক্ষুদ্র ঘাসেরা যেথা আপনিই ফুল হয়ে ফুটছে,
বনের মেয়ের পায়ে সবল বনের যুবা অসহায় যেথা মাথা কুটছে।
যেখানে সাপেরা চলে রেখে যায় ঘাসবনে মসৃণ বক্ষের চিহ্ন,
ক্বচিৎ আলোকরেখা ভয়ে-ভয়ে পশে যেথা তিমিরাবরণ করি ছিন্ন…
যেখানে ঘাসের বুকে ক্ষুদ্র শিশিরকণা ঝলমল করে ক্ষীণ রৌদ্রে,
আঁখিতে আঁখিতে প্রেম প্রকাশের ভাষা আজো পায় নাই পদ্যে কি গদ্যে।
সেই ফুল, সেই ভাষা, সেই শিশিরের কণা গাঁথিয়া এনেছি মোর ছন্দে,
কণ্ঠে পরহ মালা, কানে কানে কহ কথা ধরা দিয়ে দুটি বাহুবন্ধে।

এ শুধু তোমারি তরে তুমিই বুঝিবে সখী, ঘাসের ফুলের কিবা মূল্য,
সার্থক হবে ফুল নিমিষেরও তরে যদি তুমি হয়ে ওঠ উৎফুল্ল।

ক্ষুতুদা আমার এই প্রেয়সী-চর্চাকে নিদারুণ ব্যঙ্গ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লিখিলেন :

সখী রে, আকাশ কালো, আসে দেখ সন্ধ্যা,
ভয় কি লো, কাছে আয়, তুই যে গো বন্ধ্যা।
তোর সনে প্রেম সই, হয় বিনামূল্যে,
এমন দিনে কি চলে সে কথাটি ভুললে!
এসো সখী, কাছে এসো, চুমু দাও আস্তে,
সন্ধ্যায় বন্ধ্যারা জানে ভালবাসতে।

আমাদের ছয় বৎসরের পুরাতন বিবাহ তখন পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই, সুতরাং আঘাতটা বাজিয়াছিল। ক্ষুতুদার কবিতাটি লজ্জায় ছাপাইতে পারি নাই, কিন্তু রাখিয়া দিয়াছি। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতির দুর্বোধ্য লীলা যে এই কবিতা লিখিবার কালেই ক্ষুতুদাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল তাহা কে জানিত!

ইহার পরেই ধরপাকড়ের মামলা-মকদ্দমার পালা চলিল কয়েক মাস। জুলাই মাসে (১৯২৯) শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের শব্দভেদী বাণ বৃথা গেল; এক মাস যাইতে না যাইতে আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে মিত্র অ্যাণ্ড মুখার্জি সলিসিটার্সের চিঠি পাইলাম, সরাসরি সম্পাদক 'শনিবারের চিঠি' অর্থাৎ আমার নামে প্রেরিত। অপরাধ, পুরাতন 'ভারতী' হইতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ছন্দ-সরস্বতী" পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। মিত্র অ্যাণ্ড মুখার্জি "কলিকাতা, ৩৬নং মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের মৃত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একমাত্র বিধবা শ্রীমতী কনকলতা দত্তে"র পক্ষে অনেক টাকার খেসারত দাবি করিয়াছিলেন। অপরাধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই, চক্ষে সরিষাফুল দেখিলাম। পরম্পরায় খবর পাইলাম, এই হঠাৎ আক্রমণের পিছনেও দুই-চারিজন সাহিত্যিক মহতের প্ররোচনা আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ভায়রা-ভাই অর্থাৎ কনকলতা দেবীর ভগিনীপতি ছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শেলীর "দি ক্লাউডে"র কাব্যানুবাদের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একদিন 'প্রবাসী' আপিসেই আমাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। সময় বুঝিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলাম। তিনি সানন্দে শরণাগতকে উদ্ধার করিলেন। সেই হইতে তাঁহার সহিত অত্যন্ত স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" ছাপিয়া আবার তাঁহার স্নেহভাজন হইয়াছিলাম। তিনি নিজের মূল্যবান সংগ্রহ হইতে দুই-চারিখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও সরবরাহ করিয়াছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে জড়াইয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নরেশচন্দ্র যে হুমকি-পত্র দিয়াছিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত তাহার জবাবটিতে তাঁহার দৃঢ় ও মহৎ চরিত্রের পরিচয় আছে। সেই কারণে আজ বাতিল কাগজের সামিল হইলেও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

Dear Dr. Sen Gupta,

* * *

I do not wish, nor am I competent, to discuss the legal aspect of what you say has appeared in Sanibarer Chithi about your books and yourself. I write this letter assuming that everything you state in your letter is correct. Even on that assumption I find it difficult to do what you suggest I should. My apology would mean that another party had done something for which he is criminally and civilly liable. It would not be honourable for me to save myself by implicating some one else, nor would it be in accord with business etiquette. Had I alone been accused by you of having done something wrong, it would have been comparatively easier for me to apologise on being satisfied that I was wrong.

* * *

I have not written anything about the legal aspect of the matter. But should you, in view of my inability to apologise, decide to proceed against me according to law, I would, on receiving invitation to that effect, ask some lawyer or other to advise me in the matter.

Yours Sincerely
Ramananda Chatterjee

কনকলতা দত্ত মহোদয়ার সলিসিটার্সের চিঠিতেও কিঞ্চিৎ শিক্ষণীয় আছে। লেখকের কপিরাইট বজায় থাকা কালে অর্থাৎ মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সাময়িক পত্র হইতে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত পুরাতন লেখা পুনর্মুদ্রিত করাও যে দোষের—এই জ্ঞান সকলের নাই। আজকালও এইরূপ বেওয়ারিশ উদ্ধৃতি প্রায়শই দেখিতে পাই। সকলের অবগতির জন্য উক্ত পত্রটির শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই দাবি-পত্রের সমস্ত দাবিই আইনসঙ্গত বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইত :

Calcutta, 28th August, 1929

* * *

We are accordingly instructed to call upon you which we hereby do, forthwith to stop the sale of the said issue of 'Sanibarer Chithi' and to give to our client an undertaking in writing not to repeat such infringement and to make over to our client all unsold copies of the said book and to render an account of the profits made by you by the sale thereof and to pay our client the sum of Rs. 500 as damages. Please note that in default of compliance with the above requisitions within three days from date our client will institute proceedings against you, civil, criminal or both, without any further reference or delay.

দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার পর ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, "ছন্দ-সরস্বতী" আজও পুস্তকাকারে বাহির হইল না; 'শনিবারের

চিঠি' যে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরেজী ১৯২৯ সনকে আমি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলিয়া মনে করি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসরের প্রথমার্ধে আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত হন। তিনি কলেজ-জীবনে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর সহপাঠী ও মির্জাপুর স্ট্রীটের এক মেসে সহবাসী ছিলেন। তৎপূর্বে 'প্রবাসী'তে তাঁহার গল্প বাহির হইয়াছে এবং কয়েকটি ছোটগল্পের জন্য তাঁহার যথেষ্ট নামও হইয়াছে। 'বিচিত্রা'তেও কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'পথের পাঁচালী' নামক উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। বিভূতিভূষণের সহিত পরিচয় ১৯২৯ সনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৎসরের প্রথমার্ধেই শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা। মোহিতলাল পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন, শ্রীযোগানন্দ দাস ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তখন কলিকাতায় থাকিলেও আমার পক্ষে না থাকারই মত, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী 'শনিবারের চিঠি' অপেক্ষা 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিয়ু'র দিকে বেশি ঝুঁকিয়াছেন, শ্রীগোপাল হালদার 'ওয়েলফেয়ার' লইয়া ব্যস্ত, ছিলাম ক্ষুদ্‌দা ও আমি। সেই ক্ষুদ্‌দাও দীর্ঘকালের জন্য বিদেশভ্রমণে যাত্রা করিলেন। জুলাই-আগস্ট মাসে আমি যখন সর্বাধিক বিপন্ন, তিনি তখন জেনিভায় বসিয়া সুইট্‌জারল্যাণ্ডের হ্রদ-পর্বতের সৌন্দর্যে মশগুল। সাত দিক হইতে সপ্তরথীর ধাক্কা আমাকে একা সামলাইতে হইতেছে।

এই বৎসরের মে মাসে "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" সংক্রান্ত মামলা এবং জুন মাসে 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজে'র মামলায় পড়ি; প্রথম মামলা আগস্ট মাসে গিয়া শেষ হয়, দ্বিতীয় মামলার জের ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই বৎসরেরই মাঝামাঝি কালে "নরেশ-নিকষ" ও "ছন্দ-সরস্বতী"র হাঙ্গামা ঘটে।

এই বৎসরেই ‘শনিবারের চিঠি’কে বধ করিবার জন্য শত্রুপক্ষ সমবেত ভাবে দুইটি পাশুপত অস্ত্র নির্মাণ ও প্রয়োগ করেন— ‘মহাকাল’ ও ‘রবিবারের লাঠি’।

১৯২৯ এপ্রিল মাসে অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহযোগিতায় শেষ বৎসরের (১৩৩৫) জেলেপাড়ার সঙ রচনা করি। অমৃতলাল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের গোড়াতেই দেহরক্ষা করেন।

১৯২৯-এর জুন মাসে প্রবাসী প্রেস এবং প্রবাসী কার্যালয় হইতে ‘শনিবারের চিঠি’র ছাপাখানা ও আপিস স্থানান্তরিত করার জরুরী নির্দেশ প্রাপ্ত হই এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করি। ১৩৩৬-এর আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রবাসী প্রেসে ছাপা হইয়া শ্রাবণ (জুলাই ১৯২৯) হইতে ৪৪ নং কৈলাস বোস স্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে ‘শনিবারের চিঠি’ ছাপা হয় এবং ১লা আগস্ট হইতে আপিস ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীমানী বাজারের দ্বিতলে রূম নং ১৬।১-এ স্থানান্তরিত হয়।

নূতন ঠিকানাতেই ৯ই ভাদ্র (২৫ আগস্ট, রবিবার) আমার ২৯তম জন্মদিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে রঞ্জন প্রকাশালয়ের পত্তন হয়। আমার প্রথম মুদ্রিত বই ‘অজয়ে’র মুদ্রণ অবশ্য আট দিন পূর্বে ১লা ভাদ্র (১৭. ৮. ২৯) সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

৭ই জুলাই (২৩ আষাঢ়, রবিবার) আমার প্রথম সন্তান রঞ্জনের জন্ম হয়।

১৯৩০-এর গোড়ায় মাসিক ‘শনিবারের চিঠি’র পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বহু বিলম্বে প্রকাশিত ১৩৩৬-এর কার্তিক পর্যন্ত পুরা দুই বৎসর তিন মাস কাল একটানা চলিয়া নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ‘শনিবারের চিঠি’ আর অগ্রসর হইতে পারে না। অগ্রহায়ণ সংখ্যা কয়েক ফর্মা ছাপা হইয়াছিল, উহা বাহির হয় নাই।

এই বৎসরের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রবাসী প্রেস ও কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন, ৯১ নম্বর আপার সারকুলার রোড হইতে ওই রাস্তারই ১২০।২ নম্বরে। কার্তিকের ‘প্রবাসী’ পুরাতন

ঠিকানা হইতেই ৩১ আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) বাহির হয়। ১লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) ঠিকানা বদল হয়।

মামলা প্রসঙ্গ পূর্বে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। বিভূতিভূষণের সহিত পরিচয় ও রঞ্জন প্রকাশালয় স্থাপন একই প্রসঙ্গের অন্তর্গত, কারণ বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াই আমি প্রকাশক হইয়া পড়ি। কোনও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফলে আমি পুস্তক-প্রকাশের ব্যবসায়ে ব্রতী হই নাই; ঘটনাচক্রে, হৃদয়াবেগবশতও বলিতে পারি, আমাকে এই কার্য করিতে হইয়াছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্যান্য ঘটনার বিবৃতি মুলতুবি রাখিয়া আমি এখন বিভূতিভূষণ ও রঞ্জন প্রকাশালয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে পল্লী-আশ্রিত কান্তমধুর ভাবের জন্য হঠাৎ চমকের সৃষ্টি করে নাই। তখন সবে ইউরোপ হইতে আমদানি কারি-পাউডারের উগ্র ঝাঁজে বঙ্গ-সাহিত্যের পাকশালা সরগরম; বেপরোয়া নগ্ন বীভৎসতার একটা মত্ত মাদকতা ইউরোপের ভদ্র-সংস্কার-ঐতিহ্যনাশী সমরাঙ্গণ হইতে উড়িয়া আসিয়া বাংলার রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র-বিমুগ্ধ নগর-পল্লী-সমাজে জুড়িয়া বসিতে চাহিতেছে। তরুণেরা মত্ত বিভ্রান্ত, প্রবীণেরা ভীত সন্ত্রস্ত বিচলিত। 'সবুজ পত্র' মৃতপ্রায় হইলেও "নবীন" ও "কাঁচা"রা 'সবুজ পত্রে'র ছায়ানিরপেক্ষ ভাবেই পুচ্ছ তুলিয়া নাচিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। ফ্রয়েড্-বার্গসঁ আসিয়া গিয়াছেন; ইউরোপের আত্মঘাতী আবহাওয়ায় এলিয়ট-লরেন্স-জয়েসের ন্যায্য বিদ্রোহ বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজকে অকারণে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অবস্থায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের (১৯২২, ১৪ জানুয়ারি) 'প্রবাসী'তে গল্পলেখকরূপে বিভূতিভূষণের প্রথম আত্মপ্রকাশ লক্ষ্যের বিষয় হওয়ার কথা নহে। যদিও তাঁহার প্রথম

গল্প "উপেক্ষিতা"য় তাঁহার বৈশিষ্ট্যের সকল পরিচয়ই ছিল, তথাপি তাহা উপেক্ষিত হইয়াছিল। পরবর্তী "উমারাণী" (শ্রাবণ, ১৩২৯), "মৌরীফুল" (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), "অভিশপ্ত" (আষাঢ়, ১৩৩১), "নাস্তিক" (পৌষ, ১৩৩১) এবং "পুঁইমাচা" (মাঘ, ১৩৩১) 'প্রবাসী'র কয়েকজন পাঠককে আকৃষ্ট করিলেও বিভূতিভূষণকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। ইহার পরেই 'কল্লোল'-দলের পটল-ডাঙার পাঁচালী ভাবী 'পথের পাঁচালী'র কবি বিভূতিভূষণকে মিঠা গল্পের আসর জমাইতে দেয় নাই, তিনি উত্তর-ভাগলপুরে ইসমাইলপুরের কাছারিতে অরণ্যবাস বরণ করিয়াছেন। প্রবাসে এই মনুষ্য-সমাগমহীন নিবিড় আরণ্য নির্জনতায় তিনি সুদূর যশোহরের স্বগ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের (বারাকপুর) তাঁহার শৈশবস্মৃতিমণ্ডিত কাহিনী 'পথের পাঁচালী' রচনা শুরু করেন। সূত্রপাতের তারিখ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল—১৭ই বৈশাখ, ১৩৩২। ওই তারিখের দিনলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন :

> জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে।…সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া, তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে…এই কাজ তাদের করতে হবেই,…তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা…

ভাগলপুরেই লেখা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ২০ নবেম্বর (১৯২৫) তিনি দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন :

> সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলছে…লেখার ['পথের পাঁচালী'র] পাতাগুলো ছড়ানো আছে…ফুলদানটাতে ক্রিসেন্থিমাম, কলাফুল… এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত—হয়তো ৫১ বৎসর পরে আমার কোনো চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা হয়তো থেকে যাবে।…হয়তো কত লোকের মনে আশা, সান্ত্বনা দেবে…হয়তো ৫০০ বছর পরে যদি আমার লেখা

> বেঁচে থাকে তবে আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত, প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীন কালের এক লেখক হয়ে যাব।…আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না…তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব পড়া চলবে…অনাগত ভবিষ্যতের সে সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জেলে তেল খরচ ক'রে আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, তবুও দেব, দিতেই হবে, মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি…তার পরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক…আমি আর দেখতে আসব না, আমার ফুলদানির এই অত্যন্ত বড় বড় ও সুন্দর ক্রিসেন্থিমাম ফুল আর বছর এ সময় কোথায় থাকবে? ৮০ বছর পরে আমি কোথায় থাকব?

দীর্ঘ তিন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনার শেষে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল তারিখে (১২ বৈশাখ, ১৩৩৫) 'পথের পাঁচালী' সম্পূর্ণ হয়। ২৬. ৪. ২৮ তারিখের দিনলিপিতে পাইতেছি:

> আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এই জন্যে যে আজ আমি আমার তিন বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি।

পরবর্তী আষাঢ় (১৩৩৫) অর্থাৎ 'বিচিত্রা'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 'পথের পাঁচালী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে শেষ হয়; মোট ১৫ সংখ্যায়; কোনও কারণে কার্তিক ১৩৩৫-এর 'বিচিত্রা'য় 'পথের পাঁচালী'র কিস্তি বাহির হয় নাই।

নীরদচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণ যেদিন আমাদের আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেদিন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কেহই বিশেষ উৎসাহী ছিলাম না। 'পথের পাঁচালী' দুই-একটা খুচরা সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় মাত্র চোখ বুলাইয়া দেখিয়াছিলাম, নিবিষ্ট চিত্তে পড়িয়া উহার স্বাভাবিক মাধুর্যে আবিষ্ট হই নাই। তাহা ছাড়া উহা 'বিচিত্রা'য় তখনও চলিতেছিল, শেষ হয় নাই।

কথায় কথায় নীরদচন্দ্র বলিলেন, 'পথের পাঁচালী'র মত উপন্যাসের একজন ভদ্র প্রকাশক জুটিল না, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যের কথা। নীরদচন্দ্রের কথার ঠিক তাৎপর্য আমি সেদিন উপলব্ধি করি নাই, কারণ 'পথের পাঁচালী'র বিশেষত্ব তখন পর্যন্ত আয়ত্ত হয় নাই। প্রথম দিনের আড্ডার শেষে বিভূতিভূষণ বিদায় লইলেন। আমি 'বিচিত্রা'র ফাইল সংগ্রহ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশিত অংশ পাঠ করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব হইয়াছে। শেষ রাত্রিটা উত্তেজনায় প্রায় বিনিদ্র কাটিল। পরদিন ঠিক দশটার সময় আপিসে উপস্থিত হইয়া নীরদচন্দ্রকে প্রশ্ন করিলাম, 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক পাওয়া যায় নাই—এই কথাটার অর্থ কি? তিনি তৎকালে প্রখ্যাত দুইজন প্রকাশকের নাম করিলেন, একজন মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট কিনিতে চাহিয়াছেন, একজন বই ছাপিয়া বিক্রয় হইলে কিঞ্চিৎ রয়াল্‌টি দিতে পারেন বলিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম, যদি বিভূতিবাবু রাজী হন, আমিই 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক হইব। নীরদচন্দ্র অবাক। আমার বেতন তখন মাত্র মাসিক দেড় শত টাকা, কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া সংসার পাতিয়াছি। কোথাও হইতে অকস্মাৎ অর্থপ্রাপ্তিরও কোনই সম্ভাবনা নাই। নীরদচন্দ্র এই সকলই জানিতেন। তিনি বলিলেন, যদি সকল দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন আমি মির্জাপুরের মেসে গিয়া বিভূতিবাবুকে লইয়া আসিতেছি। উঁহার সহিত কি ভাবে লেখাপড়া হইবে আপনি স্থির করিয়া রাখুন। নীরদচন্দ্র চলিয়া গেলেন, আমি বন্ধুবর গোপাল হালদারের সহিত পরামর্শ করিয়া লইলাম। গোপালের বাবা তখন নোয়াখালি লোন আপিসের প্রধান কর্মসচিব। গোপাল আশ্বাস দিলেন, তাঁহার

নিকট হইতে প্রয়োজন মত অর্থ ধার পাওয়া যাইবে। গোপাল ও আমি উভয়ে মিলিয়া পুস্তক-প্রকাশের ব্যবসায় ফাঁদিব গোড়ায় তাহাই স্থির হইল। উভয়ের পরামর্শে নির্ধারিত হইল 'পথের পাঁচালী'র প্রথম সংস্করণের জন্য বিভূতিভূষণকে আমরা তিন শত টাকা সম্মান-দক্ষিণা দিব। ইহাও আজ বলিতে বাধা নাই যে, আরও মাত্র দুই শত টাকা দক্ষিণা বাড়াইয়া দিলে আমরা 'পথের পাঁচালী'র কপিরাইট খরিদ করিতে পারিতাম। কিন্তু গ্রন্থকারদের রক্ষা করিবার প্রেরণাই যাহাদের প্রকাশক হইবার মূলে, তাহারা এইরূপ প্রস্তাব সে যুগে সঙ্গত হইলেও করিতে পারে নাই।

বিভূতিভূষণ আসিলেন। আমাদের প্রস্তাব তাঁহার নিকট পেশ করিলাম। তাঁহার মধ্যে যে চিরন্তন শিশুটি বরাবর ছিল, সে বলিল, একটু দরাদরি না হইলে ব্যবসা হয় না। সুতরাং তিনি দরাদরি করিয়া 'পথের পাঁচালী' প্রথম সংস্করণ ১১০০ কপির জন্য তিন শত পঁচিশ টাকা দাবি করিলেন। আমরা সানন্দে স্বীকৃত হইলাম। বিভূতিভূষণ ও আমার মধ্যে লেখাপড়া হইবে, সাক্ষী থাকিবেন নীরদচন্দ্র ও গোপাল—এইরূপই স্থির হইল। কিন্তু প্রকাশালয়ের নাম একটা দরকার, নহিলে দলিল হয় না। গৃহিণী তখন আসন্নপ্রসবা। আমার বরাবরই ধারণা ছিল, প্রথমটি পুত্র-সন্তান হইবে। সেই দিন সেই মুহূর্তে দলিল প্রস্তুত করিবার পূর্বে তাহার নাম রঞ্জন রাখা স্থির করিলাম এবং তাহার নামে আমাদের পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানটির নাম "রঞ্জন প্রকাশালয়" রাখা হইল এবং 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে'র পক্ষে আমি দলিলে সহি করিলাম। গোপাল অন্তরালে রহিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরালেই রহিয়া গেলেন।

৯১ নং আপার সারকুলার রোডে প্রবাসী আপিসের অন্তর্গত 'শনিবারের চিঠি'র ক্ষুদ্র কক্ষে মতিবাবুর দোকানের ডিম মাংস পাঁউরুটি পুডিং এবং কয়েক প্যাকেট ট্যাট্‌লার সিগারেট ধ্বংস করিয়া সেদিন "রঞ্জন প্রকাশালয়ে"র গোড়াপত্তন হইল। গোপাল সেই

রাত্রেই পিতার নিকট অর্থ সংগ্রহার্থে নোয়াখালি রওয়ানা হইলেন, বিভূতিভূষণকে পঁচিশ টাকা মাত্র বায়না দিলাম।

স্থির হইল পরদিন বৈকাল হইতে আমাদের আড্ডায় প্রত্যহ 'পথের পাঁচালী' পাঠ হইবে, বিভূতিভূষণ সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া যাইবেন। ইহার পরের কথা তাঁহার দিনলিপি হইতেই তুলিয়া দিতেছি। একটা কথা এখানে যোগ করা আবশ্যক, ৭ই জুলাই শ্রীমান রঞ্জন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদের প্রকাশালয়ের নামটা কায়েম করিয়া দিল।

> ২৬শে জুলাই, ১৯২৯, শুক্রবার। আজ প্রবাসীতে গিয়ে বইটার প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েছে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে।
>
> ২৮শে জুলাই, ১৯২৯, রবিবার। কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হ'ল। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন; আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারি উপভোগ করলেন। এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল করেন। দেখে ভারি আনন্দ হ'ল, সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেছে। আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশি।
>
> ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, শনিবার। আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপা হ'ল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি, কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী আপিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক দু মাস লাগল ছাপতে।
>
> ঘন বর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে সব কথা এখানে আর তুলব না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে ব'সে বনাত-মোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা, সেই কার্তিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়িটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তাশ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে সব ছবি—সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ মাস কি খাটুনিটাই গিয়েছে! জীবনে কখনও বোধ হয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করি নি—কখনও না। ভোর ছটা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত কাটিয়েছি, মাথা ঘুরে উঠেছে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েছি, ইডেন গার্ডেনে, কেয়াঝোপে ব'সে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাল ফুল ফোটা ঝিলটার ধারে ব'সে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেছি! তার ওপর কাল গিয়েছে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকালে ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বইয়ের শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকুটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক ক'রে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, গা হাত পা যেন কামড়াচ্ছে।

যাক। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েছি, তা যে দিই নি, তিনি অন্তত সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কি না জানি না, আমার কাজ আমি করেছি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরনো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষ দিকটাতে পার্কার ফাউণ্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

২রা অক্টোবর, ১৯২৯, ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৬, বুধবার, মহালয়া। আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী আপিসে ব'সে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিন, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন

তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি। তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হ'ল যে, তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-স্বষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল-ফোটা, ছায়া-ভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন ক'রে এই কথাটি শুধু জানাতে চাই—ভুলি নি। ভুলি নি। যেখানেই থাকি ভুলি নি···তোমারই কথা লিখে রেখে যাব—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুর-সংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙিন হয়েছে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়! কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সকলের ব্যর্থতা বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েছে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে রাত্রে—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানি নে। কোথায় পাব ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাব আজ হিরু কাকাকে, কোথায় পাব কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যারা হয়তো আমার ছাপা-বই দেখলে খুশী হ'ত তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হোক, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায় নি আজ রাত্রে।

বিভূতিভূষণ আজ বাঁচিয়া থাকিলে রঞ্জন প্রকাশালয়ের উদ্বোধন-কাহিনী তাঁহারই লিখিবার কথা। তিনি অসময়ে বিদায় লইয়া সেইদিনকার সেই আনন্দ-কাহিনী আমাদিগকে অশ্রু-অভিষিক্ত করিয়া লিখিতে বাধ্য করিয়াছেন।

'পথের পাঁচালী' দিয়া সূত্রপাত হইলেও উহা রঞ্জন প্রকাশালয়ের সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক নয়। দ্বিতীয়ও নয়। তৃতীয় পুস্তক। প্রথম পুস্তক আমার 'অজয়'—আকারে ছোট বলিয়া উহার ছাপা পরে আরম্ভ হইলেও আগেই শেষ হইয়া যায়, ১লা ভাদ্র ১৩৩৬ (১৭ই আগস্ট ১৯২৯) উহা প্রকাশিত হয়। 'অজয়ে'র কিছু কাগজ বাঁচিয়াছিল—মাত্র চার ফর্মার 'পথ চলতে ঘাসের ফুল'ও ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তারিখে বাহির হয়। 'পথের পাঁচালী' বাহির হয় ২রা অক্টোবর, মহালয়ার দিন। আমি সেই দিন "অপুকে" 'অজয়' দিয়া নাম সহি করি "অজয়" এবং বিভূতিভূষণ "অজয়কে" 'পথের পাঁচালী' দিয়া নাম সহি করেন "অপু"। এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি আজও আমার ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া আছে।

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সহস্র কথা আমার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আছে। যথাসময়ে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব। এইখানে শুধু একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া রাখি যাহা আমরা অর্থাৎ তাঁহার সমসাময়িকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যেন মানসসরোবর হইতে শীতঋতু যাপনের জন্য আমাদের এই পঙ্ককর্দম ও শৈবাল-লাঞ্ছিত পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এখানকার ঝাঁকে মিশিতে পারেন নাই। আমরা শুধু দেখিলাম, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নব শুচিতা ও সহৃদয়তার আমদানি করিলেন। আমরা দীর্ঘ বিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যে সহজ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই, বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

সপ্তম অধ্যায়

"মদন ভস্মের পর"

১৩৩৬ বঙ্গাব্দেই তথাকথিত "অতি-আধুনিক" সাহিত্যিকদের প্রধান প্রধান আশ্রয়গুলির অধিকাংশই কাহিল হইতে হইতে একে একে মরিয়া গেল। কলিকাতায় 'কল্লোল' স্তব্ধ হইল, 'কালি-কলমে'র কালি ফুরাইল, সদ্যজাত 'ধূপছায়া' অন্ধকারে মিলাইয়া গেল; ঢাকায় 'প্রগতি' গতিহীন হইল, 'বীণা'র তার ছিঁড়িয়া গেল। 'হসন্তিকা'র বুড়া তরুণদের বাঁধানো দন্তবিকাশও মাত্র চার সংখ্যায় (বৈশাখ—শ্রাবণ ১৩৩৫) নিঃশেষ হইল, দৈনিক 'ফরওয়ার্ড'-আশ্রিত 'আত্মশক্তি' ভোল পালটাইল। যে দুই জন সত্যকার সৃষ্টিধর্মী শক্তিমান সাহিত্যিক 'কল্লোল'কে প্রতিষ্ঠিত ও নূতন সাহিত্যকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, সেই শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র সর্বপ্রথম দল ভাঙিয়া চতুর্থ বৎসরে (১৩৩৩) 'শনিবারের চিঠি'র তৎকালীন "সংবাদ-সাহিত্যে"র ভাষায় "গড দি ফাদার ও গড দি সন রূপে গড দি হোলি গোস্ট্ শ্রীমুরলীধর বসু"র সহিত মিলিত হইয়া উৎসাহের সঙ্গে এক বৎসর 'কালি-কলম' চালনা করিয়াছিলেন, তাহারও দ্বিতীয় বৎসরে (১৩৩৪) গড দি সন এবং তৃতীয় বৎসরে (১৩৩৫) গড দি ফাদার সরিয়া পড়িয়াছিলেন। একা মুরলীধর আরও এক বৎসর 'কালি-কলম' লইয়া যুঝিয়াছিলেন, কিন্তু "বরদা" বিরূপ হওয়াতে তিনিও ক্ষান্ত হইলেন।

'কল্লোল' দলে অনেক আগেই ভাঙন ধরিয়াছিল, যাঁহারা নিয়মিত লিখিতেন ও আড্ডা দিতেন তাঁহাদিগকেই দল বলিতেছি। সে দল ভাঙিয়াছিল গঙ্গাধরবৎ 'কল্লোল'-ধর গোকুল নাগের অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। আসলে তিনিই ছিলেন 'কল্লোলে'র প্রাণ। সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ মুখের মিষ্টতায় ধ্বনি যোগাইতেন, এইটুকুই তাঁহার বড় কৃতিত্ব। তিনিও আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগী মানুষ

ছিলেন, কিন্তু সকলকে ধরিয়া রাখিবার মত ধৃতি তাঁহার ছিল না, চাতুর্য ছিল কিন্তু তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। তারাশঙ্কর তাঁহার 'আমার সাহিত্য-জীবন' প্রথম খণ্ডে (১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৮-৪১) 'কল্লোলে'র আড্ডার একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; একটু উদ্ধৃত করিতেছি :

এই সময়েই আমি ঢুকলাম।

শৈলজা দেখেই সানন্দে ব'লে উঠলেন—আরে, তারাশঙ্করবাবু—আসুন, আসুন। দীনেশ! তারাশঙ্করবাবু। ইনি দীনেশবাবু, উনি পবিত্র।

পবিত্র তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমি উঠছি, আপনি এলেন। তা বেশ, হবে এর পর আলাপ। কেমন?

চলে গেলেন। দীনেশবাবু বললেন, বসুন, বসুন।

বসলাম। তার পর সব চুপ। আমিও চুপ। তাঁরাও চুপ। ভাবছি কেমন করে জমানো যায়! কি বলি! কড়িকাঠের দিকে চাইলাম, মেঝের দিকে চাইলাম, হঠাৎ একটা কথা খুঁজে পেলাম, ভাবলাম বলি, আমার ভাইয়ের বিয়ে, চলুন না আমাদের দেশে। কথাটা আমাদের গ্রাম্য সমাজ অনুযায়ী চমৎকার। এই সূত্র ধরে অনেক কথা বলা যেতে পারবে। অন্তত আমি বলবার সুযোগ পাব আমাদের গ্রামের অনেক কথা। মুখ তুললাম বলবার জন্য, তুলেই একটু অপ্রস্তুত হলাম, দেখলাম—দীনেশবাবু মুখ টিপে ও চতুর হাসি হেসে শৈলজানন্দের দিকে চেয়ে না-এর ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়ছেন। মুখ আপনিই চকিতে ফিরল শৈলজার দিকে। দেখলাম—শৈলজা দীনেশবাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন—দু হাতের দশটি আঙুল মেলে দেখাচ্ছেন। যে মুহূর্তে আমার চোখ পড়ল, সেই মুহূর্তে তিনি একটা হাত নামিয়ে পাঁচ আঙুল দেখালেন। তার পরই হাত জোড় করলেন।

দীনেশবাবুকে চতুর লোক মনে হ'ল। চতুর মানে ধূর্ত বলছি না আমি। আমি বলছি, নাগরিক যে হিসাবে গ্রামীণের কাছে চতুর, সেই হিসাবে চতুর তিনি। মুহূর্তে তিনি আমার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। বললেন, তার পর তারাশঙ্করবাবু, আপনাদের ওখানে খুব বড় বড় মাছ আছে পুকুরে—না? ছিপে ধরা যায়?

সুতরাং মানী তারাশঙ্করের 'কল্লোল'-শ্রবণস্পৃহা এই প্রথম দিনেই নিবৃত্ত হয়, এবং অনুরূপ কারণে ধীরে ধীরে দল ভাঙিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত 'কল্লোল' স্তব্ধ হয়।

দগ্ধ হইবার পর ছাই উড়িবার পালা; উড়িতেও লাগিল। ছাইয়ের সঙ্গে প্রতিহিংসা-তুষের কিঞ্চিৎ আগুন মিশ্রিত ছিল, ছাই উড়িয়া নূতন যাহাদের উদ্ভব হইল 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে তাহারা বেড়া-আগুনের মূর্তি ধরিতে চাহিল, চারিদিক বেড়িয়া পুড়াইয়া মারাই লক্ষ্য। প্রথম উদ্ভব হইল 'মহাকালে'র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কালো মলাটের উপর লাল কালির আগুন-অক্ষরে জ্বলজ্বল করিতে লাগিল তিনটি শব্দ "শনিবারের চিঠির অশনি"। অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

> এ সময়ে…'মহাকাল' নামে এক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যুক্তি। 'শনিবারের চিঠি' যেমন বাংলা সাহিত্যের শ্রদ্ধেয়দের গাল দিচ্ছে—যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র—তেমনি আরো ক'জন শ্রদ্ধাভাজনদের—যাদের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র মমতা আছে—তাদেরকে অপদস্থ করা। 'মহাকালে'র সঙ্গে আমি, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু সংশ্লিষ্ট ছিলাম। 'মহাকাল' অনন্তকাল ধরে রক্তের অক্ষরে মানুষের জীবনের ইতিহাস লেখে, কিন্তু এ 'মহাকাল' যে কিছুকাল পরেই নিজের ইতিহাসটুকু নিয়ে কালের কালিমায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এ একটা মহাশাস্তি।—১ম সং, পৃ. ২৮৭-৮৮

অচিন্ত্যকুমার বলিতে ভুলিয়াছেন যে, তাঁহারা যে কারণেই হউক "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমের"ও "ব্রিফ" লইয়াছিলেন, হইতে পারে তাহা শেক্সপীয়র-প্রোক্ত নিছক সঙ্কটের বন্ধুত্ব। ক্রোধের বশে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-বিষ্ণুর মত রুচিবাগীশ "সৃষ্টিকর্তা" সাহিত্যিকেরা কতখানি বিচলিত হইয়াছিলেন প্রথম সংখ্যা (১৩৩৬ বৈশাখ) 'মহাকাল' হইতে তাহার কিছু নমুনা দিতেছি:

রামানন্দবাবুর দাড়ির বহরটা দেখেছেন চোখ মেলে? একটা গোটা কম্বল বোনা যেতে পারে—ইয়ারকি নয়!…রামানন্দবাবু খাইয়ে-দাইয়ে গোনা এক ডজন খেঁকি কুকুর পুষেছেন জানো? লেলিয়ে দিলে, টেরটা পাবে বাছাধন। ঋষির সঙ্গে চালাকি নয়! নিরাকার ব্রহ্মের যদি হাত থাকত তা হ'লে প্রার্থনা করতুম—হে ভূমা, তুমি এদের মাথায় গুনে গুনে তিনশ পঁয়ষট্টিটি গাঁট্টা মেরো।—পৃ. ৩০-৩১

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র ব্রাহ্ম রাসবিহারী নাকি বাস্তবে বর্তমান। তিনি অবশ্য জমিদারির ম্যানেজার নন, তিনি ম্যানেজার সাহিত্যের। আমাদের কাছে খাস রাসবিহারীর ছবি আছে, 'দত্তা'র রাসবিহারীর কি দাড়ি ছিল?—পৃ. ৩৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মির্জাফর লুকিয়ে আছেন, আপনারা বোধ হয় জানেন না। এই লোকটির একটু পরিচয় নীচে দিলাম।

ইনি প্রথমে ৭৫৲ কি ১০০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর কলেজে চাকরি নেন। তার পর আশুবাবুর বাড়িতে বছর খানেক ধন্না দেবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরি পান। চতুর লোক।—রমাপ্রসাদ মুখুজ্যে এবং প্রমথ বাঁড়ুজ্যের হাতে-পায়ে ধরে একটু একটু করে আশুতোষের নেকনজরে পড়বার সুযোগ করে নেন। তার পর স্যার আশুতোষ, রমাপ্রসাদ ও প্রমথবাবুর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বৃত্তি আদায় করে বিলাত যাত্রা করেন, এবং সেখান থেকে ফিরে স্যার আশুতোষের কৃপায় এবং রমাপ্রসাদবাবু, প্রমথবাবু প্রভৃতির চেষ্টায় দিব্যি হোমরা-চোমরা একজন হয়ে ওঠেন। তখন আর পায় কে?…রমা-প্রসাদবাবু এবং প্রমথবাবুর চাকরি খাবার জন্যে এই মহানুভবটি যে কি প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন তার ইতিহাস এত দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তা দিয়ে একটি মহাকাব্য রচনা হতে পারে। মহাকবি বাল্মীকি আজ বেঁচে থাকলে এই অপূর্ব জীবটিকেও বোধ হয় অমর করে রেখে দিয়ে যেতেন। তবে ভরসা এইটুকু যে, রবীন্দ্রনাথ এখনও জীবিত এবং হয়তো বা শেষ বয়সে একটা মহাকাব্য রচনা করে দয়া করে এই বিনীত সুনীতিরত মহাত্মাটিকে অমর ক'রে রেখে দিয়ে যাবেন।—পৃ. ৩৭-৩৮

বশিষ্ঠ-প্রিয়া অরুন্ধতী কি আছেন ঘরে?
গালি দাও তবে মহিলাজনেরে তৃপ্তি ভরে!

সীতা নেই ঘরে! কমলাও নেই! দিতেছ গালি
অন্যের ঘরে!—Scandal তবু ঘুরিয়া মরে!
জীবনের আধা কাটিল! বাজারে পাত্র কি নেই?
কাটলই যদি বিয়ে হল নাক' কেন সুধীরেই?
চাল্‌শেই যদি আস্‌ল তবে এ আজি বা কালি
দাস হতে হবে? হ'লেই তা হ'ত তো শান্তিতেই।—পৃ. ১১

মহাকালের প্রবাহে 'মহাকাল' তিন মাসের অধিক চলে নাই। আষাঢ় বা শেষ সংখ্যায় পণ্ডিচেরী-ফেরত বোমারু বারীন্দ্রকুমার, অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'মহাকাল'কে চতুরানন করা সত্ত্বেও 'মহাকালে'র কাল হইল। বারীনদা আষাঢ় সংখ্যায় "রাহু-ভারত" নামক এক মহাকাব্য শুরু করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তাহা আর শেষ হয় নাই। উপরের উদ্ধৃতিগুলি এবং "রাহু-ভারত" হইতে উদ্ধৃতি শুধু এই কারণেই "আত্মস্মৃতি"-ভুক্ত করিতেছি যে, 'মহাকালে'র এই সকল মহারত্ন এইভাবে ধরিয়া না রাখিলে বাংলা সাহিত্যের ভাবী উত্তরাধিকারীদের সেগুলি আর চোখে দেখারও সুযোগ মিলিবে না, সম্ভবত আমার কাছ ছাড়া 'মহাকাল'গুলি আর অন্য কুত্রাপি নাই। বারীনদার মহাকাব্যটি আমার, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের এবং 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকথা লইয়া রচিত হইতেছিল। পয়ারে রচিত প্রস্তাবনার মর্ম এই :

বঙ্গদেশে নারী-অভ্যুদয় দেখিয়া ইন্দ্র চন্দ্র আদি স্বর্গের দেবতারা একদা হতভম্ব, উর্বশী মেনকা রম্ভা প্রভৃতি রাগে হাঁড়িমুখ হইয়া আছেন, এমন সময় সিংহদ্বারে কোলাহল উঠিল, মুক্তকচ্ছ বৃদ্ধ নারদ কাহাদের যেন গালি পাড়িতে পাড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। একপাল দেবশিশু ছেঁড়া জুতা লইয়া "নারদ নারদ" করিতে করিতে তাঁহাকে ক্ষ্যাপাইতেছিল :

মুক্তকচ্ছদশা মুনি মহাক্রোধ ভরে
শাপান্ত করেন যত্ত দেব-বালকেরে,—

"যেমন করিলি মোরে হেথা মুখখিস্তি
মানুষ হইয়া পাও এই মত শাস্তি।
কবি হয়ে জন্মি সবে লেখ কামায়ন,
একগাছি কেশ মোর করি উৎপাটন
পাঠাব বাংলা দেশে মানুষ করিয়া
ঠেঙায়ে তোদের ভূত দিবে ছাড়াইয়া।
রাহু-মণ্ডলের সেই হবে সম্পাদক
আত্মা তারে দিবে এক লড়ায়ে মোরগ।
তীক্ষ্ণ দন্ত চার পাটি দিবে যত খেঁকী
গুঁতাবার বল দিবে সে ষণ্ড পিনাকী।
শত পদী-পিসী আর মেছনী ছানিয়া
গড়িব তাহাকে সেই জিহ্বামৃত নিয়া,
জগতে হইবে মহা রাহু-জয়-জয়
কুঁদুলে চণ্ডীর নাম বঙ্গেতে অক্ষয়।"

অশোক সজনী নাম তৃতীয় পর্ব

সেই উৎপাটিত কেশ মহা ভয়ঙ্কর
সূর্যলোক ভেদি চলে মর্ত্যলোক পর।...
হাঁ হাঁ করি দেবসভা আকুলিয়া ওঠে,
কাটিতে ভীষণ কেশ বিষ্ণুচক্র ছোটে
দ্বিখণ্ড করিয়া তারে চক্র ফিরি যায়,
কার সাধ্য তবু মুনি-শাপেরে খণ্ডায় ?...
হাসিয়া বিষ্ণুর প্রতি কহিলা নারদ,
"ভালই করিলে প্রভু কাটিয়া আপদ।...
বিষ্ণুচক্রে কাটি, দেব, করিয়াছ ভাল,
হৃত তেজ হয়ে উভে জ্বালিবে যে আলো,—
সে জ্ঞানে ব্রহ্মের কুল হইবে উদ্ভাস,
উভে মিলি রাহু-পত্র করিবে প্রকাশ।
দুই জনে হবে অতি মেধাবী বালক
সজনী প্রবন্ধ আর লিখিবে শোলক,

তাড়নায় চলিবে সে অশোক-চট্টের,
লভিবে অমর যশ দুর্মুখ-ভট্টের।...
রাহু-ভারতের কথা অমৃত সমান
শাপান্তে হইবে ওরে কেশ-অন্তর্ধান।
হৃতশক্তি সে সজনী তবু তারোপর
বাহির করিয়া দন্ত রবে নিরুত্তর।

—'মহাকাল', আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ. ৯০-৯৫

'শনিবারের চিঠি'র জন্মের গূঢ় কারণও অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবেরা এই সংখ্যার ৯৯-১০০ পৃষ্ঠায় জাহির করিলেন :

> কিছুকাল বাদে ঘেঁটুর পয়সায় এক পত্রিকা বাহির হইল—নাম হইল 'লড়ায়ে মোরগ'। বছর খানেক ধরিয়া, জনকয়েক ছোকরা সাহিত্যিক এমন ভাল লিখিতে শুরু করিয়াছিল যে, অবিলম্বে তাহারা পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের ভাত মারিয়া দিবে, এমন আশঙ্কাও হইল। কারণ, তাহাদের কারবার ফাঁকির নয়, ধাপ্পা মারিয়া তাহারা ব্যবসা বজায় রাখে না। মহা মুশকিল! এই সব ফচ্‌কে ছোঁড়াদের অকাল-পক্বতা অসহ্য!
>
> তাই 'লড়ায়ে মোরগে'র আবির্ভাব!
>
> সম্পাদক হইল সজিনা নামক 'বিদেশী'র বোকা ছাপাখানার ভূতটা।

'শনিবারের চিঠি' দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিন হইতে আজিও বাঁচিয়া আছে বলিয়া তাহার গায়ে নিন্দা-কটূক্তির যে ছাপ লাগিয়াছিল তাহা এখনও উঠে নাই; কিন্তু 'কল্লোল'-ওয়ালারা বার বার মরিয়া বার বার জন্ম পরিগ্রহ করাতে তাঁহাদের কলঙ্ক-কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে; এখন তাঁহারা অতীতের নিষ্কলুষ শুচিতারও বড়াই করিতে লজ্জা পাইতেছেন না। অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগে' এই মিথ্যা দম্ভের বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের প্রথম তিন মাসের ইতিহাস যদি অচিন্ত্যকুমার 'মহাকাল যুগ' নাম দিয়া বাহির করিতেন তাহা হইলে 'কল্লোল

যুগে'র মর্যাদা আরও বাড়িত। কিন্তু 'মহাকাল'-যুগেই এই ইতিহাসের সমাপ্তি নয়। এই বৎসরের শেষ তিন মাস অর্থাৎ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রকে 'রবিবারের লাঠি'র যুগ বলিতে হইবে এবং এইখানেই 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে জেহাদের শেষ। এই 'রবিবারের লাঠি' আরও নিকৃষ্ট, আরও কর্দমাক্ত রূপ লইয়া মাঘ মাসে (১৩৩৬) প্রকাশিত হয়। ইহার মলাটে ছিল ভূমণ্ডলের উপর উপবিষ্ট এক স-কঞ্চিবংশদণ্ড-ধৃত তরুণ, দণ্ডের প্রান্তভাগে একটি মোরগ গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝোলানো। 'শনিবারের চিঠি'র সহিত নাম-সামঞ্জস্যে এই বর্ণগন্ধস্বাদহীন কাগজটার নামই লোকে মনে রাখিয়াছে। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী 'মহাকালে'র কথা আর কাহারও স্মরণে নাই। 'রবিবারের লাঠি'র কোন লেখাই উদ্ধারের যোগ্য নয়।

'কল্লোলে'র এই শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্বেই খাস কল্লোলীরা এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৩৩৫এর শেষে অচিন্ত্যকুমার 'বিচিত্রা'য় চাকুরি লইলেন—"আসলে প্রুফ দেখার কাজ, নামে সাব-এডিটর।" স্বয়ং দীনেশরঞ্জন দাশ চলচ্চিত্রের কারখানাতে দৃশ্য-সজ্জার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। পূর্বপলাতক শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্রের মধ্যে প্রেমেন্দ্র দৈনিক 'বাংলার কথা'র নিশি-সম্পাদকের দলে ভর্তি হইয়াছিলেন; পরম্পরায় শুনিতাম তিনি সেখানে সুখী ছিলেন না। কিছুকাল এদিক ওদিক ভ্রাম্যমান শৈলজানন্দ শেষ পর্যন্ত বিপরীতের আকর্ষণে আমাদের সমীপবর্তী হইলেন। পরে আসিলেন, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র-প্রবোধও আসিলেন, কিন্তু অন্যভাবে।

শৈলজানন্দ আমার দেশের অর্থাৎ বীরভূমের লোক। তাঁহার প্রতি দেশোয়ালী প্রীতি আমার বরাবরই ছিল। তাহা ছাড়া আমরা প্রায় সমবয়সী হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আমার অনেক অগ্রজ—শ্রদ্ধেয় অগ্রজ। আমি যখন কলেজে পড়ি

তখন 'প্রবাসী'তে তাঁহার কয়লা-কুঠীর গল্পগুলি বাহির হইতেছিল। সেই গল্পগুলি পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল, শরৎ-উত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে নূতনের অগ্রদূত যদি কাহাকেও বলিতে হয় সে এই শৈলজানন্দকেই বলা চলে। কয়লাখাদের কুলি, কামিন, অতি নগণ্য বাবু-চাকুরেদের লইয়া যে মর্মস্পর্শী কাহিনী রচনা করা যায় তাহা তিনিই প্রথম দেখাইলেন। শুরু হইতেই তাঁহার ভাষার অপরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল। ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট বাক্যগুচ্ছ, সব কথা না বলিয়াও সকল কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবার ভঙ্গি শৈলজানন্দের স্বভাবতই আয়ত্তে ছিল। অথচ তাঁহার মধ্যে কোথায়ও অস্পষ্টতা ছিল না। পরিচয় হইলে বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিলাম, ভাষার মত তাঁহার অক্ষর-গ্রন্থনও চমৎকার। শৈলজানন্দের এই লিখন-ভঙ্গি অনুকরণ করিতে গিয়া তরুণ প্রবোধকুমার নানা দিক দিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন, ইহা আমি জানি।

শৈলজানন্দ চাকুরির সন্ধানে 'প্রবাসী'তে আসিলেন। অবস্থা এমন যে-কোনও সামান্য চাকুরি হইলেই চলিবে। চাকুরি তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পদমর্যাদা ঠিক কি হইয়াছিল আজ স্মরণ নাই। সম্ভবত প্রূফ দেখার কাজেই তিনি বহাল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ খাস আমারই ডিপার্টমেণ্টে। পূর্বরাগ ছিলই, তিনি আসিবামাত্রই আমরা "একপ্রাণ, একটিকিট" হইয়া গেলাম। তুচ্ছ আর গম্ভীর গল্প বলিয়া এমন আসর জমাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ভূতের গল্প, সাপুড়ের গল্প, খুনের গল্প—তাঁহার অফুরন্ত স্টক ছিল; তিনি জীবনকে নাড়িয়া চাড়িয়া নানাভাবে দেখিয়াছিলেনও। 'প্রবাসী'র ছাপাখানার প্রূফ-রীডারের চেয়ারে অমন একটা মানুষ বেশিদিন টিকিতে পারেন না। শৈলজানন্দ অচিরাৎ সরিয়া পড়িলেন, কিন্তু সৌহার্দ্যের যে রেশটুকু আমার মনে রাখিয়া গেলেন তাহা আজও অম্লান হইয়া আছে। বলা বাহুল্য,

উহার পরে নানাভাবে তাঁহার সম্পর্কে আমাকে আসিতে হইয়াছিল। সে সব কথা পরে বলিব। শৈলজানন্দ এই সময় হইতেই চলচ্চিত্র লইয়া মাথা ঘামাইতেন, ইহা স্মরণ আছে।

পলাতক শৈলজানন্দের পরিত্যক্ত আসনে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া বসিলেন। 'প্রবাসী'তে অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র আখড়ায় আসিতে শৈলজানন্দের সঙ্কোচ ছিল না, কিন্তু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত 'কল্লোলে'র পবিত্রকে নিশ্চয়ই আমল দিবেন না। তাই তিনি কাহাকে যেন সুপারিশ স্বরূপ ধরিয়া আনিয়াছিলেন। আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, সাহিত্যিকেরা যখন কলম চালায় তখনই তাহাদের দল থাকে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহারা বন্ধু ও সগোত্র। অপরিচয়ের আড় ভাঙিতে একদিন মাত্র লাগিয়াছিল। পরের দিন হইতেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পবিত্রদা হইলেন। সেই সম্পর্ক আজও বজায় আছে। তাঁহার চলমান জীবন তাঁহাকে ভিন্ন পথে লইয়া গেলেও তিনিই যে একদা অতি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নজরুল ইসলামকে আমার কাছে টানিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেই প্রথম সন্দর্শন প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল—এ কথা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।

'কল্লোলে'র অন্তরঙ্গ দল বলিতে যাহা বুঝায় নজরুল ইসলাম ও প্রবোধকুমার সান্যাল কখনই তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহারা স্বভাব-যাযাবর, মানস-সরোবর-বিহারী হংসের মত ঋতুবিশেষে আসিয়া জুটিয়াছেন, আবার উড়িয়া গিয়াছেন। কলগুঞ্জনে নিকট পরিবেশকে মুগ্ধ-অভিভূত করিবার ভগবদ্দত্ত শক্তি ছিল নজরুলের—ঝাঁকে মিশিয়া আত্মহারা তিনি কখনই হন নাই। এই কারণে 'কল্লোলে'র দল ভাঙিয়া গেলেও এই দুই জনের অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে নাই।

অষ্টম অধ্যায়

দুর্দিন

প্রথম পর্যায় 'শনিবারের চিঠি'র সর্বাধিক গৌরবের যুগে শনি-মণ্ডলীর একটি গ্রুপ ফোটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল। নানা কারণে আমাদের পক্ষে ইহা একটি ঐতিহাসিক চিত্র। ৯১ নম্বর আপার সারকুলার রোড, প্রবাসী আপিস অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম আশ্রয়-স্থলকে পশ্চাতে রাখিয়া এই ছবি (গ্রন্থারম্ভে দ্রষ্টব্য) গৃহীত হয় ১৯২৮ সনে মোহিতলালের ঢাকা গমনের পূর্বে। দুঃখের বিষয়, দলের রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, স্বয়ং আদি সম্পাদক যোগানন্দ দাস, সুধীরকুমার চৌধুরী ও সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় চিত্রটি অসম্পূর্ণ। বিভূতিভূষণ তখনই যে দলে আসিয়া ভিড়িয়াছেন, এই ছবিটিই তাহার প্রমাণ। সুশীল—সুনীতি—রঙীন—মোহিত—অশোক—সুরেশ—জীবনকালী—নীরদ—গোপাল—বিভূতি—হেমন্ত—সজনী—হরিপদ—গিরিধরের সঙ্গে দেখিতেছি কবি হেমচন্দ্র বাগচীকে; তিনি তখন তরুণ, সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পার হইবার চেষ্টায় ছিলেন। মোহিতলালের কাব্যে অকৃত্রিম প্রীতিবশত তিনি আসিয়া জুটিয়াছিলেন—তরুণ হইয়া বুড়াদের (?) দলে মিশিয়াছিলেন বলিয়া অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু-প্রমুখ "মহাকালী"রা তাঁহার কম লাঞ্ছনা করেন নাই। অথচ হেমচন্দ্র আমাদের আড্ডাভুক্ত হইলেও তখনও লেখকদলভুক্ত হইবার অধিকার পান নাই। তাঁহার সঙ্গে তরুণতর আর একজন কবি প্রায়ই আসিতেন, সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি শুধু অল্প বয়সে ভাল কবিতাই লিখিতেন না, তাঁহার সুকণ্ঠ আবৃত্তিতে আমাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তিও ছিল অসাধারণ, বাংলা দেশের যাবতীয় কবির কাব্য তিনি আমাদের অনর্গল শুনাইয়া যাইতেন; মোহিতলাল ও তাঁহার মুখের আবৃত্তি শুনিয়াই রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী

কবিদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। শৈলজানন্দ যখন আসিলেন তখন তদ্ভক্ত সুবলচন্দ্রও পাকাপাকি রকমে আমাদের আড্ডাভুক্ত হইলেন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হইয়া কয়েক বৎসর পরে এই তরুণ কবি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কয়েকটি খণ্ড কবিতা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে এই মাত্র, বাংলা দেশ ও সাহিত্য হইতে তিনি প্রায় নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছেন।

তরুণ কবি সুবলচন্দ্রকে আমার স্মৃতিকথায় আজ স্মরণ করিতেছি। তিনিই প্রথম বাঙালী কবি যাঁহার কণ্ঠে আমার আসল কবিসত্তার সাদর স্বীকৃতি ধ্বনিত হইয়াছিল একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতায়; জীবনের পাথেয়স্বরূপ কবিতাটি আমি এতকাল সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছি, আজ প্রকাশ করিয়া ধন্য হইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন:

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বরণীয়েষু—

বৈরাগিণী মরুপথে চুমি' যায় উন্মনা শর্বরী।
ক্লান্তির পসরা শিরে ছুটে চলি ব্যথায় বিলীন
ধরিতে তারার লেখা। নেত্র হতে অশ্রুর তুহিন
ঝরি' যায় শুভ্র বালুতলে, তমসার বিলোল কবরী;
বনের মদির গন্ধে তৃষ্ণাবেগে উঠিছে শিহরি।
মরুচারী মুশাফের ভ্রমি একা দোসরবিহীন—
সহসা কাহারে হেরি', জাগি উঠে জীবন-বিপিন
মন্থর মঞ্জুল সুরে! শ্রান্ত হিয়া নিল তারে বরি।

তাহারে বরিয়া লহ ওরে ভীরু অমৃত-সন্তান—
সে আজি মুছাবে আঁখি, মুছি দিবে মরুর দাহন,
শ্যামলের স্নেহে ভরা প্রসারিবে দুটি করতল।
অধরে বিদ্যুৎ তার, বহি' আনে মেঘের স্বপন।;
বাম কোলে অশ্রুবীণা, বামেতরে লীলা-শতদল—
বাঁধিল মায়ার ডোরে।—ধন্য মানে বিধুর পরাণ।

আমার যুযুধান দিকটিকে অবশ্য কবি মোহিতলাল কয়েক মাস পূর্বেই আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন একটি কবিতা-পত্রে, ১৩৩৪ পৌষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তাহা "'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্যে" এই নামে প্রকাশিত হয়।

পরিবারে নূতন অতিথির আগমন-সম্ভাবনায় সঙ্গতিহীন পিতা যখন অতিশয় ব্যাকুল ও বিব্রত, ঠিক এই সময়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একদিন আমাকে তাঁহার গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ দিলেন। আমার ডাইরিতে দেখিতেছি, যেদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সেই দিন ২২শে আষাঢ়, ইংরেজী ৬ই জুলাই অর্থাৎ শ্রীমান রঞ্জনের জন্মের ঠিক পূর্বদিন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোনও কথা না বলিয়া একখানি পত্র আমার হাতে দিলেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা। প্রবাসী প্রেসে 'শনিবারের চিঠি' ছাপা হইতে থাকিলে তিনি আর কোনও প্রকারে 'প্রবাসী'র সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না—পত্রে সেই সাংঘাতিক বিজ্ঞপ্তি ছিল। আমি এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বেশী কথা বলিতে পারিলাম না। শুধু বলিলাম, বেশ তাহাই হইবে, 'শনিবারের চিঠি' অন্যত্র স্থাপিব।

বলিলাম তো, কিন্তু যাই কোথায়? সহায়সম্বলহীন 'শনিবারের চিঠি' কি বন্ধ হইয়া যাইবে? অশোক চট্টোপাধ্যায় সুদূর ইউরোপে। সাহায্য করিতে পারেন এমন আর কেহই নাই। রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া তাঁহার মত পরিবর্তন করাইব তাহার উপায় নাই, তিনি তখন অপূর্বকুমার চন্দের তদারকাধীন—দূর সাইগনে। আমার জেদ চাপিয়া গেল। ছুটাছুটি করিয়া শেষ পর্যন্ত সুকিয়া স্ট্রীটে অবস্থিত কান্তিক প্রেসের আশ্বাস মিলিল। কথা-সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্বে ইহার মালিক ছিলেন এবং এইখানেই 'ভারতী'র বিখ্যাত আড্ডা বসিত। মণিলাল মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই কান্তিক প্রেস বিক্রয় করিয়া দেন। পরিচালক হন বিখ্যাত

চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পৌত্র মহেন্দ্রনাথ বসু। তিনি যাহাকে বলে "মাই-ডিয়ার" লোক তাহাই ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তিনি 'শনিবারের চিঠি' মুদ্রণের যাবতীয় ঝক্কি মাথা পাতিয়া লইলেন। আমি বাঁচিয়া গেলাম। শ্রাবণ সংখ্যা কাত্তিক প্রেসে ছাপা হইতে লাগিল।

আমি যে তখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুবই বিচলিত ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম তাহার চিহ্ন শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তেই প্রকাশিত "হেঁয়ালি" কবিতায় আছে। এমন বর্বর কবিতা আমিও খুব বেশী লিখি নাই :

স্বপ্নভাঙা নির্ঝর তোমার এই কি ছিল ললাটে ?
মনের লেখা পড়লে না কো দেখলে শুধু মলাটে !
দেখলে তবক চক্‌মকানি,
পোষা টিয়ার বক্‌বকানি
শুনলে শুধু, সন্ধ্যা-ছায়ায় চক্ষু তোমার ঘোলাটে।
খাই নি ব'লে তুমিও খাও ঠাকুরঘরের কলাটে।

*   *   *

পরের মুখে ঝাল খেয়েছ, পরের কথা শুনিয়া,
স্তাবক-তুষ্ট হে মহারাজ, হঠাৎ হ'লে খুনিয়া !
লেলিয়ে পুলিস পালিয়ে গেলে
কেউটে কভু হয় না হেলে !
ভাবের বিশ্ব উঠল ভ'রে, নিঃস্ব মাটির দুনিয়া,
ধনুক-ছিলা ছিঁড়ল হঠাৎ স্বপন-তুলা ধুনিয়া।

*   *   *

শ্মশান-শিবে ধরল ছেঁকে পোষা শেয়াল-কুকুরে,
শিব দেখিছে আপন ছায়া তাদের চোখের মুকুরে !
তারাই শুধু বুঝল হা রে
তাঁর প্রতিভা-তপস্যারে !
কুকুর নিয়েই মত্ত মহেশ প্রভাত-সন্ধ্যা-দুকুরে,
সাগর-সেঁচা সূর্য—সে কি অস্ত যাবে পুকুরে ?

এই ভীষণ আঘাত রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিল। অরসিক রায় বেনামীতে 'নটরাজে'র সমালোচনার গ্লানি মনে সঞ্চিতই ছিল, এই কবিতার দরুন তাহা দ্বিগুণিত হইল। সে সংবাদও যথাসময়ে পাইলাম। সুনীতিকুমার ছিলেন মধ্যবর্তী সেতু। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অসীম, আমাদিগকেও তিনি কম ভালবাসেন না। আমাদের পক্ষে তিনি গেলেন ওকালতি করিতে। ফল তো ভাল হইলই না, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিও অপ্রসন্ন হইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সুনীতিকুমারকে যে পত্রাঘাত করিলেন তাহা যেমন মর্মান্তিক, আমাদের পক্ষে তেমনই লজ্জাকর। রবীন্দ্রনাথের মনের গ্লানি পরবর্তী কালে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল বলিয়া পত্রখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক ডকুমেণ্ট-হিসাবে প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ক্ষমা না করিলে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। বাংলা দেশের লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ এই পত্রে এই ভাবে ভাষায় রূপ পাইয়াছে, অবশ্য আমি প্রধান উপলক্ষ্য :

ওঁ

মনে করেছিলুম তোমার খাতা থেকে আমার ছবিটাকে নির্বাসিত করব। তুমি রক্ষা করতে অনুরোধ করচ, রইল ওটা।

সেদিন তোমার সঙ্গে যে কথার আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা এইখানে বলে রাখি। তুমি বলেছিলে শনিবারের চিঠিতে যাঁরা আমার অবমাননা করেচেন তাঁরা আমার ভক্ত, কেবল বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা আমাকে আক্রমণ করে ক্ষোভ নিবৃত্তি করেচেন। কিছুকাল থেকেই এটা দেখেচি ব্যক্তিগত কারণ ঘটবার বহুকাল পূর্ব হতেই তাঁরা আমার নিন্দায় আনন্দ ভোগ করে এসেচেন। এটা দেখেচি যাঁরা কোনো দিন আমার লেখার কোনো গুণ ব্যাখ্যা করবার জন্যে একছত্রও লেখেন নি তাঁরাই নিন্দা করবার বেলাতেই অজস্র ভাবে বহু পল্লবিত করে লিখেচেন। সকল লেখকের

রচনাতেই ভালোমন্দ দুইই থাকে কিন্তু ভালোটার সম্বন্ধে নীরব থেকে মন্দটাকেই দীর্ঘস্বরে ঘোষণা করার উৎসাহ শ্রদ্ধার লক্ষণ নয়। মোটের উপর যাকে আমরা নিন্দার্হ বলে জানি তার সম্বন্ধেই এরকম আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এরকম ব্যবহারকে নিন্দা করা যায় না— কেন না সকলেই আমার রচনা বা চরিত্রকে প্রশংসনীয় বলে মনে করবে, এরকম প্রত্যাশা করাও লজ্জার কথা। বাংলা দেশে আমার সম্বন্ধে এমন প্রত্যাশা করার হেতুই ঘটে নি। এঁরাই কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে থাকেন যে স্তাবকবৃন্দ আমাকে বেষ্টন করে সর্বদা যে স্তব-কোলাহল করে থাকেন তার দ্বারাই নিজের ত্রুটিবিচারে আমি অক্ষম। এঁরা নিজে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকেন না, যাঁরা থাকেন তাঁরা কী করেন সে সম্বন্ধে এঁদের অনভিজ্ঞ কল্পনা আমার প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দেয়। কিছুকাল ধরে তুমি নিরন্তর আমার কাছে ছিলে, নিজের স্তব শোনবার আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস তোমার দ্বারা পরিতৃপ্ত করবার কোনো চেষ্টা করেছি কিনা তার সাক্ষ্য তুমিই দিতে পারো। আমার যতদূর মনে পড়ে যেখানে তোমার কোনো গুণ দেখেছি সেখানে তোমার গোচরে ও অগোচরে তোমার স্তব আমিই করেছি। আমার বক্তব্য এই যে অসঙ্কোচে যাঁরা আমার নিন্দা করতে আনন্দ পান তাঁদের সংখ্যা অনেক এবং আমি তাঁদের দোষ দেব না, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান একথা বলা চলবে না।

সময় এসেচে যখন এসব ব্যাপারকে শান্তভাবে আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের লোকের কাছ থেকে আমি যা পাই তা আমার প্রাপ্য নয় এবং যা না পাই তাই আমার প্রাপ্য এই বলে হিসেব-নিকেশের নালিশ তুলে কিছু লাভও হয় না। মানরক্ষাও হয় না। কিন্তু অনাত্মভাবে সত্যটাকে জেনে রাখা দরকার। চিত্তরঞ্জন কিংবা মহাত্মাজিকে দেশের লোকে কদাচিৎ প্রতিবাদ করেচে, এমন কি নিন্দাও করেচে কিন্তু অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েও গর্হিত ভাষায় কুৎসিত ভাবে তাঁদের প্রতি অসম্মান করেন নি, করতে পারলে আনন্দ পেতেন না তাও নয় কিন্তু সাহস করেন নি—কারণ তাঁরা জানেন দেশের লোক তা সহ্য করবে না। আমার সম্বন্ধে সে রকম সঙ্কোচের লেশমাত্র কারণ নেই—অনেকেই

আমার নিন্দায় প্রীত হন এবং বাকি অধিকাংশই সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার প্রকাশ্য অপমানে দেশের লোকের চিত্তে বেদনা লাগে না, সুতরাং আমার প্রতি যাঁরা কুৎসা প্রয়োগ করেন তাঁদের ক্ষতি বিপদ বা তিরস্কারের আশঙ্কা নেই। এক হিসাবে তাঁরা সমস্ত দেশের প্রতিনিধি-স্বরূপেই এ কাজ করে থাকেন। সুতরাং তাঁরা উপলক্ষ্য মাত্র। যাঁরা আমার অন্ধ স্তাবক বলে কল্পিত, যাঁরা আমার সুহৃদ বলে গণ্য তাঁরা আমার এই অবমাননার কোনো প্রকাশ্য প্রতিকার করে থাকেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। বুঝতে পারি প্রকাশ্যে অপমান করতে অপর পক্ষের যত সাহস ও নৈপুণ্য এ পক্ষের তা নেই, তার প্রধান কারণ তাঁরা মনে মনে জানেন দেশের লোকের সহযোগিতার বল তাঁদের দিকে নয়। দেশের লোকের কাছে যে কোনো কারণে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন তাঁদের ভাগ্যে এরকম গ্লানি কোনো দেশে কখনোই ঘটে না—রাস্তার চৌমাথার মধ্যে এমন নির্যাতন নিঃসহায়ভাবে তাঁদের কখনোই ভোগ করতে হয় না। তাই বলচি এই ব্যাপারের মূল সত্যটাকে আমার জেনে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া দরকার—আর তার পরে চিত্তকে অবিচলিত রাখা আরো দরকার। সত্তরের কাছে এসে পৌচেছি—আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেচে, এখন মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই কামনা করচি যে এই হতভাগ্য আমি নামক বাহিরের পদার্থটার সমস্ত বোঝা এবং লাঞ্ছনা থেকে ভিতরের আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেন ইহলোক থেকে বিদায় নিতে পারে।

এই উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে আর একটা কথা বলে রাখি। প্রকাশ করাই আমার স্বধর্ম—প্রকাশের প্রেরণাকে অবরুদ্ধ করা আমার পক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ। আমার প্রকৃতিতে এই প্রকাশের নানা ধারার উৎস আছে—তাদের যেটাকেই আমি অগ্রাহ্য করব সেটাতেই আমার খর্বতা ঘটবে। প্রকাশ আর ভোগ এক জিনিস নয়—প্রকাশের অভিমুখিতা বাইরের দিকে, বস্তুত সেটাতেই অন্তঃপ্রকৃতির মুক্তি, ভোগের অভিমুখিতা ভিতরের দিকে, সেইটেতে তার অবরোধ। আমার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তোমার মনে আপত্তি উঠেচে। কিন্তু নাটক রচনার মধ্যে যে প্রকাশ-চেষ্টা, অভিনয়ের মধ্যেও তাই। রচনার মধ্যেই যদি কলুষ থাকে সেটা নিন্দনীয়, অভিনয়ের মধ্যে যদি থাকে সেও নিন্দনীয়—কিন্তু অভিনয়

ব্যাপারের মধ্যেই আত্মলাঘবতা আছে এ কথা আমি মানি নে। আমার মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তোমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের বাধায় তোমরা যে দোষ কল্পনা করচ তার দ্বারা আমার চেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করলে নিজের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হবে। ইতি ১১ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল [২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৯]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"চিত্তকে অবিচলিত রাখা 'আরো দরকার" ভাবিয়াও রবীন্দ্রনাথ এতখানি বিচলিত হইয়াছিলেন যে, এই একান্ত ব্যক্তিগত পত্রের একটা নকল আমার নিকটেও পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য সুনীতিকুমারকে সম্বোধন করিয়া লেখা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত পূর্বপত্রের (১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭) মত এ পত্রেরও উপলক্ষ্য আমরাই। এ-পক্ষের ন্যায় ও-পক্ষেরও যে অনেক অভিযোগ কল্পিত, তাহার প্রমাণ দাখিল করা কঠিন ছিল না; কিন্তু দাখিল করিবার পাত্র তখন ভাঙিয়া গিয়াছে, উপরে প্রবাহিত 'শনিবারের চিঠি'র ধারা তখন আকস্মিক বিপর্যয়ে পড়িয়া মরু-বালুতলে ফল্গুধারায় পর্যবসিত, কার্তিক পর্যন্ত বাহির হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশ অবরুদ্ধ।

আমাদের কারণে সুনীতিকুমার মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন ইহাতে আমরা খুবই লজ্জিত হইয়াছিলাম; কিন্তু তিনি নৃত্যগীত সম্পর্কে নিজের মত পরিবর্তন করেন নাই। ফলে কবির সহিত তাঁহার সম্পর্কে অন্তরের গভীরে ছেদ পড়িয়াছিল। বিধাতার পরিহাস এই যে, দীর্ঘকাল পরে কবির একান্ত অনুরোধে আমিই তাঁহাকে সপরিবারে শান্তিনিকেতন লইয়া গিয়া পুনর্মিলন ঘটাইয়াছিলাম। আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি তখন অনেকেরই বিক্ষুব্ধ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

প্রেস পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়া কাস্তিক প্রেসে আশ্রয় পাওয়ার কথা বলিয়াছি। আপিসের ঠিকানাও পরিবর্তন করিতে

হইল। ৫৯ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রথমে ঘর ভাড়া লওয়া হয়, কিন্তু স্থান পরিবর্তন করিবার পূর্বেই ঠিকানা পুনরায় পরিবর্তিত হইয়া ২০৬ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট—শ্রীমানী বাজারের দ্বিতলে রুম নং ১৬।১ স্থির হয়। ১লা আগস্ট (১৯২৯) সেখানেই আপিস উঠিয়া যায়।

এই পরিবর্তনই 'শনিবারের চিঠি'র কাল হইল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবাসী প্রেসের তাল সামলাইয়া কান্তিক প্রেস এবং নূতন আপিস-বাড়িতে ছুটাছুটি করিয়া কাজ আদায় করিতে এবং আপিসের হিসাবপত্রাদি রাখিতে গলদঘর্ম হইতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়-হিসাব-রক্ষণের ভার সম্পূর্ণ ক্ষুহৃদার ছোটমামা শ্রীগৌরীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ছাপাখানায় অর্থাৎ কান্তিক প্রেসে হাজিরা দিতে আরম্ভ করিলাম।

কান্তিক প্রেস মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তচ্যুত হইলেও 'ভারতী'র ভাঙা আড্ডা তখনও সেখানে বসিতেছে। "ক্ষুধিত পাষাণে"র পাগলা মেহের আলীর মত দুই-একজন মৌতাতী তখনও সন্ধ্যার পর সেখানে নিয়মিত পাক দিয়া যাইতেন। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন ইঁহাদের একজন। আড্ডা ঘনিষ্ঠ হইলে তাহা জমাইবার অসাধারণ স্বাভাবিক দক্ষতা তাঁহার ছিল। একটু পার্লামেন্ট-বহির্ভূত-ভাষায়-অভ্যস্ত মানুষদের তাঁহার গল্পে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইবার উপায় ছিল না। তিনি তখনও সিনেমা-রাজ্যে পাকাপাকি রকম প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাকে নিয়মিত পাওয়া দুর্ঘট ছিল না। আমরা দুইদিনেই তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলাম। সেই 'ভারতী'র পুরাতন ভাঙা আসরেই 'শনিবারের চিঠি'র নূতন আড্ডা জমিয়া উঠিল। প্রথমে আসিলেন সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং হরিপদ রায়। কাগজ বাহির করিবার সময় হইলে তিন-চার রাত্রি এক নাগাড়ে হৈ-হৈ করিয়া জাগিতে হইত। তখন আমি একা লেখক বা গায়ক—বাকি সকলে

দোহার্কি করিয়া আমাকে সঞ্জীবিত রাখিতেন। আমি অনর্গল "কাপি" লিখিয়া যাইতাম, অন্যেরা আড্ডা জমাইয়া আসর সরগরম রাখিতেন, ঘন ঘন চা আসিত, বুদ্ধির গোড়ায় সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইতাম, সকলের সমবেত হল্লার মধ্যে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি মায়ামন্ত্রে দূর হইত, আমার একার পক্ষে যাহা একান্ত অসম্ভব ছিল তাহাই সম্ভব হইত।

কিন্তু এই ভাবে বেশীদিন চালানো যায় না। এই আড্ডায় আমার সমধর্মী সহায়কের একান্ত অভাব ছিল। সর্ববিষয়ে সহায়ক ও উৎসাহদাতা ডাহিনে-বামে-লেখনী-চালক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের অভাব অত্যন্ত বেশী করিয়া অনুভব করিতেছিলাম। যোগানন্দ দাসও নিরুদ্দেশ, হেমন্ত আসেন বটে কিন্তু নিরর্থক লেখায় তখন তাঁহার মতি নাই। মোহিতলাল ঢাকা হইতে পাল্লার এক দিক অর্থাৎ গুরুগম্ভীর দিকটা সামলাইতেন, বাকিটা আমাকেই সামলাইতে হইত। এইরূপ কিছুদিন ধরিয়াই চলিতেছিল। কান্তিক প্রেস হইতে শ্রাবণ সংখ্যা বাহির করিয়াই পলাতক যোগানন্দ দাসের সন্ধানে বাহির হইলাম। এক মাসের জন্য অর্থাৎ ভাদ্র সংখ্যায় তাঁহাকে পাওয়াও গেল, কিন্তু তাহার পর তিনি আবার উধাও। সুশীলকুমার দে ঢাকা হইতে এই সময় নানা ধরনের লেখা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র এই ক্রমাবনতির যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভাদ্র সংখ্যায় "নরকের কীট" প্রকাশ। লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু এই একটি গল্পের আঘাতে বাংলা-সাহিত্য-সরোবর তোলপাড় হইয়াছিল। শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় যদি আর কোন গল্পও না লিখিতেন—শুধু এই একটির জোরে অমর হইয়া থাকিতেন। দুঃখের বিষয় গল্পটি অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার 'যোগভ্রষ্ট' ও 'দশচক্র' রঞ্জন প্রকাশালয় হইতে বাহির করিয়া তাঁহার "শিরাজীর পেয়ালা,"

"নরকের কীট" প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প ও "একাল" নাটকটি পুস্তকাকারে ছাপিবার আয়োজন করিতেছিলাম ; কিন্তু বনবিহারীবাবু আমাকে অগ্রসর হইতে দেন নাই। তিনি সর্ব বিষয়েই বিলুপ্তির প্রয়াসী, স্মৃতির জের টানা তাঁহার স্বভাব নহে।

"নরকের কীট" সে যুগের তরুণদের বিস্মিত বিমুগ্ধ করিয়াছিল। গল্পটির জনপ্রিয় হওয়ার বাধা ছিল—প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত ইংরেজী বুক্‌নিগুলি ; অনেকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। 'বেপরোয়া' মতবাদের জন্য প্রাচীনপন্থীরাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "নরকের কীট" বাংলা সাহিত্যে "আগে বাড়া"র একটি মাইল-স্টোন ; অবিশ্রাম ঘাত-প্রতিঘাতে তরুণ এবং তরুণ-বিরোধী উভয় দলই যখন ঘায়েল হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, "নরকের কীট" তখন একটা নাড়া দিয়াছিল। ইহার আরম্ভটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিয়া বনবিহারী-বর্ণিত নরকের পরিচয় দিতেছি :

> নরক ?—নরকেই ত আছি হে। Been there since 1876. একটা idea দিই। উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর,—হাঁ হাঁ তাই! I mean your—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—অর্থাৎ কিনা যে দেশে আখ-খেজুরের চাষ হয়, এবং জাভা থেকে চিনি আমদানি করতে হয়, যে দেশে জলকষ্ট একটা দৈনন্দিন ব্যাপার ; এবং যেখানকার মহামান্য চিকিৎসকগণ propaganda work করছেন খোলা বাতাসের বিরুদ্ধে।—নাঃ, তোমাদের দোষ কি ? দোষ সব অশ্লেষা মঘার।—১২৯৯ সাল থেকে দাসত্ব করে আসছে,—অথচ জাতকে জাত সমুদ্রে ডুবে ম'ল না। আজও বাঁচতে চায়, অমর হতে চায়।—আজও বংশবৃদ্ধি করছে, আর রেখে যাচ্ছে কতকগুলো হ্যাংলা ক্যাংলা ছেলের পাল, যাদের পেট ভরবে শুধু পীলে আর লিভারে! A colony of maggots in a dungheap!
>
> ধানের ক্ষেতে লাঙল পড়ে না। তা হোক, ছেলের ক্ষেত পতিত থাকবার জো নেই, Consent Bill-এর নামে হাহাকার একেবারে!

আমার মানসিক নিঃসঙ্গতা ও অবসাদের পরিচয় এই সময়কার দুইটি কবিতায় আছে, ভাদ্রের "গড়ের মাঠে শুয়ে—" এবং আশ্বিনের

"যুগান্তরে"। বুদ্ধিমান পাঠক এই দুইটি হইতে আমার তদানীন্তন হালচালও আঁচ করিতে পারিবেন :

চিত হয়ে শুয়ে আছি আকাশের কাছাকাছি,
ট্রাম বাস ফিটন কি চলছে ?
যত মিটমিটে তারা জুড়িয়াছে হা-রা-রা-রা,
মনে হয় মনুমেণ্ট টলছে !
লজ্জায় হয়ে লাল চাঁদিমা আধেক গাল
ঢেকেছে টানিয়া বুঝি ঘোমটা,
ছায়াপথ ? না না, ও যে রোদ-লেগে বেশী "ডোজ"-এ
ফেটে গেছে আকাশের "ডোম"টা।
ফিরপোর দোতলায় লাল চোখে যারা খায়
ভাবে তারা কি রঙিন দুনিয়া,
শোনে না আকাশে গান ধ্বনিতেছে অবিরাম
খুশী রহে টুং-টাং শুনিয়া।
নরনারী পাশে ব'সে ভাবে ছুটিতেছে ক'ষে
সুখে ছোটে মদে আর ডিনারে।
লাল নীল দেখে আলো, ভাবে, ঘুচিতেছে কালো
জমিছে আঁধার নভ-মিনারে।
ধরায় এলায়ে দেহ লভি মাটি-মার স্নেহ
মানুষের প্রতি হয় করুণা,
ছুটিছে জীবনটাই মোটর অচল ভাই,
পাকে চুল, ধরা রয় তরুণা।...

এবং

আকাশ জুড়িয়া বাজিছে কাঁসর
থম্ থম্ করে বসুন্ধরা,
একা শঙ্কর জাগিছে বাসর,
মহাকালী হবে স্বয়ম্বরা !...

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের তৃতীয় এবং তীব্রতম ধাক্কায় সারা দেশ ঠিক এই সময়েই আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেশের জন্য কোনও কাজ যাহারা করিতেছে না

তাহাদের কাহারও মনে স্বস্তি নাই। বিলাতী মদ ছাড়িয়া ধেনো, সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি এবং দুইদিন পরে নকল চীনা সিগারেট "চিমাই" টানিয়াও কাহারও বিবেক সুস্থ নহে। দলে দলে কর্মীরা জেলে যাইতেছেন, সরকারী অত্যাচারের বিবরণও "সেন্সরে"র দাপটে শুনিবার উপায় নাই। কানাঘুষায় তিল তাল হইতেছে। এই মহা মন্বন্তরের মুখে 'শনিবারের চিঠি' থাকিল বা গেল সে সম্বন্ধে আমার আর কোন চিন্তাই রহিল না। মানসিক অশান্তি ও অবসাদ বিবিধ বিকৃতির মধ্যে পরিতৃপ্তি খুঁজিল। সদ্যোজাত শিশু ও সংসারকে বাঁচাইতে হইবে—এই বোধটুকু মাত্র ছিল বলিয়া প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজারি ছাড়ি নাই, কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'কে মাঝ-দরিয়ায় ডুবাইয়া দিলাম। বহু বিলম্বে আশ্বিন সংখ্যা বাহির হইল, ততোধিক বিলম্বে কার্তিক বাহির হইল, এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা অর্ধেক ছাপা হইয়া ছাপাখানাতেই পড়িয়া রহিল। 'শনিবারের চিঠি' মরিয়া গেল। তখন রঞ্জন প্রকাশালয়ের সদ্য-প্রকাশিত তিনখানি বই 'অজয়,' 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' ও 'পথের পাঁচালী' হইতে বেশ কিছু আয় হইতেছে; সুতরাং শ্রীমানী বাজারের আপিস ও দোকানঘর রাখিয়া দিলাম। এই সময়ে শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'যোগভ্রষ্ট'ও রঞ্জন প্রকাশালয় হইতে বাহির হইল।

মরিতে মরিতেও শেষ সংখ্যায় (নামে কার্তিক, বাহির হইল ফাল্গুনে) রবীন্দ্রনাথকে খোঁচা দিলাম সুদীর্ঘ "ভ্রান্তি" কবিতায়—সুনীতিকুমারের নিকট লিখিত পত্রের জবাবেই সম্ভবত:

জ্বলিতেছে তবু ধাতব সূর্য দুঃখ এই!
মিথ্যা এ কথা—তাঁর প্রতি দেশে শ্রদ্ধা নেই।
আপন করিতে জানে যেই জনা
তারি পায়ে সবে বিকায় আপনা;
"হব না আপন" যাঁহার সাধনা, শুধু তাঁরেই
আপন করিতে পারে নাই কেহ—সত্য এই!...

এই দুর্দিনেই প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছাড়াও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন কর্মসচিব সাহিত্যবন্ধু রামকমল সিংহের মারফৎ পরবর্তী জীবনে অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের সহিত পরিচয় ঘটে।

নবম অধ্যায়

রক্ষাকবচ

'শনিবারের চিঠি'কে টুঁটি টিপিয়া দম বন্ধ করিয়া রাখিয়া একটা নিদারুণ শূন্যতার মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিলাম।

শূন্যতা তখন চারিদিকেই। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ব্যাপকতা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পায়ের তলার মাটি নড়াইয়া দিয়াছে। ২৬শে জানুয়ারির স্বাধীনতার শপথ লওয়া হইয়া গিয়াছে, ইহা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। পুরা আড়াই শত বৎসরের পোর্তুগিস, ফরাসী ও ইংরেজ সংস্পর্শের ফলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ইমারৎ বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে ও চেষ্টায় তাহাতে যে চিড় খাইয়াছিল, এইবারে তাহা ফাটলরূপে দেখা দিল। এই রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের ভূমিকম্প বাংলা সাহিত্যে বিজাতীয় ধারাকেও বিপর্যস্ত ও স্তব্ধ করিয়া দিল, সাহিত্যে আত্মনিবেদনের পরে সেই সর্বপ্রথম আমার মনে হইল, আমাদের প্রয়োজন ফুরাইল।

বোকা মানুষ স্বপ্ন দেখে। আমিও স্বপ্ন দেখিতাম—সেই ছেলেবেলায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'বেহুলা'য় পড়া নেতা-ধোপানীর মৃত শিশুর পুনর্জীবনের স্বপ্ন। দুষ্ট বালক কাপড় কাচিবার সময় নেতাকে বিরক্ত করাতে সে গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া কাপড় কাচিবার পাটার পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। বিস্মিত বেহুলা দেখিয়াছিল, সন্ধ্যায় নেতা তাহার গায়ে জলের ছিটা দিতেই "বালক নিদ্রোত্থিতের ন্যায় মুখে একরাশি হাসি লইয়া উঠিল।" আমিও যদি নেতা-ধোপানীর মত কলমের কালির ছিটায় 'শনিবারের চিঠি'কে বাঁচাইতে পারিতাম!

১২০।২ আপার সারকুলার রোডে সদ্য স্থানান্তরিত ছাপাখানার ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া বাংলা সাহিত্যের শতাব্দীকালের ইতিহাস

মনে মনে পর্যালোচনা করিতাম। একতলায় প্রায়ান্ধকার একটি স্নানের ঘর, মোজেইক-করা মেঝেতে ফাট ধরিয়াছিল। একটা ওয়াশ-বেসিনও ঘরের এক কোণে তখনও সংলগ্ন ছিল। ভাবিতে ভাবিতে মগজে রক্ত চড়িলে মাথা-মুখ ধুইয়া ফেলিতাম। ফাট-ধরা মেঝেতে নতমুখে পায়চারি করিতে করিতে দাগে দাগে একটা কল্পিত মানচিত্রও রচনা করিয়াছিলাম—বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রের স্থানের মানচিত্র। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' যে ইতিহাসের আরম্ভ, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'শনিবারের 'চিঠি'তেই কি তাহার শেষ? মন চলিয়া যাইত সুদূর অতীতে,—কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক; অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন; ভিড় করিয়া আসিয়াছেন সে যুগের কৃতী তরুণেরা—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী। প্রাচীন কবিদের কীর্তি-কথা সংগ্রহ ও রক্ষণের আয়োজন করিয়া গুপ্তকবি শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেরই গোড়াপত্তন করিতেছেন না—সেই সর্বপ্রথম সাহিত্যিকের পরিচালিত সাময়িক পত্রে নবযুগের বাংলা সাহিত্যেরও পত্তন হইতেছে। এই গোষ্ঠীতে নূতনের—পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির—প্রবেশাধিকার নাই; পুরাতনই নব কলেবরে রূপায়িত হইতেছে। গদ্য নয়—বাংলা কবিতার পুনর্জন্ম হইতেছে।

কালের প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে চলিতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় আসিয়া ঠেকিলাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক—অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আছেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আছেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু আছেন। এখানেও আদর্শ পুরাতন, কিন্তু তবু বাংলা গদ্যের নবজন্মলাভ হইতেছে। অক্ষয়কুমার শনৈঃ শনৈঃ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের আমদানি করিতেছেন।

তাহার পর মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'। রাজেন্দ্রলাল একাই একশো, সহায়কের প্রয়োজন তাঁহার নাই।

তিনি বিষয়কে বিজ্ঞানের উপর এবং ভাষাকে ব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন, চাহিলেন বাংলা সাহিত্যে শাস্ত্রসম্মত সমালোচনার প্রবর্তন করিতে। এখানেও আদর্শ ভারতীয়। নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাণীবিজ্ঞান বিদেশ হইতে আসুক, সাহিত্যের ভিত্তিভূমি কিন্তু স্বদেশের মৃত্তিকা।

কিন্তু কোথায় কথাসাহিত্য, কোথায় গল্প-উপন্যাস? চলিতে চলিতে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের 'মাসিক পত্রিকা'র সাক্ষাৎ মিলিল; টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' হাঁকিয়া বলিল, "এই তো আমি আসিয়াছি। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত আমি সেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই 'বাবুর উপাখ্যান' যদিও, তাঁহার 'নববাবুবিলাস' যদিও আমার সাক্ষাৎ অগ্রজ, তবুও আমার ঠক চাচাকে দেখ।" গল্প আছে কিন্তু সাহিত্যরস নাই, তাই বাঙালী এই হাঁকে ভুলিল না। ভূদেব এবং কৃষ্ণকমল সাময়িকপত্রনিরপেক্ষ ব্যক্তিগতভাবে 'রোমান্স অব হিস্টরি'র অনুসরণে গল্প রচনা করিলেন, কিন্তু তাহা দেশের মর্মে পৌঁছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও সার্ ওয়াল্টার স্কটকে পুরোভাগে রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রয়াস করিলেন 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী'তে। চমক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু পরিবেশনের পাত্র সাময়িক পত্র ছিল না বলিয়া তেমন প্রসার হইল না।

কাজেই আবির্ভাব হইল 'বঙ্গদর্শনে'র—বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র এবং 'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিমের। 'বিষবৃক্ষ' 'ইন্দিরা' 'চন্দ্রশেখর' 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—'বঙ্গদর্শনে'র দর্পণে বাঙালী নিজের মুখ দেখিয়া পুলকিত হইল। বঙ্কিম বিদেশের সোনাকে হজম করিয়া স্বদেশের শস্যক্ষেত্রে সোনা ফলাইলেন। আসিল ইউরোপের মনীষীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন দর্শন, মায় মার্ক্সবাদ পর্যন্ত—কিন্তু ভারতীয় মূর্তি লইয়া।

তাহার পর 'ভারতী'তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাধনা সমগ্র বঙ্গদেশের 'সাধনা'য় রূপান্তরিত হইল পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যভারে। রবির কিরণদীপ্ত সেই আমাদের তরুণ মধ্যদিন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় 'বঙ্গদর্শনে' "বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ" করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় সমুজ্জ্বল মধ্যাহ্নের বিকাশ করিলেন। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা,' 'ভ্রমরে' সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' এবং 'বান্ধবে' রমেশচন্দ্র দত্তের 'জীবন-প্রভাত'—বাংলা-কথাসাহিত্যে সাময়িক পত্রেরই কৃতিত্বের ইতিহাস; সেই ইতিহাস পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী' সাপ্তাহিকের প্রথম সাতটি সংখ্যায় সাতটি ছোটগল্প লিখিয়া। প্রমাণ করিলেন এডগার অ্যালেন পো, গী তু মোপাসাঁ বাংলা দেশের মাটিতেও অসম্ভব নয়—পরিপূর্ণ মাটির রসে সঞ্জীবিত ফুল—টবে আর্জানো মরশুমী ফুল নয়।

সদরে সাময়িক পত্রের এই প্রবহমান ধারা ধরিয়া বাংলা সাহিত্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। খিড়কির দরজাতেও আর একটি ধারা ছিল, যাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। আমরা কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি পরিচালিত 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' 'জন্মভূমি'র এই ধারাকে গোঁড়া, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি আখ্যা দিয়া উপেক্ষাই করিয়াছি; রেনল্ডসের আদর্শে অনুপ্রাণিত কথাসাহিত্যকে একটুও আমল দিই নাই। কিন্তু হৃদয়গ্রাহী গল্প বলিয়া ইহারা যে বাংলা দেশের পনেরো-আনাকে দীর্ঘদিন মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন সে কথাও আজ অস্বীকার করিতে পারি না।

সংস্কার ও গোঁড়ামি এই দুই ধারায় পা দিয়া 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকার মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। বিদেশী গল্পের গুচ্ছে তিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন ভরাইয়া দিলেন—ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ, জাপানী গল্পের বিচিত্র নমুনা-আস্বাদে

গল্পপিপাসু বাঙালী পাঠক-সমাজ মাতিয়া উঠিলেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রেনল্ডস গেলেন—আসিলেন রাইডার হ্যাগার্ড, মারি করেলি, মিসেস হেনরি উড।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিপুল প্রসারে চমকিত হইলাম। 'ভারতী' ও 'সাহিত্যে'র সঙ্গে আসিয়া কাঁধ মিলাইলেন 'প্রবাসী' ও 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়। চতুরঙ্গ-চালিত বঙ্গসাহিত্যের অভিযান দ্রুত চলিতে লাগিল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আসিয়া জুটিলেন; চারুচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল, প্রেমাঙ্কুর, হেমেন্দ্রকুমার দেশী-বিদেশী গল্পে 'ভারতী'র আসর ভরিয়া তুলিলেন। বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মোহনায় আসিয়া দাঁড়াইল। 'ভারতবর্ষ' 'সবুজ পত্রে'র পিঠ পিঠ প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধও আসিয়া পড়িল; বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন শরৎচন্দ্রের এবং নূতনরূপে পুরাতন প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটিল।

বিশ্বমহাযুদ্ধের আলোড়ন শেষ হইলে দেখা গেল, ইউরোপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ উগ্র মূর্তি লইয়াই বাংলার অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' "স্ত্রীর পত্র" লিখিতেছেন, প্রমথ চৌধুরী লিখিতেছেন 'চার-ইয়ারী কথা,' অজিতকুমার চক্রবর্তী আমাদের কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের পাঠ দিতেছেন। ঠিক এই অবস্থায় বঙ্গভারতীর পূজামণ্ডপে অ্যাপ্রেন্টিসরূপে প্রবেশ-বাসনায় আমিও কন্টিনেন্ট সাহিত্যে পাঠ লইতেছি। ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, স্ট্রীণ্ডবার্গ, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডস্টয়ভ্স্কি, লিনানস্কি, বোয়ার, ক্নুট হামসুন—বঙ্গবাণীর নিরামিষ অঙ্গনে তাজা রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে কি উত্তেজনা, কি উন্মাদনা! সেই ঢেউই চলিল 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'প্রগতি' 'উত্তরা' পর্যন্ত; শিং ভাঙিয়া নরেশচন্দ্র আসামী এবং উকিল দুইরূপে এবং রাধাকমল শুধু উকিলরূপে তরুণদের দলে ভিড়িয়া গেলেন। দেখিলাম, 'নারায়ণ' একদিকে

উলঙ্গ যৌননৃত্য করিতেছেন এবং অন্য দিকে মেটারলিঙ্কের ভূত ঝাড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে কাহিল করিতে চাহিতেছেন, 'মানসী'র সহিত 'মর্মবাণী' যুক্ত হইয়া রক্ষণশীল দলের মুখপত্র হইয়াছেন, 'বঙ্গবাণী'তে স্কুল-পালানো শরৎচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধে চাপিয়াছেন।

মোজেইকের শেষ ফাটলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ১৯২৯-৩০এর সন্ধিক্ষণে পৌঁছিলাম—'ভারতী' নাই, 'বঙ্গবাণী' 'মানসী ও মর্মবাণী' স্তব্ধ হইয়াছে, 'সবুজপত্র' শুষ্ক ও মৃত, 'কালি-কলম' 'কল্লোল' 'প্রগতি' কেহই নাই। আজ 'শনিবারের চিঠি'ও মরিল। শুধু বিচিত্র যাত্রীশ্রেণী লইয়া অম্‌নিবাস 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'বসুমতী' চলিতে থাকিবে, উত্তরাখণ্ডে 'উত্তরা' "আছি—আছি" বলিয়া উত্তর দিবে—'শনিবারের চিঠি' বাঁচিবে না, থাকিবে না?

ভূতপূর্ব স্নানঘরে ম্যানেজারের চিত্তের দাবদাহ প্রশমিত হয় না—সহস্র বিকারের বিভীষিকার মধ্যে তাহাকে কোন্ অদৃশ্য শক্তি টানিয়া লইয়া যায়; পরিণামে কি ঘটে তাহার পরিচয় আমার "রসাভাস" কবিতায় এই ভাবে আছে:

ঝঞ্ঝার মোহে অবোধ বিহঙ্গম
ডানা ঝাপটিয়া উঠিল উর্ধ্বাকাশে;
নহে বিহঙ্গ, চপল চিত্ত মম,
ধূলি-বাত্যায় চমকি উঠিল ত্রাসে।
নীলিমা ধূসর, ঈশানের কালো মেঘ
বর্ষণাকুল; বাড়িছে ঝড়ের বেগ,
চড়িছে মাত্রা—তিন চার ছয় পেগ—
ঝঞ্ঝার সাথী হাসিল অট্টহাসে;
ভগ্নপক্ষ ঝড়ের কপোত সম
ব্যোমলোভী মন বন্দী ধূলির পাশে।

রাত্রি গভীর, বীভৎস কোলাহল!
ঝলকে অশনি মেঘের বক্ষ চিরে,

মদের পাত্র ঝঞ্ঝার সম্বল,
বজ্র হাঁকিছে আবরণহীন শিরে!
কাঁকড়ার খোলা, ঝাল মাংসের ঝোল,
নামিল বৃষ্টি, মুখে কুৎসিত বোল
কোথায় চুমিছে কাহারে দিতেছে কোল,
ধুলির সঙ্গী ঝড়ের সঙ্গিনীরে—
বক্ষেতে জ্বালা, মুখে হাসি খলখল,
স্খলিত বচন গোঙানি হইল ধীরে!

বহে ঝড়, তবু আকাশবিলাসী মন,
পঙ্কজ তবু পঙ্কে গজাতে চায়,
ক্ষণে খুঁজে ফেরে বাসনার আয়োজন,
ক্ষণে ক্ষণে মন অসীমের পানে ধায়!...

কিন্তু অসীমে ধাওয়া করিতে গেলে ছোট হইলেও একটা বিমান চাই। বিমানের পাখা পুড়িয়া গিয়াছে, ছিন্নপক্ষ পাখীর মত ভূতলে পড়িয়া শুধু আর্তনাদই করি। হাতে কাজ বিশেষ নাই। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃপা করিয়া আমার সেই স্নানঘরে আসিয়াই বসেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজীতে লেখা 'উড়িষ্যার ইতিহাস' ময়ূরভঞ্জের রাজবদান্যতায় প্রবাসী প্রেসে ছাপা হইতেছিল—অনেক ছবি, বিরাট কাজ। আমার একান্ত অধিকারে গড্‌রেজের একটি লৌহ-ড্রয়ার ছিল। ব্লকগুলি তাহাতেই তুলিয়া রাখিতাম। কেদারনাথ আসিলেই সেগুলি বাহির করিয়া সযত্নে টেবিলের উপর সাজাইয়া দিতাম; তিনি নাড়িতেন চাড়িতেন, দেখিতেন; স্কেল হাতে লইয়া মাপজোক করিতেন; প্রেসের বেয়ারা কানা নিঝ্‌ঝু যে কাজ স্বচ্ছন্দে করিতে পারিত, আমি প্রত্যহ সেই কাজ করিতে করিতে হাঁপাইয়া উঠিতাম। দুইজনে সামনাসামনি বসিয়া ব্লকগুলিকে নিরীক্ষণ-অবলোকনপর্ব শেষ হইলে কেদারনাথ সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া যাইতেন,

আমিও লৌহপেটিকায় ব্লকগুলিকে পুনরায় তুলিয়া চাবিবন্ধ করিয়া মধ্যাহ্ন-আহার ও বিশ্রামের জন্য বাড়ি যাইতাম। যেদিন যত বিরক্তি ও অবসাদ বোধ হইত সেই রাত্রি তত বিকারের ঘোরে কাটিত; সদ্য-পরিচিত কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রাওয়ের সহিত কাব্যচর্চার সুযোগ মিলিলে রাত্রিটা আনন্দোজ্জ্বল হইত। তিনি আমারই 'পথ চলতে ঘাসের ফুলে'র কবিতা অনর্গল আওড়াইয়া আমার মৃতপ্রায় কবিমনকে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার ভবানীপুরে উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন বসিল। রবীন্দ্রনাথ মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক অবস্থা তখন যে সম্মেলনে যোগ দিবার অনুকূলে ছিল না সুনীতিকুমারের নিকট 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কিত পত্রই তাহার প্রমাণ। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি 'নারায়ণে'র বিপিনচন্দ্র পাল এই অনুপস্থিতির কারণে কবিকে আর একবার আর এক হাত লইলেন। সাহিত্য-জগতে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাস হইতে সম্মেলনে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। সরস্বতীপূজার দিন ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৩০, ৭ই মাঘ ১৩৩৬ সম্মেলনের আরম্ভ-দিবস। আমার পূর্বপরিচিত 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সমভিব্যাহারে কেদারনাথ সম্মেলন-মণ্ডপে চলিতেছিলেন। হেদুয়ার সন্নিকটে তাঁহাদের সহিত আমার দেখা। সুরেশচন্দ্র পরিচয় করাইয়া দিলেন, সসম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। স্মরণীয় দিন এবং স্মরণীয় মুহূর্ত—অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অশান্তির মধ্যে স্নেহশীল দাদামহাশয়ের সর্বগ্লানিহর স্পর্শ ও আশীর্বাদ লাভ করিলাম। দাদামশাই-নাতি সম্বন্ধ পাকা হইল। সে সম্বন্ধ দাদামশাইয়ের মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

সম্পূর্ণ আত্মস্থ ও আদর্শে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন আমার মা। দাদা তখন বাঁকুড়ায় ওকালতি করেন, বাবা-মা সেখানেই থাকেন।

অকস্মাৎ মায়ের নিদারুণ পীড়ার সংবাদ আসিল। যে পুষ্প আপনাকে বৃন্তহীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবিয়াছিল, মাটির অন্ধকারে মূলে টান পড়াতে সে বেদনাহত ও বিহ্বল হইয়া উঠিল; উচ্ছৃঙ্খল মন উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে ভরিয়া গেল। ১৫ই জুলাই একাকী বাঁকুড়া পৌঁছিলাম, মা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝখানে দোল খাইতেছিলেন। ১৭ই জুলাই বেলা দশটা নাগাদ তিনি চির-বিদায় লইলেন—১লা শ্রাবণের ক্ষান্তবর্ষণ দ্বিপ্রহরে শ্মশানযাত্রা করিলাম। গন্ধেশ্বরী নদীর কূলে চিতা জ্বলিল, আমি শ্মশানস্থিত ইঁদারার ধারে বসিয়া আমার সাহিত্য-জীবনের গোড়ার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম; এই মা-ই আমার কানে ছন্দের মন্ত্র দিয়াছিলেন নিতান্ত শৈশবে—প্রত্যুষের অন্ধকারে নিদ্রাজাগরণের বিচিত্র সন্ধিক্ষণে সেদিন প্রথম তাঁহার মুখে সুর-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম—পয়ারের সেই প্রভাব আজও আমার মনকে আন্দোলিত করে, যখনই আমি স্মৃতি হইতে স্মরণ করি :

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু ॥
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে ॥

মায়ের সেই সুগভীর ধর্মবিশ্বাস আমার ছন্নছাড়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সেই দিন সেই মহাগুরুনিপাত-বৎসরের সূত্রপাতে মাকে মনে মনে বলিলাম, তুমি বাঁচিয়া থাকিতে যে অর্ঘ্য দিতে পারি নাই, আশীর্বাদ কর এইবার যেন তাহা রচনা ও নিবেদন করিতে পারি। ছয় বৎসরের মধ্যেই এই সঙ্কল্প মায়ের আশীর্বাদে পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলাম, ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে আমার 'রাজহংস'-কাব্য মাকে নিবেদন করিয়া বলিতে পারিয়াছিলাম :

জননী, তোমারে স্মরিয়া আমার কাব্যের দীপশিখা
জ্বালাইয়া রাখি অবোধ অন্ধকারে,
দেখিতে না পাই, বুঝি অনুভবে তুমি আছ কাছে কাছে ;
নিজে এসে মাতা, লহ মোর দীপারতি।

কিন্তু এ-সব অনেক পরের কথা। মাঝখানে আরও কথা আছে—মৎ-পরিচালিত সাপ্তাহিক 'চিত্রলেখা' ও 'যুগবাণী'র কথা।

আর কেহ না জানুক, আমার মন সেই নেতা-ধোপানীর মতই জানিত, 'শনিবারের চিঠি' ঘুমাইয়া আছে, সময় হইলেই জাগিবে। কিন্তু ততক্ষণ কি করিব ইহাই ছিল আমার চিন্তা। করিবার অনেক কিছু ছিল। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভারতের প্রধান প্রধান নেতারা লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়া আইনভঙ্গ অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছেন, ঢাকা মুন্সীগঞ্জে মুসলমানদের ব্যাপক হিন্দু-নিগ্রহ সমগ্র দেশকে স্তব্ধ স্তম্ভিত ও আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, বৃটিশ শাসন-কর্তারা এবং অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্র এ বিষয়ে সমবেতভাবে এমন আশ্চর্য রকম মূক যে সদ্য ইউরোপ-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিমূঢ়-বিস্ময়ে স্বদেশে এই প্রসঙ্গে পত্র লিখিতেছেন, ডিসেম্বরে (১৯২৯) জওহরলালের সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসে স্থির হইয়াছে—দেড় বৎসরকাল অধিবেশন বসিবে না, ৪৩তম অধিবেশন ১৯৩১ সনের মার্চ-এপ্রিল মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত হইবে সুতরাং দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সর্ব-ভারতীয় আলোচনা মুলতুবি আছে, গবর্মেন্ট প্রেস-আইনের আরও কড়াকড়ি করিয়াছেন—সাহিত্যিক সমাজের কিছু করিবার এই ছিল সুযোগ। কিন্তু কেন জানি না, এত বড় আন্দোলন ও প্রজা-নিগ্রহের মহাকাব্যিক মহিমা বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের চিত্তকে স্পর্শ করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিককার চারণ-কবি "হিজ মাস্টারস ভয়েস" কোম্পানিতে চটুল প্রেমের গান-রচনায় ও শিক্ষাদানে মশগুল, আমরা রাজনীতি-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক কয়েকজন প্রত্যহ প্রবাসী প্রেসের ছাপাখানার

ম্যানেজারের ঘরে সন্ধ্যায় সমবেত হইয়া চা-ধূমপানের অবকাশে 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের 'অপরাজিতে'র পাণ্ডুলিপি শুনিয়া তৃপ্ত; এই তৃপ্তির মাঝখানে ঢাকা হইতে প্রেরিত মোহিতলালের দাঙ্গার নৃশংসতা-বিষয়ক চিঠির আর্তনাদ আমাদিগকে ব্যথিত পীড়িত উত্তেজিত করিত বটে, কিন্তু আমাদের কিছু করিবার ছিল না। আজ মনে মনে সেদিনের হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখিতেছি, কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লবণ-সত্যাগ্রহ ও তজ্জনিত কারাবরণের কবিতাগুলি ছাড়া এই বিরাট আন্দোলনকে লইয়া আর সাহিত্যই সৃষ্ট হয় নাই। শিল্পে একমাত্র নন্দলাল বসু মহাশয়ের ডাণ্ডি-লবণ-অভিযানে যষ্টিধৃত গান্ধীজীর ছবিখানি স্থায়ী গৌরব অর্জন করিয়াছে। সারাদেশে শিল্প-সাহিত্যের আর কোনও সাড়া কেন জাগে নাই তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। প্রভাত-মোহনের কয়েকটি কবিতা 'প্রবাসী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তখনই প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে আমি সকলগুলি একত্র করিয়া 'মুক্তিপথে' নামে (প্রচ্ছদপটে নন্দলালের গান্ধীজীর চিত্র দিয়া) পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সতর্ক পুলিস অচিরাৎ তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "মাতৃভূমির সেবা" কবিতাটি আজও অনেকের স্মরণে আছে, বিশেষ করিয়া এই কয়েকটি পংক্তি:

অনেক ঘুমায়েছি জাগিতে হবে,
অনেক সহিয়াছি আর না সহে,
যে পাপে যে গরলে জ্বলিছে দেশ
তাহার শেষ আজ না হ'লে নহে।
আজিকে সব ভুলে অকুতোভয়ে
মরণে যেতে হবে অথবা জয়ে,
বসিয়া ভাবিবার সময় নাহি আর
যুগ যে কেটে গেল,—বেলা যে বহে।
রুধিতে হবে আজ পাপের পথ

আপন বুক দিয়া জীবন দিয়া ;
শুধিতে হবে ধার জীবন-দেবতার
অযুত নরমেধ অনুষ্ঠিয়া।
... ...
আজি এ শুভদিনে সবাই এস,
জ্বলেছে হোমানল ডাকিছে হোতা,
মায়ের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান,
পূজার ফুল কই, আহুতি কোথা ?

প্রভাতমোহন কলিকাতার সন্নিকটে মহিষবাথানে লবণ-সত্যাগ্রহ করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বাংলা দেশে আর কিছু যে হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ বাংলা দেশে তখন স্বরাজ্যদল প্রধান। তাঁহারা দুই বিবদমান ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের কুৎসা করিতেছেন। এই ব্যাপার অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। চিন্তাশীল বাঙালীমাত্রেই তিতবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সম্ভবত সেই কারণেই আর মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই।

ঠিক এই সময়ে শ্যামবাজারে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর "চিত্রা" চলচ্চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা হইল; মালিক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। তখনও চিত্রনির্মাণ-প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের পত্তন হয় নাই, তবে তোড়জোড় চলিতেছে। সরকার মহাশয় শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট একটি চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন—সম্ভবত উভয়েরই মালিকানা স্বত্বে। কেদারনাথ তাঁহার ইচ্ছা আমাকে জ্ঞাপন করিয়া যথাবিহিত করিতে আদেশ করিলেন। চড়ুকের পিঠ ঢাকের বাদ্য শুনিয়াই সড়সড় করে, আমি হাতে স্বর্গ পাইলাম। হুকুম হইল প্রবাসী প্রেস সংক্রান্ত কাহারও সম্পাদক হওয়া চলিবে না। আর একজনের নাম চাই। হাতের কাছেই ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা সেলামী কবলাইয়া সম্পাদক-পদে নাম ধার দিতে রাজী করাইলাম,

লেখার দক্ষিণা স্বতন্ত্র। আসলে সম্পাদনা পরিচালনা মুদ্রণের যাবতীয় ভার আমার উপরেই পড়িল। ১৯৩০ সনে ১৫ই নবেম্বর চলচ্চিত্র-বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'চিত্রলেখা' বাহির হইল। যতদূর স্মরণ হয় বাংলায় সিনেমা-বিষয়ক ইহাই প্রথম সার্থক পত্রিকা।. ১৮ সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থনৈতিক কারণে ইহার প্রচার বন্ধ হয়। 'পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা।

ইহার পর 'যুগবাণী,' সেটিও সাপ্তাহিক—রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক। প্রকাশের ইতিহাস একটু বিচিত্র।

একদা সন্ধ্যায় প্রবাসী প্রেসের অফিস-ঘরে বসিয়া আছি, দুইটি তরুণ যুবকের আবির্ভাব হইল। তখনও কলেজে পড়া তাঁহাদের সাঙ্গ হয় নাই, কিন্তু অভিলাষ উচ্চ; উদ্যমও প্রচুর। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বিজলী' সাপ্তাহিক দীর্ঘকাল বন্ধ আছে, তাঁহারা তাহা পুনঃপ্রকাশ করিতে চান। 'বিজলী'র ইতিহাস আমি জানিতাম। অনেক হাত ঘুরিয়া অনেক কাণ্ড করিয়া উহা বারীনদার কবলে আসিয়াছিল। যুবক দুইটি সম্পূর্ণ মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে চাহেন। আমার নিকট কেন—এই প্রশ্নের জবাবে জানিতে পারিলাম, 'শনিবারের চিঠি' যখন বন্ধই হইয়াছে, 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্যে"র লেখককে তাঁহারা চান, 'বিজলী'তে সপ্তাহে সপ্তাহে সাহিত্যিক টিপ্পনী কাটিবার জন্য। হাত চুলকাইতেছিল, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে রাজী হইয়া গেলাম। কাজটা শখের, তবু উৎসাহও কম বোধ করিলাম না। পরের সপ্তাহ হইতে 'বিজলী'তে আমার "চলন্তিকা"—সাহিত্যিক টিপ্পনী নিয়মিত বাহির হইতে লাগিল, অবশ্য বেনামীতে। ইহা ছাড়া কবিতা, প্রবন্ধ ও পুস্তক-সমালোচনারও বান ডাকাইয়া দিলাম।

পাঁচ-সাত সপ্তাহ পরে যুবকেরা আবার আবির্ভূত হইলেন; এবার একটি পত্র হস্তে—বারীনদার পত্র। তিনি 'বিজলী'র গুড উইল বাবদ মাত্র হাজার টাকা দাবী করিয়াছেন, নতুবা উহা

চালাইতে দিবেন না। যুবকেরা তো স্বভাবতই সঙ্গতিহীন, আমাকে বেচিলেও তখন হাজার টাকা হইত না। মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। যুবকেরা কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের কাছাকাছি সুকিয়া স্ট্রীটের (অধুনা কৈলাস বসু স্ট্রীট) উপর একটা ঘর ভাড়া করিয়া বইয়ের দোকান খুলিয়াছিলেন, নাম দিয়াছিলেন "যুগবাণী সাহিত্য-চক্র," পরে বুঝিয়াছিলাম দোকানঘর ও পত্রিকাপ্রকাশ তাঁহাদের বাহিরের মুখোশ মাত্র। তাঁহারা ভিতরে ভিতরে সম্রাটকে উৎখাত করিবার বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যাহা হউক, চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'বিজলী'র আবার গুড উইল। নূতন কাগজ বাহির করুন, নাম দিন 'যুগবাণী'। যুবকেরা রাজী হইলেন। কিছু টাকা চাই, আমার কাছে শ দুয়েক টাকা ছিল, দিলাম। এই টাকা পরে তাঁহারা আমার 'অঙ্গুষ্ঠ' কবিতা-পুস্তক ছাপিয়া দিয়া পরিশোধ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, নূতন সাপ্তাহিক 'যুগবাণী' বাহির হইল—সম্পাদক যুবকদের অন্যতম শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ। সেই 'যুগবাণী'কে জীয়াইয়া রাখিয়া আজ তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহার মত উদ্যমশীল যুবক আমি বাংলা দেশে দেখি নাই। 'যুগবাণী'র প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই আমার "যুগবাণী" নামক একটি কবিতা বাহির হইল। "বাংলা দেশের স্বরাজ্যদলের আত্মকলহ" স্মরণ করিয়া তাহাতে লিখিলাম ঃ

বিবাদের বাণী নহে, জাতি-মুক্তি-বাণী আজ চাহি,
বিকৃত জীবন নহে, চাহি সত্য মৃত্যুর সাধনা,
ছুটেছে নিখিল-বিশ্ব নূতন আলোকে অবগাহি'
কারাগারে রুদ্ধ হয়ে করিব কি আত্ম-আরাধনা?
ভাঙিয়া ফেলিতে হবে এ পাষাণ-কারার প্রাচীর—
বাহিরে খুঁড়িছে মাথা মুক্তির আলোক সুবিপুল,
কাঁদিতেছে অন্ধকারে ভারতের বাণী সুগভীর—
কারাগারে ব্যবধান, মিলাইতে হবে দুই কূল।

এ মিলন-সাধনায় প্রচারিতে নব-যুগবাণী
আমাদের যাত্রা শুরু, যাত্রা শেষ কবে নাহি জানি।

পরে পরে আরও অনেক লেখা লিখিলাম। 'যুগবাণী' জাঁকিয়া উঠিল। সপ্তাহ দশেক পরে একদিন 'যুগবাণী' অফিসে গিয়া দেখি, দ্বার তালাবদ্ধ; পুলিসের স্থূল হস্তাবলেপের কিছু চিহ্ন পথের উপর বর্তমান। সন্ধান লইয়া জানিলাম, রাজদ্রোহের অপরাধে যুবক দুইজন এবং তৎসহ আরও কেহ কেহ ধৃত হইয়াছেন, কারবার বন্ধ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ফিরিয়া আসিলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, দ্বিতীয় যুবকটি হইতেছেন—কবি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

দশম অধ্যায়

যবনিকা পতনের পূর্বে ও পরে

সাধ করিয়া গাঙে ঝাঁপ দিয়াছি। তলার মাটি পায়ের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, নাকের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিয়া জল ললাট ছুঁই-ছুঁই করিতেছে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময় ঠিক হাতের নাগালের বাহিরে পর পর দুইটি শক্ত নির্ভরশীল ভেলা ভাসিয়া যাইতে দেখিলে মনের যে অবস্থা হয়, 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম পর্যায় মাসিক-জীবন শেষ হইবার পূর্বে আমাদের মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইল। যে উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'র যাত্রা শুরু হইয়াছিল, মরিবার ঠিক প্রাক্কালে দেখা গেল, বঙ্গ-সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ মহারথী দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ ভাষায় সেই উদ্দেশ্যেরই পোষকতা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের মনের মাঝখানে যে মালিন্য মেঘরূপে ঘনাইয়া উঠিয়াছিল এক পশলা বর্ষণের দ্বারা তাহা অপসারণের সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, কিন্তু ১৯২৯ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কবি অকস্মাৎ কানাডা যাত্রা করায় সে সুযোগ মিলে নাই। জাপান হইয়া জুলাইয়ের গোড়ায় তিনি ফিরিয়া আসা মাত্রই আষাঢ়ের (১৩৩৬) 'শনিবারের চিঠি'তে "শ্রীচরণেষু" কবিতায় লিখিলাম—

'অপরাধ করিতেছি,' কহিতেছে জনে জনে
'হব গুরুহত্যা-পাপভাগী'।
হে গুরু, আমরা জানি, তুমি জান মনে মনে,
কেবা কত গুরু-অনুরাগী!
... ...
অর্ধেক শতাব্দীব্যাপী করালে অমৃতপান,
সে অমৃতে বাখানি গরল,

সত্য বটে। নহে গুরু, সে তোমার অপমান,
মোরা ক্লীব, মোরা হীনবল,
দেবভোগ্য সে অমৃত পারি না করিতে আত্মসাৎ ;
স্বর্গের পীযূষধারা বিষ হয়ে ওঠে অকস্মাৎ।
ধরার অক্ষম জীব, ধরায় করি না পদপাত ;
শূন্যে ছুঁড়ি চরণ চঞ্চল।
জানিতে পার না তুমি, ধ্যানাসনে বসি দিনরাত
সুধা কবে হয়েছে গরল!

আপনার কল্পনায় আপনি বিভোর রহি
মহাবিশ্বে করিছ ভ্রমণ—
পিছু ফিরে দেখ নাই, সঙ্গী তব কেহ নহি,
তুমি একা, পথ সুবিজন।
অনন্ত-যাত্রার মন্ত্র মহোল্লাসে আপনি উচ্চারি'
ভাবিছ, তোমার পিছে মোরাও দিতেছি বুঝি পাড়ি।
যদি কভু মোহ টুটে দেখিবে দু'নয়ন বিস্ফারি'
নিজেরই ছায়ার সঞ্চরণ,
দূরে কাছে কেহ নাই, দীর্ঘ পথ দিগন্ত-প্রসারী—
তুমি একা করিছ ভ্রমণ।

আপনি দেখিছ স্বপ্ন, ভাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন মন,
স্বপ্নে স্বপ্নে চলিছে ধরণী।
জ্ঞানে কর্মে ব্যর্থ মোরা, রিক্ত মোরা, অকিঞ্চন,
ঘাটে বাঁধা মোদের তরণী।
তুমি ভাব, সে তরণী পাড়ি দেয় বিশ্বপারাবার—
শোন নাই কোলাহল, শোন না ক্রন্দন-হাহাকার,
কুটির-প্রাঙ্গণে মোরা দ্বন্দ্ব করি আজো ক্ষুদ্রতার ;
বহু দূরে স্বপন-সরণী—
তুমি একা যাত্রী সেথা, শিরে স্বপ্ন-কল্পনার ভার—
ধূলি-পঙ্কে মলিন ধরণী।

... ...

তুমি নামিও না নীচে, ক'রো না মাটির স্তুতি,
সে তোমার মহা মিথ্যাচার।
আসিয়াছ এ ধরায়—ললাটে স্বর্গের দ্যুতি,
তুমি কেহ নহ মৃত্তিকার।
উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বলোকে আপনার সঙ্গীতে বিহ্বল
একেলা ছুটিয়া চল, ধূলি-পঙ্ক-ম্লান ধরাতল।
ঝরিয়া পড়ুক নিত্য সুধা তব সঙ্গীত তরল,
দীপ্ত হোক মৃত্তিকা-আঁধার—
কবি নহে মন্ত্রদাতা, ওষধি নহেক শতদল—
দূর কর এই মিথ্যাচার।

কিন্তু এই প্রণতি-বাণ কবির চরণ পর্যন্ত পৌঁছিল না ; আষাঢ়-শ্রাবণের ঘনায়মান মেঘপুঞ্জ ও ধারাবর্ষণের পরিবেশে বর্ষামঙ্গল গানে এবং 'রাজা ও রাণী'কে ভাঙিয়া 'তপতী' রচনায় ও তাহার অভিনয়ে তিনি এমনই মশগুল হইয়া রহিলেন যে, আমাদের পুনর্মিলন-ব্যাকুলতা ব্যর্থ হইল। আমাদের প্রণতি-বাণ সুনীতিকুমারের নিকট প্রেরিত পত্র-রূপ ব্রহ্মাস্ত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত মৃত্যুবাণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। অবস্থা আমাদের পক্ষে ক্রমশ সঙ্গীন হইয়াই উঠিতে লাগিল। ১৯৩০ সনের গোড়ায়—জানুয়ারিতে বরোদা এবং মার্চে (২রা) রবীন্দ্রনাথ বিলাত চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলেন ১৯৩১ সনের ৩১ জানুয়ারি তারিখে—প্রায় বৎসর খানেক পরে। ততদিনে ফল-পুষ্প-পত্র-শাখা-কাণ্ডহীন 'শনিবারের চিঠি'র মূল মাটির অন্ধকার গহনে অন্তর্ধান করিয়াছে।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম। মরিবার ঠিক প্রাক্কালে দুই প্রধান মহারথীর সমর্থনরূপ ভেলা দেখিতে দেখিতে মরিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের "রবীন্দ্র-পরিষৎ" সভায় ৫ ভাদ্র (১৩৩৬) রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহারই রবীন্দ্রনাথ-লিখিত রূপ কার্তিকের 'প্রবাসী'তে বাহির হইল—"সাহিত্য-বিচার"। তাহাতে লিখিলেন ঃ

সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এনালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম ক্রোধ অহঙ্কার ইত্যাদি। ছিন্ন করে দেখলে যে বস্তু-পরিচয় পাওয়া যায় সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্ব দ্বারা নয়, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ, লঙ্ঘন করবার উপক্রম করছে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কাম প্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ।—যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জনের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক সাহিত্যের যৌন-প্রবণতা ও প্রবলতা এবং রূঢ় বীভৎসতা সম্পর্কে সংক্ষেপে যাহা এখানে বলিলেন, আমরা নানা দৃষ্টান্ত চয়ন করিয়া নানা ভঙ্গিতে লিখিয়া পূর্বাপর সেই কথাটাই বলিয়া আসিতেছিলাম। আমাদের মৃত্যুর রায় দিয়াও আমাদের উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করাতে আমরা মরিতে মরিতেও পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

রবীন্দ্রনাথ যাহা করিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাদিগকে একেবারে বিমূঢ় বিমুগ্ধ করিয়া দিলেন। ওই প্রেসিডেন্সি কলেজেই বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির সভায় ৩১ ভাদ্র (১৩৩৬) তাঁহার চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মদিনে শরৎচন্দ্র যে ভাষণ দিলেন তাহাকে প্রায়শ্চিত্তিক ভাষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "সাহিত্য-ধর্মে"র বিবাদে যিনি অকস্মাৎ একরকম গায়ে পড়িয়াই অবতীর্ণ হইয়া বিকৃতরুচিদের আরও রুচিবিকারের কারণ হইয়াছিলেন,

অকারণে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাল ঠুকিয়া দ্বন্দ্বে নামিয়াছিলেন, ঠিক দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তিনিই "সবিনয়ে" ও সবেদনায় নিবেদন করিলেন ঃ

অনেক দিন পূর্বে, বোধ হয়, আপনাদের মনে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। একটু কঠোরভাবে তিনি তা করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে আমি 'বঙ্গবাণী'তে তাঁকে জানিয়েছি, যতটা রাগ ক'রে তিনি বলেছেন, ততটাই সত্য কিনা। তারপর থেকে দু-একজনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা আমার ঠিক হয় নাই, তখন নবীন সাহিত্য, যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক-পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরুচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি।

আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—জিনিসটা সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেছে। আমি বরাবর চেয়েছিলাম, কবিরা যাকে রসবস্তু বলেন, এইটিই যেন তাঁরা তাঁদের যৌবনের শক্তি, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নিয়ে সাহিত্য গ'ড়ে তুলতে পারেন। আমি তাঁদের ভালবাসি এবং এই দিক থেকেই তাঁদের উৎসাহ বরাবর দিয়ে এসেছি। যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁদের মন অন্য রকম হয়ে গেছে। যৌবন জিনিসটা আমরা নিজেরা পেরিয়ে গেছি। তাই যৌবনের অনেক রচনা হয়তো আজ পড়তেও ভাল লাগে না, লিখতেও পারি না। এই জন্য মনে করি, বয়স যাঁদের কম, তাঁদের নূতন আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও তার সঙ্গে একটা শুদ্ধ মন নিয়ে সত্য সত্য সাহিত্য তাঁরা রচনা করবেন। সাহিত্যের উন্নতি করবেন। বাঙ্গালা ভাষায় বড় জিনিস লিখে যাবেন, আন্তরিক চেষ্টা নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন। কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি দেখছি, আমি যাকে রস ব'লে বুঝি, তাঁদের ভিতর তার বড্ড অভাব। চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না।

যারা পড়ছে, সাহিত্য-চর্চা করছে, তাদের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলব, তাদের হাত দিয়ে সাহিত্য যে খুব একটা উঁচু পর্দায় বা ধাপে উঠছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ যত কড়া ক'রে বলেছেন, তেমন ক'রে বলবার শক্তি আমার নাই, থাকলে হয়তো তেমন ক'রে বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার। আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হ'লে মানুষ আনন্দ বোধ করে, মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এসব চিন্তা করা দরকার। ভাবা দরকার। আমি গল্প লেখার দিক থেকে বলছি, কবিতার দিক থেকে নয়। এক দিকে চলেছে। সংবাদপত্র—মাসিক—যখন পড়ি, কেবলই যেন মনে হয়, একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশজন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন, দুঃখের ব্যাপার এই—আমরা লিখতে জানি না, সেইজন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, তাতে আমরা লজ্জায় ম'রে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয়তো মনে করে, এসব জিনিস আমরা বুঝি ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা সুযোগ পান, আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এসব জিনিস আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়—তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রতিবাদ ক'রে কিছু লিখলে তারা গালিগালাজ আরম্ভ করবে, কটূক্তি বর্ষণ করবে—সে সব আমরা সহ্য করতে পারব না। সেইজন্য সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়। আমাদের হয়ে একথা তাদের জানাবেন।

…গত এক বৎসর তাঁদের বহু রচনা প'ড়ে তাঁদের কিছু বলবার সুযোগটাই খুঁজছিলাম। সেই সুযোগ আজ পেয়েছি। আমি বলি—তাঁরা সংযত হউন। সত্যিকার রসবস্তু কি, কিসে মানুষের হৃদয়কে বড় করে, সাহিত্য কি,—এসব তাঁরা ভেবে দেখুন।…যথার্থ বন্ধুভাবে আমি তাঁদের বলছি—তাঁরা সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন, যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করি নি, কোনদিন করব ব'লে মনেও করি না। সেদিন তাঁর কথা আমার অতটা না বললেও

হয়তো হ'ত। কারণ, অতখানি [রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্মে"র বিরুদ্ধে] বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল, মনে হয়েছিল, সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর [? দুই] পরে এ আর আমি বলতে পারি নে।

আজ মনে হয়, যতই এঁদের বিরুদ্ধে কথা উঠছে, ততই যেন এঁদের আক্রোশ বেড়ে চলেছে। অন্ততঃ আক্রোশের থেকে করছেন ব'লেই সন্দেহ হয়। মনে হয় যেন তাঁরা বলছেন—বেশ করেছি, আরও করব। তোমরা বলছ, সেজন্য আরও বেশী ক'রে করব। একে কিন্তু সাহস বলে না। এটাকে সাহস ব'লে মনে করি না।···এ যেন 'বে-পরোয়া হয়ে কতটা যেতে পারি দেখিয়ে দিচ্ছি' জানানো। এসব কথা আমি ভারি দুঃখের সঙ্গেই বলছি। বহুদিন সাহিত্যচর্চা ক'রে যা ভাল বুঝেছি, তার থেকেই বলছি,—সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ—একটু আধটু করেছ তা নয়, অনেকখানি করেছ। একটু আধটু জায়গায় কোথাও কিছু হ'লে কিছু হ'ত না। এ ক্ষেত্রে তা একেবারে নয়। এ কথার উত্তরে যদি তোমরা কেউ বল—আমিও তো এটা লিখেছি, রবীন্দ্রনাথও অমনি লিখেছেন—হতে পারে আমরা লিখেছি। তাতে কিন্তু এ প্রমাণ হয় না যে, তোমরা ভাল কাজ করেছ। স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসার সঙ্গে এবং তরুণ সাহিত্যিকদের মঙ্গল ইচ্ছা ক'রে এ কথাগুলি বললাম। এ রকম সুবিধা ও অবসর কমই পাওয়া যায়। অনেক দিন ধ'রে বলব ব'লে মনে করেছিলাম। ভাল না লাগলেও কথা কয়টি ব'লে দিলাম।"—'দৈনিক বঙ্গবাণী', ৮ আশ্বিন ১৩৩৬

কিন্তু যাঁহাদের বলিলেন তাঁহারা তখন ভস্মীভূত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, কোনও একটা নির্দিষ্ট আধারে তাঁহারা আর ছিলেন না। তথাপি শরৎচন্দ্রের সরল স্বীকারোক্তিতে মুমূর্ষু আমরাও এই আশ্বাস পাইলাম যে, আমাদের সঙ্কল্প ও সাধনা মহত্তর ব্যক্তিদের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আর ভয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন তো অতিশয় বেদনাকাতর ছিলই, ইহার পর শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও অনুতাপ-কাতর হইয়া উঠিলাম। প্রায়

বৎসর খানেক পরে পরবর্তী শ্রাবণ (১৩৩৭) মাসের শেষে মাতৃশ্রাদ্ধে বাঁকুড়া যাইবার সময় হাওড়া হইতে দেউলটি স্টেশন পর্যন্ত তাঁহার স্নেহসান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলাম। সে ঘটনা পূর্বে বলিয়াছি।

দুই শ্রেষ্ঠের প্রশ্রয় পাইয়া আবার সমিধ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম। 'শনিবারের চিঠি' ঘুমাইয়া থাক্। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শক্তিসঞ্চয় করুক। প্রয়োজন হইলেই আমাদের ডাকে সে যেন আবার সাড়া দিতে পারে, সে ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখিতে হইবে। ডি. এম. লাইব্রেরি এবং শ্রীগুরু লাইব্রেরির কৃপায় রঞ্জন প্রকাশালয়ের চারিখানি পুস্তকই ('পথের পাঁচালী', 'অজয়', 'যোগভ্রষ্ট' ও 'পথ চলতে ঘাসের ফুল') স্বর্ণপ্রসূ হইয়া উঠিয়াছিল, আমার আশাতিরিক্ত। বাজারে নামডাকও খুব হইয়াছে। অপব্যয়ের পথও সত্ত আবিষ্কার করিয়া সাহিত্যিক-সমাজে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছি। ধীরে ধীরে একে একে ওপারের পাখীরাও এপারে আসিয়া জুটিতেছেন। সাহিত্যভ্রষ্ট সাহিত্যিকদের নৈশ আসর জাঁকিয়া উঠিতেছে।

'প্রবাসী'ত্যাগী শৈলজানন্দ প্রথম আসিলেন 'যুগবাণী'র আকর্ষণে। তাঁহার 'বধূবরণ' ও 'নারীমেধ' প্রশস্তি খুবই হৃদয়াবেগ দিয়া লিখিয়াছিলাম। সে উচাটনমন্ত্র তান্ত্রিক শৈলজানন্দ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ধরা দিলেন। রঞ্জন প্রকাশালয়েও ধরা দিতে চাহিলেন। চুক্তি হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র—'বেনামী বন্দরে'র পাসপোর্ট লইয়া রঞ্জন প্রকাশালয়ে ঢুকিবেন। সে চুক্তিও হইয়া গেল।

অব্যবহিত পরেই প্রবোধকুমার সান্যাল, তাঁহার হাতে 'নিশিপদ্মে'র পাণ্ডুলিপি। তিনিও চুক্তিবদ্ধ হইলেন।

কিন্তু তিন চুক্তিই কাজে নিষ্পন্ন হইবার পূর্বেই একটা সর্বনাশা ঝড়ো হাওয়া আসিয়া রঞ্জন প্রকাশালয়কে মথিত বিপর্যস্ত করিয়া

দিল। প্রেমেন্দ্রকে ডি. এম. লাইব্রেরির সঙ্গে জুতিয়া দিলাম, মুক্তি দিলাম শৈলজানন্দ-প্রবোধকুমারকে। ফলে ব্যবসায়ের যাহাই হউক, বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল।

ঝড়ো হাওয়া আমার নিজের মধ্যেই স্তম্ভিত হইয়া ছিল। তাহাকেই বাহিরে উদ্দাম হইবার অবকাশ দিয়া যখন প্রায় দেউলিয়া হইবার উপক্রম করিতেছি, তখন পর পর দুই মাস এগারো দিনের ব্যবধানে মাতার তিরোভাব (১লা শ্রাবণ) এবং প্রথমা কন্যা উমার আবির্ভাব (১১ই আশ্বিন) নিরালম্ব শূন্যে পায়ের তলায় কিছু মাটির যোগান দিল। আত্মীয়বান্ধবহীন অতিশয় দরিদ্র সংসারে চলচ্ছক্তিহীন গৃহিণীর কোল আলো করিয়া যখন কন্যারত্ন অবতীর্ণ হইলেন তখন এক বছর চার মাসের শিশুপুত্রের দাপটে আলনাস্কারের ভুয়া বাদশাহি কাচের বাসনের মত টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া গেল। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রতিবিধান-কামনায় তটস্থ হইয়া উঠিলাম। প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজার হিসাবে তখন মাসিক ১৭০৲ টাকা বেতন পাই। হঠাৎ নবাবির চোটে রঞ্জন প্রকাশালয়ের আগাম আয়ও বাঁধা পড়িয়াছে। নূতন পুস্তক প্রকাশের অথবা 'পথের পাঁচালী' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার বিন্দুমাত্র সঙ্গতি নাই। অথচ পুস্তক দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। চাকুরির অসহায় বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রমিথিউসের আত্মঘাতী বেদনা অনুভব করিতেছি। এই অবস্থায় সম্পাদকীয় বিভাগ ও ছাপাখানা বিভাগের কলহ ধিকিধিকি তুষানল হইতে প্রজ্বলিত হুতাশনের লোলজিহ্বা বিস্তার করিতে লাগিল। আমি তখন বিলাত-প্রবাসী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের "লোক" বলিয়া চিহ্নিত, সম্পাদকীয় বিভাগের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেদার চট্টোপাধ্যায়ের "লোক"। একত্র পাশাপাশি চেয়ারে অবস্থানজনিতই সম্ভবত নীরদচন্দ্র চৌধুরীও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পুষ্ট করিয়াছেন। এ-পক্ষে ও-পক্ষে নালিশ চলে; ছাপাখানা পক্ষ বলে—যথাসময়ে প্রুফ পাওয়া যাইতেছে না,

সময়ে কাগজ প্রকাশ করিতে ছাপাখানার হয়রানি ও খরচান্ত হইতেছে ; সম্পাদকীয় পক্ষ বলে,—বাহিরের অর্থকরী কাজ লইয়া ছাপাখানা এত ব্যস্ত যে ঘরের কাজ অবহেলিত হইতেছে। অসহায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কখনও এ-পক্ষকে কখনও ও-পক্ষকে অনুযোগ ও উপদেশ-মূলক চিরকুট প্রেরণ করিয়া কর্তব্য পালন করেন। উত্যক্ত হইয়া একদিন হঠাৎ একটা মারাত্মক অন্যায় করিয়া ফেলিলাম। হাতে 'যুগবাণী' ছিল, তাহার "চলন্তিকা"য় ব্রজেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক গবেষণাকে কঠোর ব্যঙ্গ করিয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া দিলাম। পার্শিবাগান-আড্ডাবিরোধী বন্ধুদের কথাবার্তায় বিশ্বাস হইয়াছিল—ব্রজেন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছুই নহেন, পরের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিয়াই তাঁহার খ্যাতি। তিনি ইংরেজী বাংলা মোটেই লিখিতে জানেন না, বন্ধুরা লিখিয়া দেন, তিনি যশের উপস্বত্ব ভোগ করেন। আমার টিপ্পনীতে এই মর্মের ইঙ্গিত ছিল। আর যায় কোথায় ? ব্রজেন্দ্রনাথ খোলাখুলি ভাবে শত্রুতা ঘোষণা করিলেন, এবং শত্রু-হিসাবে তিনি যে কত শক্তিশালী হইতে পারিতেন ভুক্তভোগীরা তাহা জানেন। তাঁহার বন্ধুত্বও অকৃত্রিম, মৌখিক সম্ভাষণেই তাহা শেষ হইত না। শত্রুতার মধ্য দিয়া তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমি অর্জন করিয়াছিলাম। সে কাহিনী পরে বলিব। গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথের অসাধারণ কৃতিত্বের কথাও যথাসময়ে প্রকাশ করিব।

আপাতত তখন বড় বেকায়দায় পড়িলাম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাথায় থাকিলেও কার্যত রাজত্ব কেদারনাথের। সুতরাং আমার মনে সুখ ছিল না। চাকুরি ছাড়িয়া অন্য কিছু করার কথা এই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই মনে মনে স্থির করিয়া লইলাম। কি করিব ? কলেজ-জীবনের পাকা বন্দর হইতে সামান্য ভেলা জানিয়াও 'শনিবারের চিঠি'কেই আশ্রয় করিয়াছিলাম। পয়সার দিক দিয়া না হইলেও খ্যাতির দিক দিয়া তাহা আমাকে অনেক দূর

অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'কেই আর্থিক অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলে কি হয়? কিন্তু তখনও মালিক অশোক চট্টোপাধ্যায় বহুদূর সাগরপারে। মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। রীতিমত অনুশীলনের অভাবে কলম ভোঁতা হইয়া আসিয়াছিল, সেই কলমেই শান দেওয়ার সাধনায় লাগিলাম। নূতন সাহিত্য-জীবন—সাহিত্যের ভিত্তির উপর আত্মনির্ভরশীল জীবন আরম্ভ করিব। সূত্রপাতেই নিজের মনকে দৃঢ় করিবার জন্য মনে মনে ভুল-ভাঙার কবিতা "ভুল" লিখিয়া ফেলিলাম—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে:

ভেবেছিলাম অজগরের মাথার মণি গেছে খ'সে,
তরঙ্গিণী হারিয়েছে তার বেগ;
ভেবেছিলাম চপল মন কঠিন হ'ল আপন দোষে,
পাষাণ সয় হ'ল নিরুদ্বেগ!
যে ক্ষুরধার অস্ত্রখানি আঘাত 'পরে আঘাত হানি'
আমার হাতে ধরিয়াছিল শোভা,
সহসা কবে কাহার শাপে অসিবিহীন হস্ত কাঁপে
বাচাল যেন চকিতে হ'ল বোবা।
আকাশ ভুবন করিয়া কালো মুহুর্মুহু গর্জ্জি রোষে
নিমেষে যেন উড়িল কালো মেঘ।
ভেবেছিলাম অজগরের মাথার মণি গেছে খ'সে
তরঙ্গিণী হারিয়েছে তার বেগ।

*　　　*　　　*

আবার কেন নূতন ক'রে প্রবল হাওয়া লাগিল পালে,
তরণী মোর হয়েছে বানচাল।
আবার কেন আশার ভাতি দিতেছে দেখা শুষ্ক ভালে
পড়ে না মনে হ'ল অনেক কাল।
তখন ছিল অনেক আশা—মনের মতই ছিল ভাষা,
ছিল অনেক খ্যাতি-যশের লোভ;

ঘনায়ে পুন আসিল মেঘ, হারিয়েছিল যে স্রোতোবেগ—
ফিরিয়া পেনু তবুও জাগে ক্ষোভ!
বিবাগী মন তবুও বলে, কাটিয়া এলে যে মায়াজালে
তারে ল'য়ে না বাড়ায়ো জঞ্জাল।
আবার কেন নূতন ক'রে প্রবল হাওয়া লাগিল পালে,
তরণী মোর হয়েছে বানচাল।

মধ্যদিনের প্রখর রবি অস্তাচলে পড়িছে ঢলি'
রৌদ্র মিলায় বেলা বহিয়া যায়—
যে পথ দিয়া একেলা আমি সঙ্গিহীন আসিনু চলি'
সে পথখানি ভরিল ইশারায়।
পুরানো মালা শুকায়ে গলে নবীন হ'ল চোখের জলে,
হারায়ে বাস সুবাস দেয় ফুল—
লেখনী পুন লইনু তুলি, ধূলিরে আর মানি না ধূলি,
থাক্ যতদিন থাকে মনের ভুল।
ঝরিয়া-পড়া ফুলের মনে ভাবনা, কবে আসিবে অলি,
শবের ছাতি ফাটিছে পিপাসায়—
মধ্যদিনের প্রখর রবি অস্তাচলে পড়িছে ঢলি'
রৌদ্র মিলায় বেলা বহিয়া যায়।

লেখনীর অব্যাহত শক্তিতে অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎঝলক খেলিয়া গেল, মনে আশার সঞ্চার হইল। ব্যাকুল-আগ্রহে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পথ চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতে লাগিলেন কথায়—আমার সহকর্মী শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং কাজে বন্ধুবর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেশম-পোকা গুটি কাটিতে কাটিতে সম্পূর্ণ নূতন আকাশ-বাতাসের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়

মোক্ষারম্ভ

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অশোক চট্টোপাধ্যায় বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন পুরা দেড় বৎসরেরও অধিক কাল পরে—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। 'প্রবাসী'র রাজত্ব তখন সম্পূর্ণ জ্যেষ্ঠের করায়ত্ত, কনিষ্ঠ আর আসর জমাইতে পারিলেন না। সুতরাং অবস্থা-পরিবর্তনের যে আশাজড়িত প্রতীক্ষায় ছিলাম তাহা সফল হইল না, কিঞ্চিদূর্ধ্ব ছয় বৎসরের আশ্রয় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কলেজ-জীবন অকালে খণ্ডিত হওয়া অবধি এতাবৎকাল 'প্রবাসী'-'শনিবারের চিঠি'র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলাম, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁহার সরস মধুর সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বাংলা-সাহিত্যাকাশের বৃহত্তর বিস্তারে পক্ষ মেলিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সার্ আশুতোষ-পরিবারের "বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য"র লেখকরূপে, 'আত্মশক্তি'র বেনামী সমালোচকরূপে, 'বনে-জঙ্গলে'র গুপ্ত লেখকরূপে এবং 'যুগবাণী'র কর্ণধাররূপে তখন যথেষ্ট আত্ম-প্রত্যয় অর্জন করিয়াছি; 'ভারতী'র ভাঙা দল ও 'কল্লোল'-'কালি-কলমে'র দলেরও কাহারও কাহারও সঙ্গে হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে পূর্বের দলীয়তার গণ্ডীও ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে, অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত-নিরপেক্ষভাবেও যে 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশ করিতে পারি—এ বিশ্বাসও মনে জন্মিয়াছে।

বলি-বলি করিয়াও ক্ষুদ্রদাকে নানা কারণে মনের কথা খুলিয়া বলিতে দেরি হইতে লাগিল। অপ্রীতিকর আবহাওয়ার মধ্যে তিনি নিজেই তখন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণের জন্য তিনিও যে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেছিলেন, সে আভাসও পাইতেছিলাম। সুতরাং তাঁহার পরামর্শ চাহিয়া তাঁহাকে বিপন্ন ও

ব্যথিত করা নিরর্থক বোধ করিলাম। মোহিতলাল দূরে থাকিলেও বরাবরই আমার শুভানুধ্যায়ী, মুরুব্বি বলিলেও চলে। সমস্ত খুলিয়া লিখিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলাম। তিনি অত্যন্ত সাবধানী লোক, অনেক বুঝাইয়া, যুক্তি দিয়া আরও কিছুকাল ধৈর্য ধরিতে বলিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র লেখক ও শুভানুধ্যায়ী আরও যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। মাহিগঞ্জ, রংপুর হইতে বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ মৈত্র একটা শক্ত সমস্যার কথা তুলিলেন :

> শেষে একটা problem-[সমস্যা]-এর কথা বলি—হয় 'শনিবারের চিঠি'র সব্যসাচী সজনী দাস সত্য—অথবা 'অজয়ে'র গ্রন্থকার সজনী দাস সত্য। একটা সত্য হ'লে আর একটা অভিনয়। কোন্‌টা সত্য জানি নে। ভিতরে যদি আগুন থাকে তবে শুকনো পাতা চেপে তাকে নেবাতে যাওয়া বৃথা।

এই ইঙ্গিতমাত্র করিয়া রবি প্রশ্ন করিলেন, এইবার তুমি কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে চাও? আমি সহসা এই কঠিন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে পারিলাম না, কারণ আমার নিজের মনের মধ্যেও নিজের সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। 'অজয়' রচনা করিবার কালে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, কয়েক বৎসর পরে 'রাজহংসে'র কবিতাগুলি লিখিতে লিখিতে তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে; কিন্তু মধ্যবর্তী কালে প্রচুর দ্বিধা ও সংশয় ছিল যাহার পরিচয় আমার এইকালে রচিত "ব্যর্থতা" কবিতার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। 'অজয়' যে-কবির জীবন-কাব্য, এই কবিতা তাহারই রচিত। কলহ-কোলাহল নিন্দা-প্রশংসা ব্যঙ্গ-পরিহাস কোন কিছুরই ভক্ত বা দাস সে নয়, তাহার সাধনা যেমন সহজ তেমনই কঠিন। তাহার প্রশ্ন শুধু :

> বাধা কখন ঘুচবে সখী, আঁধার কবে হইবে আলো—
> প্রদীপ-আলোয় দেখব কবে, কে তুমি এই প্রদীপ জ্বালো!

রবির সন্দেহ খুবই সমীচীন ছিল, এই কবির সহিত 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তের যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ ছিল না। তাই ছন্দোবদ্ধ পত্রে রবিকে ইঙ্গিতেই জবাব দিলাম :

জীবন-প্রভাতে দীপ্ত অরুণালোকে
অনেক আশায় তরণী ভাসানু জলে,—
উচ্ছ্বাস ছিল অধীরতা ছিল মনে,
শুনেছিনু সুর নদীজল-কলকলে।
কে অজানা দূর পার হতে দিল ডাক,
ভাবিনু 'মিথ্যা' পিছনে পড়িয়া থাক্,
চলার আবেগে তরণী দিলাম খুলি'
দৃপ্ত প্রভাতে নবযৌবন-বলে ;
পার হব—কোথা পার নাহি থাক্ জানা,
না হয় জুটিব দিক্‌হারাদের দলে।

নদীতে তখন ছিল না তো খরবেগ,
মনের কোণেতে ছিল না শঙ্কা-ভয় ;
গগনের বুকে ছিল না মেঘের রেখা,—
পূর্ব আকাশে সূর্য জ্যোতির্ময়।
অনুকূল বায়ে দিলাম তুলিয়া পাল,
অনেক আশায় ধরিয়া বসিনু হাল,
ছুটিল তরণী উচ্ছল কলরবে—
কূল মিলিবার না রহিল সংশয় ;
পৌঁছিনু কত নিত্য নূতন দেশে,
কত অজানার লভিলাম পরিচয়।

স্রোতের আঘাতে চলিতেছিলাম সুখে,
পথ-সম্ভারে ভরিল তরণীখান,
সুদূর হইতে তখনো শুনিনু কানে
সাগর-পারের আশা-ভরা আহ্বান—

"এস হে যাত্রী, এখানে পথের শেষ,
সকল খোঁজার হেথা পাবে উদ্দেশ,
এস এস এই চির আলোকের দেশে"—
হৃদয়ে জাগিল আলোকের জয়গান;
তরতর করি চলিল তরণী মোর,
মধ্যগগনে সূর্য জ্যোতিষ্মান।

জানি না কখন গগনে উদিল মেঘ,
উত্তাল নদী বহে বেগে ক্ষুর-ধার,
প্রবল ঝঞ্ঝা গর্জি' আসিল ছুটি'—
নদী আর কূল আঁধারেতে একাকার।
ব্যাকুল হইয়া তুফানের আগে লড়ি,
ছিঁড়ে গেল পাল ছিঁড়ে গেল দড়াদড়ি,
অন্ধকারেতে না পাই পথের দিশা—
দূর আহ্বান পশে না শ্রবণে আর—
কোথায় চলেছি কিছু নাহি মোর জানা,
ব্যাকুল বক্ষে উঠিতেছে হাহাকার।

পথ-সঞ্চয় ফেলিলাম নদীবুকে—
ব্যর্থ ভারেতে তরণী ডুবিবে কি রে?
কখনো অগাধ জলে করে টলমল,
কখনো সবেগে আঘাত হানিছে তীরে।
বেলা কত হ'ল—শেষ কিবা দিনমান,
কোন্ পথে যাই মিলে না সে সন্ধান,
ব'সে আছি শুধু ভাঙা হালখানি ধরি'
গভীর নিরাশা বক্ষ ফেলেছে ঘিরে;
বিদ্যুৎ শুধু রহি রহি চমকায়
দীপ্ত কুঠারে তিমির-বক্ষ চিরে।

ভাঙিল কি তরী, ডুবিবে কি তরীখান,
আরো কত দূরে যাত্রা-পথের শেষ?

কিছু নাহি জানি, পথ-হারানোর দুখে
ভুলিব কি আমি বৃথা-যাত্রার ক্লেশ!
প্রভাত-স্বপন মনে নাহি আর লিখা,
শুধু চোখে জাগে ব্যর্থতা-বিভীষিকা,
কোন্ পথে মোর মিলিবে সাগর-কূল—
আজি কোথা হায় মিলিবে সে উদ্দেশ;
নাহি আর মনে যৌবন-অধীরতা,
পথ চলিবার নাহি আর সে আবেশ।

যাত্রা আমার ব্যর্থ হয়েছে ওঁরে,
হতাশা আমার চিত্ত ভরেছে হায়;
কেটেছে তুফান অসীম সাগর-মাঝে—
আলো নাহি হেরি কোনো দূর কিনারায়;
স্তব্ধ সাগরে ক্ষীণ তরঙ্গ জাগে,
দূরের রাগিণী কানে আর নাহি লাগে,
ডুবিব কখন তাহার আশায় আছি—
ভাঙা হালে তরী বহা যে বিষম দায়;
কূলে ভিড়িবার নাহি আর মোর আশা,
তল মিলিবার রয়েছি অপেক্ষায়।

"ব্যর্থতা" নাম লইয়া এই পত্রই আমার 'আলো-আঁধারি'তে স্থান পাইয়াছে। রবি স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গীতে জবাব দিলেন, কুছ পরোয়া নেহি, আগে বাঢ়্ হ।

সুতরাং আগে বাড়াই স্থির করিলাম।

ইতিমধ্যে আরও একটা বিভ্রাটের সম্মুখীন হইতে হইল। ঘোষ লেনের বাস আর না উঠাইলেই নয়, পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেখানে আর কিছুতেই কুলাইতেছে না। প্রবাসী প্রেসের হেড কম্পোজিটর মানিকচন্দ্র দাস গোড়া হইতেই অর্থাৎ আমার একক ঘোষ লেনে বাসের সময় হইতেই সপরিবারে আমাদের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, সরস্বতী নামা এক বৃদ্ধা একচক্ষু দাসী আমাদেরই

উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। 'মহাকালে' "রাহু-ভারত" মহাকাব্যের প্রথম কিস্তি প্রকাশ করিয়া সদ্য-পণ্ডিচেরী-ফেরত বারীনদা একদিন উপযাচক ভাবে আমার ঘোষ লেনের বাড়িতে মধ্যাহ্ন-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া শ্রীমান রঞ্জনকে "প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌" আখ্যা দিয়াছিলেন; প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আর কোনও দাবি না থাকুক, একসঙ্গে মানিকবাবুর ও সরস্বতীর পূর্ণ সেবা গ্রহণের প্রবল দাবি ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দুইজনই তাহাকে মানুষ করিতেছিলেন, কাজেই স্থানাভাবের অজুহাতে কাহাকেও ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। বাড়ি ও বাসস্থান বিষয়ে যোগানন্দদা আমার চিরদিনের মুরুব্বি। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের চারতলা বাড়িখানি তিনিই সন্ধান এবং সংগ্রহ করিয়া দিলেন, মাসিক ভাড়া আশি টাকা। একতলায় আমার বৈঠকখানা ও মানিকবাবুদের বাস নির্ধারিত হইল, দ্বিতলে আমার লাইব্রেরি (আমার সঞ্চয় ও সংগ্রহ-দক্ষতায় তখনই বিপুলায়তন), শয়নঘর ও রান্নাঘর, ত্রিতলে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রাচী' মাসিক পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মনোরঞ্জন চৌধুরী সপরিবারে (তাঁহার গৃহিণী ইন্দু দেবীও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী) অধিষ্ঠিত হইলেন, বিখ্যাত "কাজল-কালি"র শ্রীহিতেন্দ্র নন্দী হইলেন তাঁহাদেরই স্বয়ং-ব্যয়বাহী অতিথি; চারতলার একখানি ঘর কিছুদিন খালি ছিল, পরে "বিশাল ভারত হিন্দী পুস্তকালয়ে"র মালিক শ্রীঅযোধ্যা সিং সপরিবারে তাহা অধিকার করিলেন। শহরের প্রায় উপান্তে বহু বিচিত্রের সম্মিলনে আমরা প্রায় এক-পরিবারভুক্ত হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে লাগিলাম।

অদলবদলের হাঙ্গামাকে বিভ্রাট বলিলাম বটে, কিন্তু আসলে এই বাড়িতেই কল্যাণ নানা মূর্তিতে আমাকে দেখা দিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ণ ঘোষ লেনের বদ্ধ ঘিঞ্জি আবহাওয়া হইতে সহসা উদার

উন্মুক্ততার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম। বাড়ির পূর্বভাগেই বৃহৎ বৃহৎ কাঠের গোলা, তাহার পরেই খাল। সকাল-সন্ধ্যা সুন্দরবন হইতে সুঁদরিকাঠ-বোঝাই নৌকা আসিয়া আমাদের খালঘাটে লাগে, একটা তীব্র অথচ মিষ্ট গন্ধ পাই, অজ্ঞাত অপরিচিত হিংস্র-শার্দুল-সর্প-সমাকুল অরণ্যের আভাস মনের পটে ভাসিয়া উঠে। সুঁদরিকাঠ-ধোওয়া রাঙা জলে মনও রঙিন হইয়া উঠে, শহরের মধ্যে থাকিয়া শহরের ক্ষুদ্রতা-সঙ্কীর্ণতাকে ফাঁকি দেওয়ার উল্লাস মনে জাগে। কলিকাতার পাষাণ-কারাগারে বন্দী হইয়া প্রায় এক যুগ পরে বিস্মৃত পল্লীপ্রকৃতির মধুর স্পর্শ গায়ে আসিয়া লাগে।

প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ পাই। কন্যা উমা তখন সবে হামাগুড়ি ছাড়িয়া হাঁটি-হাঁটি পা-পা শুরু করিয়াছে, মানিকবাবু-সরস্বতীর স্নেহসম্বর্ধনা-লালিত খোকনের তুলনায় উমার অবস্থা ছিল প্রায় ঘুঁটেকুড়ানীর কন্যার সামিল, অবহেলার মধ্যেই সে মানুষ হইতেছিল; গুট্‌গুট্ করিয়া কোনরকমে সকলের অজ্ঞাতসারে চৌকাঠ ডিঙাইয়া অন্ধগলিতে গিয়া পড়ে, খানিকক্ষণ পরে খোঁজ্ খোঁজ্ সাড়া পড়িয়া যায়। কল্যাণের দক্ষিণহস্ত প্রথম তাহারই দিকে প্রসারিত হয়।

আমাদের লাইনে গলিতে তিনখানি মাত্র বাড়ি—৫এ, ৫বি ও আমাদের ৫সি। ৫বি একটি স্কুলবাড়ি। ৫এতে থাকিতেন নাটোরের ভাগিনেয় ও ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জামাতা ব্রজেন্দ্র-বাবু—বাংলা দেশের ডবল আভিজাত্যের অনুগ্রহপুষ্ট হালি নবাবির শেষ নিদর্শন সম্ভবত। দিনের আলোর সঙ্গে চিরন্তন বিবাদ বংশপরম্পরায় তিনিও বজায় রাখিয়া চলিতেন, সুতরাং তাঁহাকে কখনও দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। বহু বৎসর পরে তাঁহার পুত্র বিমলাকান্তের বিবাহে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহারই গৃহিণী

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা হেমন্তবালা দেবীই আমার নবভাগ্যোদয়ের শুকতারা।

উমা প্রথম পদক্ষেপের নেশায় টলিতে টলিতে গলির শেষ প্রান্ত অর্থাৎ বড়রাস্তার ধার অবধি চলিয়া যায়, তিনি বারান্দা হইতে তাহাকে লক্ষ্য করেন এবং পরিচারিকা পাঠাইয়া উপরে ধরিয়া লইয়া যান—ইহাই হইল দুই পরিবারের আলাপের সূত্রপাত। অনিচ্ছুক সরস্বতী সুধারাণীর সকাতর অনুরোধে গজগজ করিতে করিতে দুষ্ট মেয়েটাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া সন্ধান লইয়া আসে, মেয়ে জমিদার-গৃহিণীর সহিত বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত, এখন আসিবে না, পরে তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। পরে সে সত্যই আসে একেবারে পুতুল-খেলনার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। সুতরাং জমিদার-গৃহিণীর সহিত মধ্যবর্তিনীর মাতার অর্থাৎ আমার গৃহিণীর পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। এ-পক্ষের মত ও-পক্ষেরও এক পুত্র এক কন্যা, তবে তাহারা বয়সে বড়। ও-পক্ষের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী অচিরাৎ সুধারাণীর ভগ্নী ও সখী-পর্যায়ভুক্ত হইলেন। সেই সুবাদে হেমন্তবালা দেবী হইলেন আমাদের মাসীমা। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইলে আমি তাঁহাকে মা বলিলাম, তিনিও আমাকে চিঠিপত্রে ছেলে সম্বোধন করিলেন। আজ শতাব্দীপাদ ধরিয়া সেই সম্পর্ক বজায় আছে।

গোড়ায় তাঁহাকে একজন স্নেহশীলা প্রতিবেশিনীমাত্র জ্ঞান করিয়াছিলাম; কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে বুঝিতে পারিলাম, সহজ মধুর সম্পর্কও কঠিন বিপদের কারণ হইতে পারে। মাতা হেমন্তবালা ও কন্যা বাসন্তী পরিচারিকাবাহিত চিরকুট মারফৎ আমার জবাব দাবি করিয়া গৃহিণীকে সাহিত্য-বিষয়ক এমন সব প্রশ্ন যখন-তখন করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে, আবার বাড়ি বদল করিব কি না সে ভাবনায়ও পড়িতে হইয়াছিল। ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম, মাতা সাহিত্যের তথা চিন্তারাজ্যের গভীরতম

প্রদেশের অধিবাসী, কন্যা বাসন্তী বাহিরের টুকিটাকি সংবাদ-আহরণে ব্যগ্র। কন্যার প্রশ্নের জবাব দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু মাতার সাহিত্যিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম, তিনি প্রশ্নে প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকেও নিত্যনিয়মিত জর্জরিত করিয়া থাকেন। একান্ত রবীন্দ্র-পরিবেশের বাহিরে রবীন্দ্রনাথের যত ভক্ত দেখিয়াছি, হেমন্ত-বালা দেবীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না। সাহিত্যে তাঁহার শিক্ষা স্বয়ংলব্ধ, রবীন্দ্রনাথের তিনি একলব্য-উপাসিকা। তিনি গোঁড়া অভিজাত ব্রাহ্মণ-পরিবারের নানা দুর্নিবার সংস্কারের অধীন হইয়াও রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও সংস্কারমুক্তির শিক্ষাপ্রভাবে দোটানায় পড়িয়া বিবিধ সংশয়-নিরসনে রবীন্দ্রনাথকে বিব্রত করিয়া তোলেন। বিপন্ন রবীন্দ্রনাথের সংশয়-ছেদন-প্রয়াস ১৩৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'তে "পত্রধারা" শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, মূলপ্রশ্নকারিণীর পত্রগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। হইলে রবীন্দ্রনাথের জবাবের সহিত মিলাইয়া পড়িবার সুযোগ সকলের হইত এবং এই সংশয়লাঞ্ছিত মহিয়সী মহিলার দুরূহ চিন্তাশক্তি এবং তাঁহার সাবলীল প্রকাশক্ষমতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতেন। তাঁহার অনেক রচনা পরে 'শনিবারের চিঠি'তে নামে ও বেনামে প্রকাশিত হইয়াছে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতা অচিরকাল মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার উপাস্য রবীন্দ্রনাথ ও নবলব্ধ পুত্রের মনান্তর দুস্তর হইলেও দুরতিক্রম্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার অপরিসীম ভক্তির কথাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। এই ব্যবধান তাঁহাকে পীড়িত করিত এবং গোপনে গোপনে দেবতার ও ভক্তের পুনঃসংযোগ স্থাপনে তিনিই যে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়াছিলেন তাহা পরে জানিতে পারিয়া-ছিলাম। আমি যখন আঘাতে আঘাতে বীতরাগ রবীন্দ্রনাথকে

সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত মনে করিতেছিলাম, তখনই যে হেমন্তবালা দেবী সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পত্রে আমারই দৈনন্দিন কৃতকর্মের ও পারিবারিক খুঁটিনাটির খবর দিয়া তাঁহাকে আমার প্রতি ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা যখন জানিতে পারিলাম, তখন কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া গেল। তাঁহার সহৃদয় চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, এবং সফলতার দ্বারাই ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে।

নূতন বাড়ির সর্বাধিক কল্যাণ-প্রসূতা প্রকাশ পাইল 'শনিবারের চিঠি'র পুনরাবির্ভাবে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র (২৬ আগস্ট ১৯৩১, বুধবার) আমার ৩১তম জন্মদিনে বন্ধুবান্ধবদের হৈ-হল্লার মধ্যে সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। আমার ডায়ারিতে দেখিতেছি, প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজারের ঘরে সেদিন প্রায় সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন—অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ দাস। ছাপাখানার ছুটির পর ব্রিজখেলার আড্ডা চলিতেছিল। খেলিতে খেলিতেই স্থির হইয়া গেল, 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশিত হইবে এবং এবার নিজস্ব ছাপাখানা হইতে। টাইপ-কেস-র‍্যাক ইত্যাদি খরিদ করিবার জন্য বন্ধুবর রমাপ্রসাদ নয় শত টাকা ঋণ দিবেন ঘোষণা করিলেন।

পরদিন হইতেই তৎপর হইলাম। গৌরীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতায় তখনও পুরাতন আপিসের অর্থাৎ রঞ্জন প্রকাশালয়ের ঠাটটা বজায় ছিল; কিন্তু ছাপাখানা বসাইতে হইলে উপযুক্ত ঘরের প্রয়োজন—তা হউক না আপাতত যন্ত্রহীন ছাপাখানা। কারবালা পুষ্করিণীর ঠিক দক্ষিণে বিডন স্ট্রীটের উপরেই একতলা কতকগুলি দোকানঘর সদ্য নির্মিত হইয়াছিল। সন্ধান লইয়া জানা গেল, সুকিয়া স্ট্রীটের মহেন্দ্র শ্রীমাণি বাড়ির মালিক। তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। পুরাতনপন্থী নিষ্ঠাবান রাসভারী ভদ্রলোক, তাঁহার ফ্রেঞ্চকাট

দাড়িতে একটা আভিজাত্যের প্রকাশ ছিল। তিনি আমাকে নামে চিনিতেন। ব্যবসায় সম্পর্কে বিস্তর সদুপদেশ দিয়া বিডন স্ট্রীটের পাশাপাশি দুইখানি ঘর তিনি আমাকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পহারে ভাড়া দিলেন। অর্থাৎ ছাপাখানার একটা ঠিকানা হইল—৩২।৫।১ বিডন স্ট্রীট। ইহারই একান্ত সংলগ্ন ডাফ হস্টেলেই আমার কলিকাতা-বাসের গোড়াপত্তন। সুতরাং গোড়া হইতেই ছাপাখানা-বাড়ির প্রতি একটা মমতা জন্মিল। রক্ষিত কোম্পানিকে হরফ ইত্যাদি এবং সামন্ত কোম্পানিকে কেস র‍্যাক ইত্যাদির অর্ডার দিয়া লেখা-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম। দূরে যাঁহারা ছিলেন অর্থাৎ মোহিতলাল, সুশীলকুমার, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বনবিহারী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সকলকেই আমাদের সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত করিয়া দীর্ঘ পত্রে, লেখার জন্য আবেদন জানাইলাম। আমাদের সৌভাগ্য, প্রায় সকলেই অচিরাৎ সাড়া দিলেন। কলিকাতা-সফরও নিষ্ফল হইল না, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী "মহাত্মা" নামে একটি চমৎকার কবিতা দিলেন। শত্রুপক্ষীয় ব্রজেন্দ্রনাথও নিরাশ করিলেন না, তিনি পুরাতন 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। কবি কৃষ্ণধন দে একটি কবিতা ও একটি গল্প দিয়া শনিমণ্ডলীভুক্ত হইলেন। সর্বাপেক্ষা অভিভূত করিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত "হিঙ্গলী-দর্শন" নামে একটি অপরূপ অশ্রুসিক্ত ব্যঙ্গরচনা দিয়া—ঠিক এই ধরনের "স্যাটায়ার" বাংলা-ভাষায় সামান্যই রচিত হইয়াছে। মোহিতলাল, সুশীলকুমার ও রবীন্দ্র মৈত্র তো কোমর বাঁধিয়াই আমার মোক্ষসাধনায় সাহায্যার্থ আগাইয়া আসিলেন, হরিপদ রায় ছবির পর ছবি আঁকিতে লাগিলেন, এমন কি উদাসীন যোগানন্দও যোগ দিলেন; গীতাপন্থী "মা ফলেষু কদাচন" অশোক চট্টোপাধ্যায় কবিতার বান ডাকাইয়া দিলেন। মোটের উপর অল্প কয়েক দিনের চেষ্টায় লেখার আয়োজন যাহা হইল, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। আমার স্বাধীনতা-সঙ্কল্পে

সর্বাধিক সমর্থক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র শুধু "হরিকুমারের বাণী" পাঠাইয়াই নিরস্ত হইলেন না, তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি "ত্রিলোচন কবিরাজ"কেও পাঠাইলেন। বস্তুত, এই নবপর্যায় 'শনিবারের চিঠি'কে আত্মনির্ভরশীল ও প্রতিষ্ঠাপন্ন করিবার জন্য তিনিই সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই এক বৎসরেই অপরিমেয় সাহিত্যিক দানে নবজন্মান্তরিত 'শনিবারের চিঠি'কে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন।

লেখা কম্পোজ ও গেলিবদ্ধ হইয়া মানিকতলা স্ট্রীটের একটি যন্ত্রে ফর্মায় ফর্মায় মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং আশ্বিন মাসের পয়লা তারিখেই (২৭ সেপ্টেম্বর) প্রায় দুই বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল নিজস্ব শনিরঞ্জন প্রেস হইতে। আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত ইহা যথারীতি প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে এবং অন্যান্য বহু ব্যাপারে মাথা গলাইতে হইলেও ইহাই এখন পর্যন্ত আমার স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজস্ব ছাপার যন্ত্রও হইয়াছে।

দীর্ঘ দুই-যুগ-কালের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া আমাদের সেদিনের অবস্থার কথা ভাবিবার চেষ্টা করিতেছি। নূতন পরিবেশের একটা খণ্ডিত পরিচয় 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। এ যুগের পাঠককে তদানীন্তন স্থান-কাল-পাত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—'শনিবারের চিঠি'র ইতিহাসে এই নূতন করিয়া পথ চলার মুহূর্তে সম্পাদকের মনের সংশয়-সন্দেহ সাময়িক হইলেও স্থান পাইবার যোগ্য। "সংবাদ-সাহিত্যে"র গোড়াতেই যদিও এই বলিয়া মনকে চোখ ঠারিয়াছিলাম:

> শাস্ত্রমতে ভগবান নিরন্তর ধরাধামে বসবাস করেন না, বা 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষে'র মত বরাবর নির্দিষ্ট তারিখে আবির্ভূত হন না; তিনি

যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। যুগের সঞ্চিত পাপভারে মেদিনী যখন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, মানুষের ন্যায়-অন্যায়-বিচারবোধ রহিত হয়, দুষ্টের অত্যাচারে শিষ্টেরা লাঞ্ছিত হয়, তখনই অবতাররূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়।

পুরা দুই বৎসর পর 'শনিবারের চিঠি'র পুনরাবির্ভাব হইতেছে যুগের প্রয়োজন ঘটিয়াছে বলিয়াই; 'শনিবারের চিঠি' ভগবান নহে, অবতারও নহে; তবে সে বলে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে।'

কিন্তু এই বড়াই সত্ত্বেও যুগের আসল প্রয়োজন যে কি, তাহা লইয়াই ছিল তাহার সংশয় দ্বিধা এবং বেদনা, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত রচনায়:

সমস্ত দ্বিপ্রহর অফিসের খোলা দরজার পথে ঊর্ধ্বে ধূম্রকলঙ্কিত লঘু খণ্ডমেঘাচ্ছাদিত আকাশ এবং নিম্নে ইটকাঠরাবিশ ও পুরাতন লৌহে ভরাট অতীতের কারবালা পুষ্করিণীর বর্তমান অসমতল বীভৎস রূপ ও তাহারই আশেপাশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা এবং নোংরা বস্তির ছাদ দেখিতে দেখিতে মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বন্ধুর ভূমিখণ্ডের মাঝখানটায় পূর্বসমৃদ্ধ জলাশয়ের ভারাক্রান্ত জলাবশেষ যেখানে পঙ্কশয্যায় বাষ্পবুদ্বুদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল—রৌদ্রক্লান্ত মোটবাহী গাড়ির মহিষগুলি দ্বিপ্রহরে আজিও বপ্রক্রীড়ায় যে পঙ্কিল জলভাগকে আলোড়িত করিতে দ্বিধা করে নাই—তাহাও এখন আর দেখা যায় না, জমির মালিক সম্মুখে ঘর তুলিয়া সে আরামটুকুকেও অন্তরাল করিয়া দিয়াছে। সম্মুখের বস্তির মেথরদের অপোগণ্ড শিশুরা বহু কষ্টে সংগৃহীত অর্থে ক্রীত বিয়ারের বোতল লইয়া ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে এখন আর প্রত্যেকে এক-একটি ছোট্ট মাটির খুরি ও ঘুগনির চাট লইয়া মৌতাত করিতে বসে না, চারিদিকে প্রাচীর উঠিয়াছে, তাহারা হয়তো দেওয়ালের ওপারেই রোজকার মত মৌজ সারিয়া লইয়াছে। বিশ্বকর্মাপূজা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ ঘুড়ি উড়াইয়াও কেহ চোখের অবকাশ সৃষ্টি করে নাই। একটা এরোপ্লেন ও একটা দিকভ্রষ্ট মাতাল ফানুষ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। আজিকার খোরাক সেইটুকুই।

পাশের কামরার দপ্তরীরা আমার অফিসঘরের সম্মুখের খোলা মেটে বারান্দায় তাহাদের উদ্বৃত্ত দুইখানা চৌকি ফেলিয়া রাখিয়াছিল তাহারই একটাতে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম, ধোঁয়াটে নীল আকাশে কেমন করিয়া আসন্ন শীতের কুয়াশায় ম্লান কালো অন্ধকার নামিয়া আসে। মাথাটা একটু ধরিয়াছিল। পূর্বদিগন্তের পটভূমিতে টালিছাদওয়ালা তেতলা বাড়ি এবং আমার অতি প্রিয় নিষ্পত্র অষ্টাবক্র বৃক্ষপঞ্জরটিও যখন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন পশ্চিমদিগন্তে মুখ ফিরাইলাম। ধোঁয়া আর অন্ধকারের পীড়নে পশ্চিমাকাশের রঙের শেষ আমেজটুকুও মিলাইয়া আসিতেছিল; ভূতপূর্ব ডাফ হোস্টেলের বিপুলায়তন কোণাটা খাড়া পাহাড়ের মত চোখের সামনে ধীরে ধীরে কালো হইয়া রেখামাত্রে পর্যবসিত হইয়া গেল। বসিয়া বসিয়া দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা মাথায় ভিড় করিয়া চোখের পাতাকেও ভারী করিয়া তুলিতে লাগিল—ভাগ্যে বিদেশী [বেয়ারা] তখন তোলা উনুনটায় কয়লা দিয়া আগুন ধরাইয়াছে—ধোঁয়ার বন্যাস্রোত আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে আমার মাথাটা একটু হালকা হইল। ভাবনার তবু বিরাম নাই। ভাবিতে লাগিলাম—রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স তো ফাঁসিয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিতেছেন। আবার আইন অমান্য শুরু হইবে; খবরের কাগজগুলা পড়িয়া মনে হয়—নেতারা জনসাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য কেহই বাহিরে থাকিবেন না। যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে বিদ্রোহী আয়র্লণ্ডকে শাসন করিয়াছেন* বাংলা দেশের ভাগ্যে তিনিই আসিলেন গবর্নর হইয়া! এমনিতেই তো বেকার বাঙালী যুবকের ভাবনার অন্ত নাই—অর্ডিনান্স-প্রপীড়িত দেশে তাহারা কি নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে? ভাবিতে ভাবিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্গতির কথা, সাহিত্য বেচিয়া এই দুর্দিনে অন্নসংস্থানের কথাও মনে হইল। হাসিয়া, দাঁত দেখাইয়া, মুখ ভ্যাংচাইয়া, সমালোচকের চাবুক হাতে রসসৃষ্টি ও রসভঙ্গ করিবার সময় আর থাকিবে না—'শনিবারের চিঠি'কে হয়তো ভিন্ন মূর্তি ধরিতে হইবে—

* সার্ জন অ্যাণ্ডারসন।

তা ছাড়া কাগজ কিনিয়া পড়িবে কে? ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনা-সমুদ্রে কোনই কূল-কিনারা দেখিলাম না।

এই সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথে নূতন যাত্রারম্ভ, অধীনতাপাশ তখনও ছিন্ন হয় নাই; কিন্তু শৃঙ্খলভঙ্গ-প্রয়াসের বেদনায় আমার সমস্ত সত্তা কম্পিত মথিত হইতেছিল, 'শনিবারের চিঠি'র মলাটে মুরগির বদলে আমি রক্তজবার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমার সে স্বপ্ন সফল হয় নাই—অনেক পরিবর্তন, অনেক বিপর্যয় সত্ত্বেও মুরগি মুরগিই রহিয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

৭ই অক্টোবর

নবপর্যায় 'শনিবারের চিঠি' প্রথম সংখ্যা এক হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল। দুই বৎসর পূর্বে হঠাৎ বন্ধ হইবার কালে যে সকল গ্রাহকের চাঁদা সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই, সর্বাগ্রে পুরাতন ঠিকানাতেই তাঁহাদের কাগজ পাঠাইলাম, সংখ্যায় অবশ্য তাঁহারা মুষ্টিমেয় ছিলেন। বাকি কপি সপ্তাহকাল মধ্যে নিঃশেষে নগদ দামে (প্রতি সংখ্যা ।॰) বিকাইয়া গেল। এই অভূতপূর্ব চাহিদার দুইটি মাত্র প্রত্যক্ষ কারণ ছিল—কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "হিজলী-দর্শন" এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "ত্রিলোচন কবিরাজ"। অনুমান করি, "হিজলী-দর্শনে"র গৌরবভাগই অধিক। সরকারী দমননীতি তখন প্রবলতম আকার ধারণ করিয়াছিল, কাহারও বেফাঁস কিছু বলিবার বা লিখিবার উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর (১৯৩১) রাত্রে হিজলী-বন্দীনিবাসে কয়েকজন "অশান্ত" রাজনৈতিক কয়েদীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য গুলি পর্যন্ত চলিয়া গেল। অসহায় বন্দীরা তদানীন্তন লাটসাহেবের নিকট প্রতিকারের আবেদন মাত্র এই ভাবে করিতে পাইলেন—"বন্দীদের ব্যারাকের মধ্যে শোবার ঘরে, খাবার ঘরে ও হাসপাতালে গুলিবর্ষণ করা হইয়াছিল। তাহার ফলে দুইজন বন্দীর মৃত্যু হয় এবং বিশজন আহত হয়। বিনা কারণে পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া এবং অন্যায়রূপে এই গুলিবর্ষণ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক এবং কল্পিত কথায় পরিপূর্ণ। এই ঘটনার তদন্তের জন্য বে-সরকারী কমিটী নিযুক্ত হইলে বন্দীরা তাহার সম্মুখে উক্ত বিবরণ যে মিথ্যা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারিবে।" মহাত্মা গান্ধী তখন রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স উপলক্ষে বিলাতে। এত বড় সরকারী অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা

বলিবার উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতা কেহ ছিলেন না। দীর্ঘ বারো বৎসর (১৯১৯-৩১) অর্থাৎ জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের পরে পুনরায় ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় দেশ, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মুখাপেক্ষী হইল হৃদয়-জ্বালা প্রশমনের আশায়। রবীন্দ্রনাথ সেই ২৫ বৈশাখে সত্তর অতিক্রম করিয়াছেন। ৩০ ভাদ্র হিজলীতে ওই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিল। নিরুপায় দেশবাসী অসুস্থ ও অক্ষম কবিকেই কলিকাতার গড়ের মাঠে* উপস্থিত করিলে তিনি বলিলেন, "এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তি-জনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।" আরও অনেক মর্মান্তিক কথা রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলিয়াছিলেন, এবং প্রকৃতপক্ষে সেই দিনই ভারতে ব্রিটিশ-শাসন-অবসানের ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ঘটনার স্মৃতিকে বাংলা-সাহিত্যে তিনি অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সুবিখ্যাত "প্রশ্ন" কবিতার মধ্যে; রাজনীতি এইখানে সাহিত্যের নিকট চিরঋণী হইয়া আছে। কবির এই চিরন্তন প্রশ্নের শেষ জবাব ভগবান কখনও দিবেন কি না জানি না, কিন্তু রাজনীতি এখনও দিতে পারে নাই।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।

—হিজলী-বন্দীশালার বীভৎস নিশীথ অত্যাচার-কাহিনীর ইহাই সাহিত্যিক রূপ, চিরন্তন এবং শাশ্বত—করুণা ও বেদনা-মণ্ডিত রূপ। কিন্তু এই ঘটনারই যে ব্যঙ্গমণ্ডিত দ্বিতীয় রূপ হইতে পারে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে কবি যতীন্দ্রনাথের "হিজলী-দর্শনে"।

* ২৬ সেপ্টেম্বর মনুমেণ্টের পাদদেশে লক্ষাধিক লোকের সভায় কবি সভাপতিত্ব করেন।

ইহাও রাজনীতিক্ষেত্রে সাহিত্যিকের চিরন্তন দান। এই দানের আরম্ভটা এইরূপ :

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১) রাত্রিকালে মেদিনীপুর জেলার হিজলীক্ষেত্রে তত্রত্য বন্দীফৌজের সহিত আমাদের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের যে ভীষণ্ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের গবর্নমেণ্টই জয়লাভ করিয়াছেন। বিপক্ষ পক্ষে ২ জন হত ও ২০ জন আহত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের গবর্নমেণ্ট পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল যুদ্ধের পূর্বে ভারপ্রাপ্ত সহকারী সেনাপতি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিপক্ষ বন্দীফৌজের সকলেই armed অর্থাৎ হস্তযুক্ত ছিল। তদুপরি তাহাদের মধ্যে অনেকে মশারি টাঙাইবার ভীষণ কাষ্ঠ-শলাকা, ইষ্টকখণ্ড, সোডার বোতল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ-কৌশলও অতি চাতুর্যের সহিত আরব্ধ হইয়াছিল, কারণ তাহারা প্রথমে কোথায় আক্রমণ করিতে যাইতেছিল তাহা আজ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। গবর্নমেণ্ট-সৈন্যবাহিনীর হস্তে বন্দুক ও সঙ্গীন ছাড়া কিছুই ছিল না। তথাপি বিপক্ষ দল যে অল্প সময়ের মধ্যে পরাভূত হইয়াছিল ইহাতে আমাদের গবর্নমেণ্ট-বাহিনীর অদ্ভুত বীরত্ব ও রণচাতুর্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় হইতে বড়লাটের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শেষ এইরূপ :

রাজা কহিলেন, হে অমাত্য! অমাত্য কহিলেন, হে সামন্ত! সামন্ত কহিলেন, হে নগরপাল! নগরপাল কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল! অর্থাৎ রাজা কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল, রাজধর্মের পরমপারদর্শী তুমিই আমার চরমবন্ধু, অতএব তুমি শিষ্ট। আমি তোমায় শেষ পর্যন্ত পালন করিব। দুষ্টের দমনে তুমি আমার চিরসহায় থাকিও, দেখিও, পরম-পবিত্র রাজধর্ম পালন হইতে আমি যেন ভ্রষ্ট না হই।

রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" বিলম্বে মাঘ (১৩৩৮) মাসের 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু সদ্য সদ্য অর্থাৎ ঘটনার দেড় সপ্তাহের মধ্যেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত এই প্রতিবাদের দুঃসাহসিকতায়

দেশের লোক যে আশ্বস্ত ও প্রীত হইয়াছিল, তাহারই প্রমাণ সপ্তাহকালের মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'র নিঃশেষ বিক্রয়ের মধ্যে আছে।

সপ্তাহকালের মধ্যেই নামডাক হইল, প্রত্যহ মনি-অর্ডার-যোগে নূতন গ্রাহকদের চাঁদা আসিতে লাগিল। তখন প্রোপ্রাইটার এবং কুক আমি একা, সুতরাং মনি-অর্ডার কুড়াইতে বেলা দশটা হইতে এগারোটা পর্যন্ত আমাকে বিডন স্ট্রীটের আপিসে হাজিরা দিতে হইত। বেলা এগারোটা নাগাদ প্রবাসী প্রেসে গিয়া ম্যানেজারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতাম, অবশ্য প্রাতে অন্তত তিন ঘণ্টা সেখানে থাকিয়া তবে বিডন স্ট্রীটে যাইতাম। 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশিত না হইলে এই ঘণ্টাখানেকের অনুপস্থিতি কর্তৃপক্ষ সহজেই বরদাস্ত করিতেন, অবশ্য আমার কাছে সরাসরি অনুযোগ তাঁহারা কখনও করেনও নাই। কিন্তু ৭ অক্টোবর তারিখে অনেকগুলি মনি-অর্ডারের ভার পকেটে লইয়া সেই প্রসন্ন শারদ প্রাতে শরতের মেঘের মত হাল্‌কা মন লইয়া বিডন স্ট্রীট হইতে সারকুলার রোড ধরিয়া আসিতেছি, বিপরীতগামী পবিত্রদার (গঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে মুখামুখি হইল। তিনি বিষণ্ণ ম্লান মুখে অনুরোধ করিলেন, আপনি এই সময় বিডন স্ট্রীটে যাইবেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, অ্যাক্‌টিং জেনারেল ম্যানেজার ইহাতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। ক্লান্ত উটের কোমর ভাঙিবার পক্ষে এই সামান্য সংবাদই শেষ খড়গাছার কাজ করিল। ম্যানেজারের গৌরবময় আসনে বসিয়াই একটি সংক্ষিপ্ত পদত্যাগপত্র রচনা করিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ের (তিনি তখনও জেনারেল ম্যানেজার) প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তাঁহার গাড়ির আওয়াজ পাইয়াই বাহিরে গেলাম এবং গাড়ির দরজা খুলিয়া পাদানে দাঁড়াইয়াই তাঁহার হাতে পত্রটি সমর্পণ করিলাম। তিনি এক নজর দেখিয়াই বলিলেন, পাগলামি ক'রো না। চল, ভেতরে চল। শেষ পর্যন্ত

তাঁহার নির্বন্ধাতিশয্যে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটির দরখাস্ত পেশ করিতে হইল এবং তাহা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুরও হইল। খুড়দা একটু ধরা গলায় শেষ এই কথা বলিলেন, যদি সামলাতে না পার এইখানেই ফিরে এসো, আমি থাকলে তোমার জায়গাও থাকবে। আমার শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা তখন তাঁহার কিছুই অবিদিত ছিল না; আমি যে ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতেছি, এই আশঙ্কা তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল। কিন্তু আমি তখনই এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম যে, মরিয়া গেলেও আর ফিরিয়া আসিব না।

বেলা তখন একটা। উপরে সম্পাদকীয় বিভাগে মহাশত্রু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এত বড় গৌরবের সংবাদটা দিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বিদায় লইবার অছিলায় তাঁহার নিকট গিয়া হাসিমুখেই বলিলাম, আপনাদের নিষ্কণ্টক করিয়া আমি বিদায় লইলাম ব্রজেনবাবু। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। হয়তো ভাবিলেন, শত্রুর এ এক নূতন চাল। বিস্মিতও তিনি কম হন নাই। কিন্তু তাঁহাকে অধিকতর গবেষণার অবকাশ না দিয়া যেন বিশ্বজয় করিয়াছি এইভাবে গর্বিত পদক্ষেপে নীচে আসিলাম। বিপদে-আপদে দেখিতাম ও সাহায্য করিতাম বলিয়া ছাপাখানার কর্মচারীরা আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহারা সকলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, অনেকের চোখে স্বতঃ-উৎসারিত জল। আমার চোখও ভারী হইয়া আসিল। কোনও রকমে বিদায় লইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত-চিত্তে বিডন স্ট্রীটের আপিসে আসিয়া বসিলাম। বাড়িতে খাইতে যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। গৃহিণী পুত্র কন্যা ও সরস্বতী সহ সংসার তখন পাঁচজনের, অথচ পনেরো দিনের সংস্থান সঞ্চিত নাই। ঋণ আছে প্রচুর। কোনও দিকে কোনও আশার দীপভাতি দেখিতেছিলাম না। মানিকবাবুকে দিয়া বাড়িতে সংবাদ পাঠাইয়া

পাশের চা-খানা হইতে চা আনাইয়া আপিসের চেয়ারে বসিয়া ভবিষ্যৎ-নির্ধারণের জন্য ভাবিতে লাগিলাম। দ্বিতীয় বা কার্তিক সংখ্যার কপি প্রেসে দিয়াছি, কিন্তু আশ্বিন সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ না হইলে বৎসরের গ্রাহক আর একটিও করা যাইবে না। সুতরাং প্রথমেই কার্তিকের কাজ বন্ধ করিয়া আশ্বিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রণের আদেশ দিলাম। সেই হইল আমার সদ্য-বেকার-জীবনের প্রথম কাজ।

ভাবনা অগ্রসর হইল না। শূন্য উদর এবং পীড়িত মনের সুযোগ লইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে ভর করিলেন। আমার পঙ্ক-পল্বলশায়ী চিত্ত-রাজহংস কেন যে অকস্মাৎ তখনই মানসযাত্রায় উড্ডীন হইল সে রহস্য আজিও ভেদ করিতে পারি নাই; তবে এ কথাও ঠিক যে 'শনিবারের চিঠি'র নবপর্যায়ের মত আমারও কাব্যজীবনের নবপর্যায় আরম্ভ হইল। প্রথমেই লিখিলাম একটি নিছক হাসি ও নির্দোষ ব্যঙ্গের কবিতা "বিবাহের চেয়ে বড়"—একটি ছোট গল্প-কাব্য, যাহার আরম্ভটা এইরূপ :

বাঁধের উপরে আধখানা চাঁদ বিরহীজনের তরে পাতে ফাঁদ
আকাশের নীলে রূপা যে ছোঁয়াল সে জন বুঝিবে ঠিক,
একা ব'সে জলভরা নদীতীরে কেন ভাসি আমি নয়নের নীরে,
কেন এ অভাগা সন্ধ্যা গোঙাল চেয়ে চেয়ে অনিমিখ
আধ-পর্দায় ঘেরা বাতায়নে যেথা ব'সে পুঁটী কড়াকিয়া গনে,
তারি অবসরে ডাঁশা পেয়ারায় কষিয়া বসায় দাঁত।
পুঁটী কে, জান না? বোসেদের খুকী, মাখম-কোমল, প্রস্তর-বুকী—
ভিতরে তাহার শয়তান হায় আমারই ভেঙেছে আঁত।
বয়সেতে কচি তবুও বালিকা নয়নে ছড়ায় বিদ্যুৎ-শিখা,
লাল ফিতা বাঁধা বেণীতে দোদুল কেউটে বেঁধেছে বাসা।
আমি ব'সে থাকি তারি পথ চেয়ে ভাল ক'রে জানে শয়তান মেয়ে
প্রতিদিন মোর ভাঙে যত ভুল বাড়ে তত ভালবাসা।

আমারে দেখিলে হয়ে চঞ্চলা পুঁটী হেঁকে পড়ে "প-এতে র-ফলা,
এ-কার তাহাতে, পিছনে ম-যোগ করিলে কি হয় কহ।"
শুনিয়া যদিবা প্রেম-ইশারায় জানাইতে তারে কিছু প্রাণ চায়,
পুঁটী না তাকায়; হেন দুর-ভোগ ক্রমে হয় দুঃসহ।
ভিজা বরষায় খড়খড়ি-ফাঁকে আঙুলের ডগা দেখায় কাহাকে!
আমি ঠিক জানি কি চাহিয়া পুঁটী ঝুঁকিয়া জানালা-পথে,
"পাস্তা-বরফ, এদিকে এসো না!" মধু ঢালে তার চপল রসনা।
আমিও বরফে ভরি দুই মুঠি লেপি হৃদয়ের ক্ষতে।...

—'কেড্‌স্ ও স্যাণ্ডাল'

আরও একটি রহস্য আমার জীবনে বার বার বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে, অত্যন্ত দুঃসময়ে প্রায় আত্মঘাতী মুহূর্তে ব্যঙ্গ-খাতেই আমার চিত্তবৃত্তির নিকাশ হয়। মায়ের প্রায় মৃত্যুশয্যায় বসিয়া "হসন্ত তরফদারে"র প্রথম খসড়া ফাঁদিয়াছিলাম, আজ ৭ই অক্টোবরে "অন্ন চিন্তার চেয়ে বড়" যখন কিছুই নহে, তখন "বিবাহের চেয়ে বড়" লিখিলাম। কিন্তু হাসি দীর্ঘস্থায়ী হইল না, অপরূপ "মৃত্যু-মাধুরী" সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্ত অধিকার করিল। প্রায় একটানাই লিখিয়া গেলাম:

উঠ হিমাদ্রি-প্রায়,
দুঃখসিন্ধু হের গরজিছে ব্যথাবেদনার লোনাজল উথলায়।
ক্রূর নিপীড়নে কম্পিত আজি ক্ষুব্ধ সাগর-তল,
ধাতব পৃথ্বী বাষ্প-বিকারে মথিছে সিন্ধু-জল।
ওরে লাঞ্ছিত, ভূকম্প-বেগে উৎসারো আপনায়,
অদ্রি সমান লেহিয়া অভ্র উঠ নিজ মহিমায়।
জাগ হিমাচল-প্রায়।

জাগিয়াছে ভূতনাথ।
আগ্নেয়গিরি উন্মাদ যেন দিকে দিগন্তে করে অগ্ন্যুৎপাত।
বিষ্ণুচক্রে হের বরাভয়, বিদরে অন্ধকার,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মাধুরী নেহারো চমৎকার!

বক্ষে বক্ষে দেবী-পাদপীঠ এ নহে অকস্মাৎ,
সতী-শব কাঁধে নটরাজ করে উন্মাদ পদপাত !
ক্ষিপ্ত প্রমথনাথ।

জাগ্‌রে মানুষ জাগ্‌,
দেবী-মন্দিরে শিবা-সারমেয় লেহন করিছে পুণ্য যজ্ঞভাগ !
শকুনি গৃধিনী মন্দিরদ্বারে প্রহরী সেজেছে আজ,
ভক্ত বাহিরে ক্রন্দন করে, ভুলিয়াছে ঘৃণা লাজ ;
দেবীর চরণে মন নাই তার, আপনাতে অনুরাগ,
ভক্ত কি দেহে রক্ত থাকিতে নাশিবারে দেয় যাগ !
ওরে অমানুষ জাগ্‌।

কর, কর সংগ্রাম।
মৃত্যু ক্ষণিক, শাশ্বত জানি মহাকাল-ভালে অগ্নি-আখরে নাম !
কীটপতঙ্গ বাঁচে তারা, আছে বাঁচিবার যত দিন,
মানুষই করিতে পারে জীবনেরে মহৎ অথবা দীন।
জননীর ক্রোড়ে জনমে মানুষ, ধরা তার বিশ্রাম
সেই বীর তারে প্রণমি যাহার মৃত্যুও অভিরাম !
কর, কর, সংগ্রাম।

আলোড়িয়া তোল ঝড়,
যুগে যুগে যত সঞ্চিত মেঘ নিবিড় করিয়া ঢেকেছে নীলাম্বর।
ঝঞ্ঝার বেগে পড় যদি, পড় ধূলায় ভগ্নপাখা,
বীরের ললাটে পঙ্ক-শোণিতে তিলক রহিবে আঁকা।
মৃত্যু-আঁধার আসিবে নামিয়া হয়তো নয়ন 'পর,
তবুও পুলকে দেখিবে হাসিছে নীলাকাশ সুন্দর—
কখন থেমেছে ঝড়।

সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব হইল, অদ্যকার আকস্মিক ঘটনা-জালে জড়াইয়া ডুবিয়া আমি নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলিতেছি। মনকে প্রণিধান করিতে বলিতেছি :

সেই বীর তারে প্রণমি যাহার মৃত্যুও অভিরাম।
কর, কর সংগ্রাম।…
ঝঞ্জার বেগে পড় যদি, পড় ধূলায় ভগ্নপাখা,
বীরের ললাটে পঙ্ক-শোণিতে তিলক রহিবে আঁকা।

লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া আছি, সদর রাস্তা হইতে বারান্দায় উঠিবার সিঁড়িতে ভারী পদক্ষেপের শব্দ পাইলাম। চকিত হইয়া দেখিলাম, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিতেছেন। ডান হাতে গবেষণাভারে স্ফীতোদর পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ। আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে ঠাহর হইল না তাঁহার ওষ্ঠে বা চক্ষে সদ্য-শত্রুবিজয়ের গর্বিত হাসির স্পর্শ ছিল কি না। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠিলাম, বলিলেন, ছাপোষা মানুষ আপনি, এ কি ক'রে বসলেন? অমন চাকরিটা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন? আমি তাঁহার প্রশ্নের জবাব না দিয়া সামনের চেয়ারে তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। আসন গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, এমন যে মানুষ করতে পারে, আমার কিন্তু মশায় বিশ্বাস হয় নি। চিরকাল কেরানীগিরি ক'রে এসেছি, এক চাকরি বজায় রেখে অন্য ভাল চাকরির জন্যে এখানে ওখানে দরখাস্তের পর দরখাস্ত পাঠিয়েছি, চাকরি একটা না পেয়ে কেউ চাকরি ছাড়তে পারে—সে ধারণাই করতে পারি না। তা এখন কি করবেন ঠিক করলেন? আমি মুখে জবাব না দিয়া ললাটে করস্পর্শ করিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ম্যাটার অব ফ্যাক্ট কাঠখোট্টা ব্রজেন্দ্রনাথের অপ্রত্যাশিত আচরণে বিমূঢ় হইলাম। আমার উত্তোলিত হাতখানা সহসা ধরিয়া ফেলিয়া তিনি গাঢ়স্বরে বলিলেন, আমার এমন সঙ্গতি নেই যে, এই বিপদে আপনাকে আর্থিক সাহায্য করি। কিন্তু একটা কাজ আমি পারি সজনীবাবু, আপনাকে আমার সাধ্য ও জ্ঞানবুদ্ধি-মত মাসে মাসে লেখা যোগাতে পারি, বরাবর আমি সেটা ক'রে যাব, আপনি না থামালে আমি

থামব না। আপনার এই দুর্দিনে আমার এই কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

এতক্ষণে আমার চোখ দিয়া সত্য সত্যই জল বাহির হইল, ভারাক্রান্ত মনের সেইটুকু বস্তুগত মুক্তি পাইয়া আমি অনেকটা হালকা হইয়া বাঁচিয়া গেলাম। আমাকে বিস্মিত বিমুগ্ধ করিয়া ভারী ভারী পা ফেলিয়া কাজের লোক ব্রজেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯৩১, ৭ই অক্টোবর হইতে ১৯৫২, ৩রা অক্টোবরে নশ্বর দেহরক্ষা পর্যন্ত—একুশ বৎসরকাল তিনি অযাচিত ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন —পরস্পর মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, কিন্তু লেখা দিয়া সাহায্য করিতে তিনি কখনই বিরত হন নাই।

আলো জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ জনেরা সেই দিনই একে একে আসিয়া জুটিলেন—অশোক চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে, ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়, হরিপদ রায়, রমাপ্রসাদ দাস, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত সরকার। হিমুদা ও যোগানন্দদা কিছুদিন হইতে বিশেষ বিশেষ কারণে গা-ঢাকা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভাব সেই দুর্দিনে খুবই অনুভব করিলাম।

সর্ব বিষয়ে নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত অশোক চট্টোপ্যাধ্যায় সেই দিন সেই পরিবেশের মধ্যে কাগজ টানিয়া লইয়া "প্ল্যানচেটে পাওয়া" কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন, এই ছোট্ট কথাটা আজিও ভুলিতে পারি নাই। বস্তুত তিনি না হইয়া আর কেহ হইলে সেই ধূম্রমলিন হিমেল সন্ধ্যায় সর্বসমক্ষে না হউক, একটু আড়ালে দুই জনে যে দুই মিনিট অন্তত গলা-ধরাধরি করিয়া কাঁদিতাম তাহাতে সংশয় নাই। কাঁদা দূরে থাকুক, প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ করার আনন্দে সকলে পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলাম। মনে হইল, সমগ্র পৃথিবীতে ইহা যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার।

বেকার-জীবনের ক্লান্তি ও গ্লানি সম্পূর্ণ বিডন স্ট্রীটের ক্ষুদ্র ছাপাখানা-ঘরে রাখিয়া অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিলাম, আশ্বস্ত হইয়া অনুভব করিলাম কোনও অনুযোগের বাণী আমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া নাই। অর্ধাঙ্গিনীর সুবিপুল নির্ভর-নিশ্চিন্ততা অনেক কঠিন বিপদ সহজে অতিক্রম করিতে আমার সহায় হইয়াছে।

এই ৭ই অক্টোবর, জন্মদিবস ৯ই ভাদ্রের মতই আমার চিরস্মরণীয়—স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ওই দিন যেন আমি দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেদিনের সাময়িক হঠকারিতা আমাকে যে অজানা অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার ফলে জীবনে অনেক মানসিক দুঃখ ও কায়িক ক্লেশ ভোগ করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু মনের অবাঞ্ছিত পথে আর আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় নাই; ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও আত্মমর্যাদায় আমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ত্রিশঙ্কু

'শনিবারের চিঠি' নবপর্যায় প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। প্রবাসী প্রেস হইতে উহার মুদ্রণ রহিত হওয়াতেও যে তাঁহার ক্রোধশান্তি হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৩৩৮ আশ্বিনের 'স্বদেশে'। দার্জিলিং-গিরিশৃঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কবি নজরুল ইসলামের মুলাকাত হয়। এই সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ হাবিলদার-কবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাটি ছিল :

> কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোন রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেমন চমৎকার ফুলঝুরির মত ফুল সেজে থাকে !···কবি হাসতে হাসতে বললেন, এই রকম আর একটি জীবের নাম করা চলে—দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক ওই কারণে সাহিত্যের আসরে একেবারে একঘরে হয়ে আছে।
>
> আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।

ইতিমধ্যে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিজাত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে'র আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মাসিক 'বিচিত্রা' পুরা চার বৎসর চলিয়াও অভিজাত সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের মোহ কাটাইতে পারে নাই। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'বিচিত্রা'র প্রাপ্তে তু পঞ্চমে বর্ষে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় রয়াল সাইজের মোটা অ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত অতিকায় অথচ সুদর্শন 'পরিচয়' আত্মপ্রকাশ করিল। "পরিচয়"-শীর্ষক মুখবন্ধে লিখিত হইল :

> সভ্যতার আদবকায়দার কড়াকড়ি সত্ত্বেও মানুষের আদিম পরিচয়স্পৃহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। হঠাৎ সিগারেটের জন্য

দেশলাইয়ের দরকার হয়, পাশের লোকের রিস্টওয়াচ দেখিয়া সময় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে,...সে অপরের সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায়।...দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্য-জগতেই সমধর্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন করে,...আজ মানুষের প্রধান কাজ—ভাষা-সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগসঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণ-চিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।

সম্পাদকের এই বিজাতীয় উপমাকণ্টকিত দম্ভ আমাদের ভাল লাগে নাই। "সঙ্কীর্ণ-চিত্ত" বলিয়া "শনি"র উল্লেখও রাগের কারণ হইতে পারে। হাত নিশপিশ করিতেছিল; কিন্তু উপায় ছিল না, নবপর্যায় 'চিঠি' তখনও জল্পনামাত্র। পুনর্জীবনপ্রাপ্ত 'চিঠি'র প্রথম সংখ্যাতেই (আশ্বিন) কাজেই ডক্টর সুশীলকুমার দের 'পরিচয়'-মারী "পরিচিতি" বাহির হইল। রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদপূত 'পরিচয়'—রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় "নবীন কবি" প্রবন্ধে। 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি ইঙ্গিত করিয়া "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই" কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন, "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিই নি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।"

ইঙ্গিত যে আমরাই গায়ে পাতিয়া লইলাম তাহা নয়, 'মাসিক বসুমতী'তে (ফাল্গুন, ১৩৩৮) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিই নি" উক্তিটির প্রতিবাদে "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই" নামে এক বেনামী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন এবং উক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে "জয়ন্তী-সংখ্যা" 'শনিবারের চিঠি'র মোরগলাঞ্ছিত মলাটটি ছাপিয়া দিয়া রবীন্দ্রনিন্দিত মোরগ যে কে তাহা স্পষ্টভাবে সনাক্ত করিয়া দিলেন। এড়াইবার আর পথ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের এই বিরূপতায় তরুণেরাও নানাভাবে উল্লাস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইহা একান্ত শত্রুর লাঞ্ছনায় সামান্য-

জনোচিত উল্লাস মাত্র, রবীন্দ্রনাথ এক পক্ষকে গালি দিয়া অন্য পক্ষকে তখনও সমর্থন করিলেন না। কার্তিকের 'পরিচয়ে' "পত্রিকা" নামীয় প্রথম প্রবন্ধে লিখিলেন :

> শুনেছি তরুণেরা বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি অনেক নূতন কীর্তি করেছেন ব'লে গৌরব করেন, কিন্তু ভাষায় নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে-উদ্যোগ প্রমথ করেচেন তার চেয়ে ইদানীং আর কী উদ্ভাবিত আমি জানি নে। এটা জানা আছে প্রমথকে বয়স খতিয়ে তরুণ বলবার জো নেই।

স্বয়ং প্রমথনাথও সে যুগের তরুণ-পত্রগুলিকে এক কঠিন মার দিলেন এই 'পরিচয়ে'ই। তিনি লিখিলেন :

> আমি পুরোনো লেখক। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নতুন কাগজ মানে হচ্ছে—সেই কাগজ যার লেখক সব পুরোনো। সুতরাং পুরোনো লেখকেরা যদি না লেখেন, তা হ'লে নতুন কাগজ আর চলে না। এর কারণ তরুণপত্রের প্রধান লক্ষণই এই যে তার অন্তরে প্রেরণা নেই।

আমাদেরও বয়স ছিল কম, রক্ত ছিল গরম। পূর্বের "সজনে ফুল" ও "মুরগী"র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া "সাহিত্যিক মোরগে"র উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত "রবীন্দ্র-জয়ন্তী"কে কেন্দ্র করিয়া। যখন কবির সত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কলিকাতা নাগরিকদের পক্ষে মেয়র ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষে কবি কামিনী রায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু-নামাঙ্কিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত অভিনন্দন পাঠ করিলেন, যাবতীয় সাময়িক পত্র বিশেষ-সংখ্যায় কবিকে সম্মানিত করিলেন, তখনই আমরা "জয়ন্তী-সংখ্যা" (মাঘ ১৩৩৮) প্রকাশ করিয়া ব্যজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রীঅমল

হোম প্রমুখ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছবিকে "ছবিতা" আখ্যা দিয়া যে সচিত্র ব্যঙ্গরচনাটি (আমার রচিত, হেমন্ত-চিত্রিত) আমাদের জয়ন্তী-সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, রবীন্দ্রনাথকে উত্ত্যক্ত ও মর্মাহত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। তদ্ব্যতীত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রেও কম লঘুতা প্রকাশ পাইল না। মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসাপরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল। আমাদের আহত ভক্তি ও অভিমানই যে ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, এই সহজ কথাটা সাধারণ পাঠক তো বুঝিলই না, রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ব্যবধান দুস্তরতর হইয়া উঠিল। এই ব্যাপারে নিতান্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম যে, তখন পর্যন্ত রবীন্দ্র-লাঞ্ছনায় উল্লসিত হয় এমন লোকের সংখ্যা বড় কম নয়।

"সজনে ফুল" ও "মুরগী"র উপমা রবীন্দ্রনাথ ঠিক আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না, আজ আর তাহা হলফ করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে আমাদের মত আরও অনেকের ধারণা হইয়াছিল, আমরাই তাঁহার লক্ষ্য। সুতরাং আমরা মনের সাধেই মনের ঝাল মিটাইয়াছিলাম, গদা ছুঁড়িয়াছিলাম অনেককেই লক্ষ্য করিয়া; কিন্তু কেন্দ্রস্থলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আঘাতটা তাঁহাকেই বাজিয়াছিল সর্বাধিক। আমরাও তখন বেপরোয়া। প্রেস এবং আপিস—উভয় দিক দিয়াই 'প্রবাসী'র সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন আমি, একেবারে 'আউট' বলিলেই চলে। কোনও দিক দিয়া ভয়-ডরের কোনও বালাই নাই, খাপখোলা তলোয়ারের মতই তখন আমি উলঙ্গ, কটু উপমা ও শ্রদ্ধাহীন উক্তি কিছুতেই বাধে নাই। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা কারারুদ্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরে দেশের অতিশয় রাষ্ট্রনৈতিক দুর্দিনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সুতরাং আমাদের বিরোধিতায়

সমর্থকের অভাব হয় নাই। দেশের দুর্দিন এবং দেশের জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ছবির সুযোগ আমরা পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সকল মন্দেরই একটা ভাল দিক থাকে; রবীন্দ্র-জয়ন্তী লইয়া আমাদের ব্যঙ্গও অন্তত একটি সুফল প্রসব করিয়াছিল। সে সুফল একান্ত আমারই ব্যক্তিগত প্রাপ্তি। ব্যঙ্গের পাল্লার পাষাণ ভাঙিবার জন্য জয়ন্তী-সংখ্যার গোড়ায় এবং শেষে দুইটি প্রশস্তি-কবিতা যোজিত হইয়াছিল—গোড়ায় মোহিতলালের "কবি-বরণ" এবং সমাপ্তিতে আমার "রবীন্দ্রনাথ"। সুফল আমার সেই একটিমাত্র কবিতার পরিধিতেই আবদ্ধ থাকে নাই, আমার সমগ্র কাব্যজীবনে তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলে এক পূর্ণিমা-রাত্রে যে ছন্দ আয়ত্ত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস করিয়াছিলাম এবং যাহা তাহার পর দীর্ঘ বারো বৎসরের অবিশ্রান্ত সাধনাতেও ধরা দেয় নাই, অকস্মাৎ অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তে তাহাই আমার লেখনীমুখে ধরা দিল। নূতন অস্ত্র হাতে পাইয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিবারই গোপন বাসনা ছিল। কিন্তু সত্যকার কাব্য হৃদয়াবেগকেই মানে, বুদ্ধিকে নয়। আমার যুক্তিবাদী প্রখর বুদ্ধি হার মানিল। হৃদয়াবেগ-স্পন্দিত ছন্দ নিজেই নিজের পথ করিয়া লইয়া লিখিয়া চলিল:

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র, হস্তী, বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত।
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে—

মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই, তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

এই বিচিত্র ছন্দের নির্মল ধারায় স্নান করিয়া যেন আমি পূত-পবিত্র নবজন্মান্তর লাভ করিলাম; সকল ক্ষোভ, সকল অভিমান, সকল বিদ্বেষ ভাসিয়া গেল, শেষ দুই স্তবক আপনা হইতেই সেই অবগাহনপুণ্যে মধুর হইয়া উঠিল:

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুকেতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সুমুখে আমার সবজির ক্ষেত, তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরনা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে।
কোথা হিমালয় হিমেতে রয়েছে ঢাকা,
পাহাড় গলিয়া নৃত্যচপল এসেছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তারি পানে চেয়ে চেয়ে
ঢেউ গনি আর শুনি কুলুকুলু রব
ভুলি হিমালয়, ভালবাসি নদীটিরে—
তত ভালবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাকো, নদীরে ক'রো না হিম।
আমার কুটীর-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সবজি-ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাকো নাহি থাকো—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো,
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও-নদীজলে—

কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিকথা তার যে পারে রাখুক লিখে।
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

শুভমুহূর্ত মানুষের জীবনে কখন কোন্ দিক দিয়া আসে কেহ বলিতে পারে না। বঙ্গভারতীর বরপুত্রকে নির্মম আঘাত হানিবার জন্য যে ক্ষুরধার অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলাম, স্বয়ং বীণাপাণি সকৌতুকে তাহাতেই তন্ত্রী যোজনা করিয়া বিদ্রোহীকেই সুরের ঝঙ্কার তুলিবার আদেশ ও অবকাশ দিলেন, আমার কাব্য-জীবনের ইহাই বিচিত্রতম ইতিহাস। এই "রবীন্দ্রনাথ" কবিতাতেই আমার পরবর্তী কাব্য 'রাজহংসে'র গোড়াপত্তন।

নবপর্যায়ে যাঁহারা নূতন আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রবন্ধকার ব্রজেন্দ্রনাথ এবং কবি ও কথাশিল্পী কৃষ্ণধন দের উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণব-সাহিত্যের ঘুণ, তিন খণ্ডে প্রকাশিত সুবৃহৎ 'বীরভূম-বিবরণে'র সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও প্রথম সংখ্যা হইতেই বৈষ্ণব সাহিত্যে রায়বাহাদুরী (খগেন্দ্রনাথ মিত্র) মহিমা ফাঁস করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নূতনেরা সকলেই সশরীরে হাজির হইয়াছিলেন। ডাকযোগে অচিরকাল মধ্যে আরও দুইজন বিচিত্র শিল্পীর সমাগম হইল—সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ মনে হইল চিরপরিচিত। মুঙ্গের হইতে কবি ও কথাশিল্পী শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গলা-খাঁকারি দিয়া জানান দিলেন, আমিও আছি হে। পর পর তিনটি উৎকৃষ্ট স্যাটায়ার কবিতা তিনি পাঠাইলেন—কার্তিকের জন্য "বাঙ্গালী চিত্রকরের প্রতি," অগ্রহায়ণের জন্য "বিরহিণীর পত্র" এবং মাঘের জন্য "নৃত্যময়ী"। কোনটিতেই লেখকের নাম ছিল না। পরে তিনি "চন্দ্রহাস" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলি 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিষ্ঠা প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়াছিল। লেখক কে তাহা না

জানিয়াও অনেককে কবিতাগুলির পংক্তিবিশেষ আওড়াইতে শুনিতাম, যেমন :

কত রকমের তনু !
দেখিলে আকুলি মূর্ছা যাইত
মহাসংযমী হনু।
পীন উন্নত আয়ত নিটোল
কম্পাসে আঁকা স্তন গোল গোল,
কাঠির মতন ক্ষীণ কটি যেন
বাঁকা মন্মথ-ধনু !

অথবা "বিরহিণীর পত্রে" :

বিরহে আর কত যুগ রইবে এ বুক
তোমার তরে দিল খুলিয়া ?
শেষে কি পাড়ার লোকে প্রেমের ঝোঁকে
পড়বে ঢুকে পথ ভুলিয়া ?
যদি না এসো ত্বরিত
ঝরিবে চোখের সরিৎ !
এ পাড়ার তরুণগুলো ঝাঁকড়া-চুলো
গাইছে গজল নজরুলিয়া।

এবং "নৃত্যময়ী"র :

বাংলা ভাসিল নৃত্যফেনিল বন্যাতে
নাচে এক সাথে পিসী-মাসী-মাতা-কন্যাতে
—আমি চেয়ে থাকি বোকার মতন শঙ্কিত।

বন্ধুবর শরদিন্দুর কোনও কাব্যগ্রন্থ এতাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। একালের বাঙালী পাঠক-সমাজ তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট কবিতার রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছেন।

নোয়াখালি জেলার ফেণী শহর হইতে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'-সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র ডাকযোগে পাঠাইয়া সাড়া দিলেন

দ্বিতীয় জন—চিত্রশিল্পী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, অধুনা বিখ্যাত পি. সি. এল. বা কাফী খাঁ।

প্রফুল্লচন্দ্র তখন ফেণী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। বন্ধুবর গোপাল হালদারও ফেণীর লোক; তিনিই সর্বপ্রথমে এই অধ্যাপকের কার্টুন-পারদর্শিতার কথা বলিয়াছিলেন। 'শেষ প্রশ্নে'র ছবি চারখানি দেখিয়া এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা ভাবিয়া হৃষ্ট হইলাম। হরিপদ রায়ের মত তখনও তাঁহার রেখাগুলি দৃঢ়তাব্যঞ্জক হইয়া উঠে নাই; কিন্তু দেখিলাম সূক্ষ্ম খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি; উচ্চশিক্ষিত তিনি, বংশগৌরবও যথেষ্ট—ঢাকার সুবিখ্যাত আনন্দচন্দ্র রায়ের সাক্ষাৎ দৌহিত্র, সুতরাং ভাব ও বিষয়-বস্তুও তাঁহার যথেষ্ট অধিগত হইবার কথা। আমি ফেরত ডাকে তাঁহাকে প্রচুর প্রশংসা করিয়া অধ্যাপকপদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে আহ্বান করিলাম; জোরের সঙ্গেই ভরসা দিলাম, কার্টুন-শিল্পকে তিনি ত্যাগ না করিলে উহা তাঁহাকে কখনই বিপদে ফেলিবে না। সাহসী বীরপুরুষ তিনি, আমার ডাকে অবিলম্বে সাড়া দিলেন। কলিকাতার কার্টুন-শিল্পের রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যপরীক্ষায় জয়ী হইয়া তিনি আমার মান বাঁচাইয়াছেন এবং পরবর্তী দীর্ঘকাল বিনা মাহিনায় আপ্‌খোরাকিতে 'শনিবারের চিঠি'র কার্টুন সরবরাহ করিয়া বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বের জন্য আমি আজিও মনে মনে গৌরব বোধ করি।

নবপর্যায়ে প্রথম ছয় মাসের মধ্যে বন্ধুবৎসল সহৃদয় নলিনীকান্ত সরকার লেখকরূপে চিঠির রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। কাজী নজরুল ও দিলীপকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, আবার এই দুইজনই 'চিঠি'র বড় টার্গেট, কাজেই 'শনিবারের চিঠি'র ধর্ম এই হাস্য-ব্যঙ্গরসিকের স্বধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্কোচ ছিল। জয়ন্তী-সংখ্যা উপলক্ষে তিনি আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, একেবারে "জয়-জয়ন্তী" গাহিতে গাহিতে আসরে অবতীর্ণ হইলেন:

যাত্রী মাতিল শুধি প্রাক্তন ঋণ ষ্বত ছুঁড়ি হোমজ ভস্মে,
গাহে সুরঙ্গম-সুরঙ্গমা কত বিচিত্র দীর্ঘে হ্রস্বে।
কত তরুণারুণ-রাগে কলিকাস্ফুট-বর মাগে
লিপ্টত কাগজ তা তা।
জয় জয় জয় হে বগলে-ধৃত-রবি, জয়স্তি-ভাগ্যবিধাতা।

কিন্তু এত তোড়জোড়, এত সমাগম-সমারোহ, এত হৈ-হৈ-কোলাহল কিছুই আমার অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যকে রোধ করিতে পারিল না। রঞ্জন প্রকাশালয়ে বইয়ের সংখ্যা চার হইতে দশ (আমার 'মনোদর্পণ,' 'অঙ্গুষ্ঠ,' 'বঙ্গরণভূমে' ও 'মধু ও হুল'; বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' ও অরবিন্দ দত্তের 'রক্তের টান' এই ছয়খানি নূতন মুদ্রিত) হইল; তথাপি ইংরেজী ভাষানুযায়ী দুই প্রান্তের সংযোগ বিধানে অপারগ হইলাম। অভিমান তখনও প্রবল, প্রবাসী আপিসের লোকেরা আমার পতনে হা-হুতাশ-ছলেও বক্রোক্তি করিবে—এই আশঙ্কায় পূর্বের চাল এক চুল কমাইতে পারিলাম না। প্রবাসী প্রেসের ফোরম্যান ও মুদ্রাকর মানিকচন্দ্র দাস তখনও আমার বাড়ির নিম্নতলার ভাড়াটিয়া; তিনি আমার বিশেষ ভক্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কাছেও মুখোশ পরিয়া থাকিতে লাগিলাম। বীডন স্ট্রীটের ছাপাখানা ও আপিস-বাড়ির ভাড়া মাসে মাসে দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত ফাল্গুনের গোড়াতেই (১৯৩২, ফেব্রুয়ারির শেষ) আপিস ও ছাপাখানা ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটেই স্থানান্তরিত করিতে হইল। লক্ষ্মী যখন বিরূপ হন অলক্ষ্মী তখন নানা ব্যসনের আকারে দেখা দেন, অত্যন্ত সঙ্কটের মুহূর্তে গুরুতর ভ্রান্তির আকারেও তিনি দেখা দিয়া থাকেন। আমারও তাহাই ঘটিল, পদে পদে ভুল করিতে লাগিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি, ডি. এম. লাইব্রেরি ও শ্রীগুরু লাইব্রেরিকে অত্যধিক কমিশনে রঞ্জন প্রকাশালয়ের বই বেচিয়া যাহা পাইতাম তাহাও চক্ষের পলক

ফেলিতে না ফেলিতে ফুঁকিয়া যাইত। সংসারের দৈনন্দিন খরচ ছাড়া, 'শনিবারের চিঠি'র কাগজের দাম ও ফর্মা ছাপার খরচ নগদা-নগদি দিতে হইত। এমন দিন আসিল যখন আর কিছুতেই চলে না, শতচ্ছিদ্র তরণী ডোবে ডোবে—কাহাকেও কিছু বলিতে বাধে, এমন কি গৃহিণীকেও। মরিব তবু প্রবাসীওয়ালাদের কাছে প্রেস্টিজ হারাইব না—নির্বোধের ইহাই হইল পণ।

রাজা (তখন কুমার) ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহিত সে সময়ে গাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক; তাঁহার অহেতুক ভালবাসায় আমি সেদিন হইতে আজও পর্যন্ত ধন্য হইয়া আছি। তাঁহার কাছে শুধু মুখের কথা খসাইলেই মায়ামন্ত্রে আমার সকল সমস্যার নিরসন হইবে, ইহা জানিয়াও আমি নীরব থাকিতাম; অথচ কাব্য-সাহিত্যচর্চার ছলে তাঁহার গ্রেট ইণ্ডিয়ান ও পরে ক্যালকাটা হোটেলের আড্ডায় সদলবলে নিয়মিত হাজিরা দিতাম। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বশে তিনি প্রায়ই আমার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইয়া নানা প্রশ্ন করিতেন, আমি কৌশলে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতাম। আমার মনের অবস্থা তখন সত্য-সত্যই রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কারে"র কবির মতন:

কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর।
থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী,
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা।

বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ধীরেন্দ্রনারায়ণ আমাকে একটি সুবৃহৎ রূপার গড়গড়া উপহার দিয়াছিলেন, উপযুক্ত নল লাগাইবার সামর্থ্য ছিল না, একটা সস্তা রবারের নল কোনও রকমে সংগ্রহ করিয়া

প্রহরে প্রহরে নিজেই তামাক সাজিয়া চক্ষু বুজিয়া টানিতে টানিতে আর্থিক গোলোক-ধাঁধা হইতে বাহির হইবার উপায় খুঁজিতাম। ঠিক এই সময়ে এই অবস্থায় তারাশঙ্করের কাছে ধরা পড়িয়াছিলাম। 'আমার সাহিত্য-জীবনে' তিনি সে কাহিনী এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

> "এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র দুরন্ত প্রতাপ। সাহিত্যিক মজলিশ বসলেই 'শনিবারের চিঠি'র কথা ওঠে। গালাগালির অন্ত থাকে না; যাঁরা গাল খেয়েছেন তাঁরা জ্বলেন। যাঁরা খান নি তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগা মনে করেন। আমি অবশ্য একবার গাল তখন খেয়েছি। কিন্তু তবুও দুর্ভাগার দলেই আছি। একদা ইচ্ছা হ'ল 'শনিবারের চিঠি'র দুর্দান্ত সজনীকান্তকে দেখে আসি। কেমন সে লোকটা! রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে 'শনিবারের চিঠি'র আপিস। সাবিত্রী এবং কিরণকে কিছু না ব'লেই একদিন বেরিয়ে গেলাম। মানিকতলা খালের কাছাকাছি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে সভয়ে প্রবেশ ক'রে দাঁড়ালাম। চক-মেলানো বাড়ি, উঠানের চারি পাশে ঢাকা রোয়াক বা বারান্দা। সেই বারান্দায় বেশ জবরদস্ত কাঠামো—মোটা নাক, বড় উগ্র-দৃষ্টি চোখ, ফরসা রঙ, চেয়ারে ব'সে গড়গড়ায় রবারের নল লাগিয়ে তামাক টানছে। মনে হ'ল এই সজনীকান্ত, 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের মত জবরদস্ত চেহারাটা বেশ মিলে যাচ্ছে। তবে রবারের নলে গড়গড়া টানতে দেখে অশ্রদ্ধা হ'ল। এ কি গুরুচণ্ডালী ব্যাপার!"—১ম সং, পৃ. ৫৫-৫৬

সুন্দরবনের দুর্দান্ত কেঁদো বাঘ যে তখন অবস্থাবিপর্যয়ে তৃণভোজী হইয়াছে, তারাশঙ্করের তাহা জানিবার কথা নয়। বস্তুত, আমি তখন নিমীলিত নেত্রে উক্ত রৌপ্য-গড়গড়াটিকেই ঝাড়িয়া ফেলিবার ফন্দি আঁটিতেছিলাম; সুতরাং গুরুচণ্ডালী দোষ দেখিবার দৃষ্টিই আমার ছিল না।

এই নিদারুণ ত্রিশঙ্কু অবস্থায় বাঁচিবার আপাতসহজ এবং পরিণামে ভয়াবহ পথের সন্ধান দিলেন তখন 'শনিবারের চিঠি'র

বিজ্ঞাপন-সংগ্রাহক বন্ধুবর সুবলচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রাসবিহারী। নিমজ্জমান ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বাঁচাইবার নানা হদিস তাঁহার জানা ছিল। তাহার একটির নাম চোটাসুদে টাকা ধার করা। একদিন অতি প্রত্যুষে শ্রীমান আমাকে গরানহাটার একটি সুবৃহৎ প্রাসাদোপম ভাঙা বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেখানে ভোর হইতেই দলে দলে আসামীরা হাজির হইতেছে। একটি খেরো-বাঁধানো খাতায় সহি ও টিপসহি দিয়া মনিমজীকে বাড়ির ঠিকানা লিখাইয়া আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাসবিহারী জামিন হইলেন। একজন ভোজপুরী দরোয়ান সরেজমিনে তদন্ত করিতে গেল, ঠিকানা সাচ্চা কি না। সে ফিরিয়া আসিয়া অনুকূলে সাক্ষ্য দিলে প্রথম দিনের দেয় তিন শত পয়সা ও লিখাই-খরচ ইত্যাদি বাবদ দশ টাকা কাটিয়া লইয়া আমাকে লিখিতমত তিন শত টাকা ধার দেওয়া হইল। মোট বাহাত্তর দিন ধরিয়া প্রত্যহ তিন শত করিয়া পয়সা আদায়কারী দরোয়ানের নিকট দিলে তবেই সুদে আসলে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হইবে। ইহারই নাম চোটাসুদে ঋণগ্রহণ। আমি আসামী হইয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া অত্যন্ত জরুরি তাগাদাগুলির সুরাহা করিলাম। যতদিন তিন শত টাকার ভগ্নাংশ হাতে ছিল পরোয়া ছিল না, ভোরে দরোয়ান আসিলেই তাহাকে বিদায় করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার পর 'শনিবারের চিঠি'র নগদ বিক্রয় ও সামান্য বিজ্ঞাপন এবং রঞ্জন প্রকাশালয়ের বই বিক্রয়ের টাকা হইতে দেয় পয়সা দিতে গলদ্‌ঘর্ম হইতে লাগিলাম। প্রাণ যায় আর কি। কিন্তু এই কথা স্বীকার না করিলে আজ অন্যায় হইবে যে, এই কারবারীরা আসামীর মানে কদাচিৎ আঘাত করিত। দরোয়ান অতি প্রত্যুষে নিঃশব্দে আসিত এবং নিঃশব্দে চলিয়া যাইত। একদিন আধদিন অপারগ হইলে কথাটিমাত্র বলিত না। আসামীকে যথোপযুক্ত সম্ভ্রম দেখানোই যেন এই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু যত ভদ্রতাই ইহারা করুক,

বাহাত্তর দিনে পরিশোধের দায়িত্ব ছিল আসামীর। নাগপাশ প্রত্যহ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল, কখনও যে উদ্ধার পাইব সে ভরসাও ছিল না।

কিন্তু উদ্ধার পাইলাম। মুক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া মানুষকে দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মনোহারী মূর্তি তো আছেই। আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে ততখানি অগ্রসর হইতে দিলেন না। একদিন ভোরে সদর বহির্দ্বার ঘেঁষিয়া লেন-দেন হইতেছে, বন্ধু ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়ের কাছে ধরা পড়িয়া গেলাম। তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া ত্রিতলের হিতেন নন্দী এবং দ্বিতলের সজনীকান্তের সহিত একটু আড্ডা দিতে আসিয়াছিলেন। চোটাঋণের পরিমাণ তখন ছয় শত টাকায় উঠিয়াছে, 'শনিবারের চিঠি'র কাগজের দাম ছয় শত টাকা না দিলেই কাগজও উঠিয়া যায়। বিরিঞ্চিবিলাস সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি স্বভাবত বদরাগী লোক। আমি লজ্জায় ও ঘৃণায় মুহ্যমান হইয়া কম্পোজিং ঘরের টুলেই বসিয়া রহিলাম, বাড়ির আর কেহই কিছু জানিল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বিরিঞ্চিবিলাসের পুনরাবির্ভাবে একটু যে বিরক্ত হই নাই, তাহা বলিতে পারি না। তিনি আমাকে কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া প্রায় অভিভাবকের ভঙ্গিতে কঠোর আদেশ করিলেন, জামা গায়ে দিয়ে আয়, গরানহাটা যেতে হবে।

ঝাপসা চোখ কিছুক্ষণ অন্য দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইল। যাহা হউক, বিরিঞ্চিবিলাস আমার সঙ্গে গিয়া চোটাঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া বিচিত্র টিপসই-সম্বলিত খেরো-বাঁধানো বালি-কাগজের খাতাটি উদ্ধার করিলেন এবং প্রত্যাবর্তনান্তে আরও ছয় শত টাকা নগদ আমার হাতে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইবার উপদেশ আমার মগজে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সত্যকার মুক্তিরূপে এই সঙ্কটকালে তিনিই প্রথম দর্শন দিলেন।

কিন্তু সাবধান হইব কেমন করিয়া, আয়ের পথ কোথায়? দুর্ভাবনার অন্ত নাই। ঠিক এই সময়ে প্রায় একসঙ্গে আরও চারিজন মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটিল, যাঁহারা শেষ পর্যন্ত আমাকে বিরিঞ্চিবিলাসের নিকট প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে দিলেন না। বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ও যাদুকর প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, সাহিত্য-বন্ধু 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ইঁহারা যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই একসঙ্গে আসিয়াছিলেন। আমার আয়ের থার্মোমিটারের পারা প্রায় তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল, ইঁহাদের সহৃদয়তার তাপে তাহা ধীরে ধীরে চড়িতে লাগিল। কিন্তু ইঁহাদের কথা বিস্তারিতভাবে বলিবার পূর্বে কাজী নজরুল ইসলামের সহিত আমার সাক্ষাৎ আলাপ ও ঘনিষ্ঠতার কাহিনী বলা প্রয়োজন।

নজরুলকে 'শনিবারের চিঠি' কম গালি দেয় নাই, সত্য কথা বলিতে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম উল্কোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলী রন্ধ্র-পথেই আমি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মোহিতলালও ওই নজরুলের কারণেই আসিয়া জুটিয়াছিলেন,—তবে আমাদের ছিল স্রেফ খেলা, মোহিতলালের ছিল জীবনমরণ-সমস্যা। মনে আছে, নজরুলের ভাষায় 'খুন-খারাপি'র আতিশয্য-দৃষ্টে পীড়িত হইয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় একটু কঠোর অনুযোগ করিলে কাজী নজরুল সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র পৃষ্ঠায় সেই অনুযোগ উপেক্ষা করিয়া সদম্ভে বলিয়াছিলেন, "'শনিবারের চিঠি'র কৃপায় আমি তো গালির গালিচায় বাদশাহ।" সেই নজরুলের সহিত আমার ভাব হওয়া একটু বিচিত্র বটে। অচিন্ত্যকুমার তাঁহার 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে আমার তারিফ করিয়াছেন।

এই অঘটন ঘটাইয়াছিলেন অঘটন-ঘটন-পটীয়ান পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—আমাদের পবিত্রদা। মিলনের স্থানটা ধর্মস্থান ছিল না, মিলনেচ্ছুরাও ছিল না শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্। এক মজলিসে গান-বাজনার মধ্যে রাত্রি গভীর হইতেছিল। হঠাৎ পবিত্রদা প্রত্যাদিষ্টের মত অনুভব করিলেন, এমন একটা রাত্রে—"In such a night as this" নজরুল এবং সজনীকান্ত পৃথক থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। সেই গভীর রাত্রেই তিনি পড়ি-কি-মরি করিয়া ছুটিলেন এবং ব্যাপারটার তাৎপর্য আমাদের ঠাহর হইতে না হইতেই মজলিস-ভবনের দ্বারে কাজীর চকচকে চকলেট রঙের ক্রাইসলার গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মাটিতে চাদর লুটাইতে লুটাইতে তাম্বুলরাগরক্তাধরোষ্ঠবক্ষ নজরুল আসিয়া ঘরের মেঝেতে দাঁড়াইতেই আসরে উপবিষ্ট আমাকে পাঁচজনে মিলিয়া জোর করিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। তারপর হুমদো হুমদো দুই পুরুষের নারীসুলভ কোমলললিতলবঙ্গলতা পদ্ধতিতে প্রথম মিলন সংঘটিত হইল। সদ্য-পরিচয়ের "আপনি-আজ্ঞা" সম্বোধন অর্ধঘণ্টায় "তুমি" এবং পরবর্তী আধ ঘণ্টায় চড়্ চড়্ করিয়া "তুই-তোকারি"র অধোভূমিতে নামিয়া আসিল। সেদিন যাঁহাদের এই মহামিলনের মহানাটক অবলোকন করিবার সুযোগ হইয়াছিল তাঁহারা ভাগ্যবান। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই ভাগ্যবানদের দলে ছিলেন, এইটুকুমাত্র আমার মনে আছে।

বিমল, নলিনীকান্ত, সতীশচন্দ্র এবং নজরুল—আমি যখন অসীম শূন্যপথে নিশ্চিত সংঘাত-মৃত্যুর দিকে দ্রুত অবতরণ করিতেছিলাম, ঠিক তখনই ইঁহারা বিশ্বামিত্রের মত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিলেন। আমি তিষ্ঠিয়া গেলাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

কুয়াশা ও আশা

বহু বৎসর পূর্বে একবার ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। শীতকাল। বেলা দেড়টায় স্টীমার নারায়ণগঞ্জ ছাড়িল। আকাশ প্রশান্ত নির্মেঘ নীল। মৃদুতরঙ্গস্পন্দিত নদীজলের উপর নির্মল প্রসন্ন রৌদ্র মার্জিত রৌপ্যপাতের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। সেই তরল ভাস্বরতার দিকে একটানা চাহিয়া চাহিয়া চোখ অবসাদগ্রস্ত হইতেই কেবিনে গিয়া গা এলাইয়া দিলাম। ইচ্ছা ছিল তারপাশায় উঠিয়া ক্ষীর ও গরম রসগোল্লা খাইব। কখন তারপাশা পার হইয়া গেল, রৌপ্য কখন বিগলিত স্বর্ণের রূপ লইয়া শেষ পর্যন্ত নিকষ কালোয় পরিণত হইল, কিছুই জানিতে পারিলাম না; হঠাৎ একটা রূঢ় ধাক্কায় চকিত হইয়া জাগিতেই অনুভব করিলাম, চারিদিকে ক্রন্দন-কোলাহল শুরু হইয়াছে। সভয়ে বাহিরে আসিয়াই দেখি, দূরে কাছে কোনদিকে দেখিবার কিছু নাই, আমরা নিবিড় কুয়াশার আঁধির মধ্যে পড়িয়াছি। স্টীমারের অত্যুজ্জ্বল হেডলাইট গাঢ় শ্বেত যবনিকার সম্মুখভাগ মাত্র আলোকিত করিতেছে, পশ্চাদ্‌ভাগ মৃত্যুর মত রহস্যাবৃত অন্ধকারে বিলীন। অসহায় যাত্রীদের অধিকাংশ ইষ্টনাম ভুলিয়া আর্তনাদ করিতেছে। প্রবীণ-প্রবীণা দুই-চারিজনের ইষ্টনামও কানে আসিল। কোথায় আসিয়াছি, কি হইয়াছে—কিছুই ঠাহর হইল না; এইটুকু মাত্র বুঝিলাম, দিশাহীন কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রষ্ট স্টীমার চড়ায় ঠেকিয়াছে। হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম, রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে, এতক্ষণে প্রায় গোয়ালন্দ পৌঁছিবার কথা। কিন্তু সূচীভেদ্য কুয়াশায় বিপথে পরিচালিত হইয়া বন্দর হইতে কত দূরে অবস্থান করিতেছি জানিবার উপায় নাই। যাত্রীদের বিশৃঙ্খলা এবং সারেঙের চট্টগ্রামী ভাষা ভেদ করিয়া যাহা জানিলাম, তাহা আশাপ্রদ নহে। বাতাস স্তব্ধ; ভিতরের ভয় এবং বাহিরের

গুমটে প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, সহসা বায়ুমণ্ডলে আলোড়ন আরম্ভ হইল ; তীব্র ক্ষুরধার হিমেল হাওয়া দেখিতে দেখিতে ঝড়ের মূর্তি ধরিতে লাগিল। কুয়াশা নিমেষমধ্যে অপসারিত হইতেই বিস্মিত-পুলকে বুঝিতে পারিলাম, বন্দর অতি নিকটেই। গোয়ালন্দের আলোকমালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কুয়াশার অন্তরাল হইতে যেন হাসিয়া উঠিল। যাত্রীরা সমবেতভাবে জয়ধ্বনি করিল। মুহুর্মুহু বিপদসূচক বংশীধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইতে না হইতেই ছোট-বড় দুই-তিনখানা স্টীমার আমাদের উদ্ধারসাধনে ছুটিয়া আসিতেছে দেখা গেল। শীতের বাতাস উপেক্ষা করিয়া যাত্রীরা পাটাতনে দাঁড়াইয়া আনন্দ-কোলাহলে মত্ত হইল। নিরাপদ বন্দরে পৌঁছিতেও দেরি হইল না।

'প্রবাসী'-বন্দর ছাড়িয়া 'বঙ্গশ্রী'-বন্দরে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বেই আমাকেও কুয়াশার আঁধিতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই, বন্দর নিকটেই। দিশাহীন তমসার মাঝখানে যখন ছটফট করিতেছি, প্রথম বরাভয়-হস্ত প্রসারণ করিলেন দুই দিক হইতে দুইজন—সঙ্গীত-যাদু-প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার। বন্ধুবর সুবলচন্দ্রের মারফৎ বিমলের সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল এবং আমাদের পরস্পরের নিজগুণে ঘনিষ্ঠতা হইতেও বিলম্ব হয় নাই। এমন প্রত্যুৎপন্নমতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, চৌকস মানুষ আমি দেখি নাই ; এমন সহৃদয় বন্ধুও নয়। বন্ধু বিপদে পড়িয়াছে শুনিলেই হইল, তাহার নিজের ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, নানা যোগাযোগ ঘটাইয়া সে বন্ধুকে উদ্ধার করিবেই। সে অসঙ্কোচে যেমন লইতে পারিত, অকুণ্ঠচিত্তে তেমনই দিতেও জানিত। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর অনেকগুলি অপোগণ্ড ভাইবোনকে সে যেভাবে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, ঠিকমত লিখিতে পারিলে তাহা একটা মহাকাব্য হইবে। ভাই-বোনেদের জন্য খাটিতে খাটিতে জোয়ালে-জোতা অবস্থাতেই অর্থাৎ

উড়িষ্যার এক স্টেটে ম্যাজিক দেখাইতে দেখাইতে আমাদের এই উদারহৃদয় বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হয়।

আমার আর্থিক বিপদ প্রণিধান করা মাত্র বিমল বলিল, তুই তো গান বাঁধতে পারিস, হাসির গান বা সুর দিয়ে গাইবার মত কবিতাও তোর অনেক লেখা আছে। নতুন গান লেখ্, আর, পুরনোগুলো নিয়ে আয়। মুদ্রিত-অমুদ্রিত বই-খাতা, সাময়িক পত্রের ছেঁড়া পাতা ও টুকরা কাগজ এক গাদা তাহার নিকট দাখিল করিলাম। সে বিশল্যকরণী বাছার মত বহু কষ্টে কয়েকটা গান বাছিয়া লইয়া সুর দিতে বসিল এবং অচিরাৎ একদা দ্বিপ্রহরে আপার চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত "হিজ মাস্টার্স ভয়েস" কোম্পানির মহড়াগারে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা একজন ভট্টাচার্য মহাশয়ের দরবারে আমাকে সুদ্ধ হাজির করিল—আয়নার মত ঝকঝকে টাক এবং তীক্ষ্ণখড়্গনাসা মুখ, বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। শুনুন ভট্‌চায মশাই।—বলিয়াই হারমোনিয়াম টানিয়া লইয়া গান আরম্ভ করিয়া দিল। এমন দরদ দিয়া বিমল গাহিল যে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'না' বলিবার উপায় রহিল না। আমি পরীক্ষায় পাস করিয়া গ্রামোফোন কোম্পানির গানের কথার জোগানদার-শ্রেণীভুক্ত হইলাম। দর—মৃত্যু-বিরহ-দীর্ঘশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসা ও স্বদেশপ্রেম বিষয়ক গান-পিছু পাঁচ টাকা, হাসি-কৌতুকের গান ও মজাদার কেচ্ছা-পিছু দশ টাকা। প্রথম দিনের নির্বাচনেই পঁয়ত্রিশ টাকা রোজগার হইল।

কাজী নজরুল তখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে হেড কম্পোজার ও ট্রেনার। স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংস বলিয়া তখন কোম্পানিতে তাহার অসম্ভব খাতির। সে পানের পিক ফেলিবে জানিলে স্বয়ং ভট্‌চায মশাই পিকদান হাতের কাছে না পাইলে নিজের টাক্‌টাই পাতিয়া দিতে পারেন। কাঁচা পরিচয়ের প্রেমে সেও সর্বতোভাবে আমার সহায় হইল। স্বয়ং আমার কয়েকটি গানে সুর দিয়া আমার

প্রতিষ্ঠাও বাড়াইয়া দিল। ফলে আমার একটা ভাল আয় দাঁড়াইয়া গেল। অব্যবহিত পরে বিমল গ্রামোফোন কোম্পানির "টুইন" বিভাগের সেরা ওস্তাদ নিযুক্ত হইলে আয়ের অঙ্ক আরও একটু বাড়িল। প্রায় এই সময়েই কলের-গান-সংক্রান্ত সামগ্রীর প্রখ্যাত ব্যবসায়ী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "মেগাফোন কোম্পানি" স্থাপন করিয়া রেকর্ড প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কাজে অবতীর্ণ হইলেন। বিমল সেখানেও ট্রেনার বা ওস্তাদের কাজ পাইল। মেগাফোন-ছাপে আমারও গান বাহির হইতে লাগিল।

আয় তো বাড়িলই, নিরবচ্ছিন্ন অবসর যাপনের অবকাশ, সোজা বাংলায়—ঢালাও আড্ডা দিবার সুযোগ পাইয়া সেই ভয়াবহ বেকার অবস্থায় যেন বাঁচিয়া গেলাম। দ্বিপ্রহরে চিৎপুর রোডের গ্রামোফোন কোম্পানির এবং সন্ধ্যায় হ্যারিসন রোডের মেগাফোন কোম্পানির শিক্ষাকেন্দ্রের বিস্তৃত ফরাসে দেহ এলাইয়া আড্ডা ও বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে চোখ ও কানের বিবিধ উপরি-খোরাক জুটিত। কখনও কখনও এই সকল স্থানেই রেকর্ডের জন্য ফরমায়েসী গান অথবা 'শনিবারের চিঠি'র জন্য প্রবন্ধ কবিতা গল্প লিখিতাম। কাজী নজরুল এই সময়ে একদিন মেগাফোনের আড্ডায় তাহারই "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার"কে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা আমার "ভাণ্ডারী হুঁশিয়ারে" সুর দিয়া গাহিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। গানটি বিমল দাশগুপ্তের কণ্ঠে মেগাফোন রেকর্ডে বিধৃত হইয়াছিল। প্রথম দুই লাইন এই :

চোর ও ছ্যাচড় ছিঁচকে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার,
তল্‌পিতল্‌পা-তহবিল নিয়ে ভাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

বিমল তৎকালীন প্রধান সমস্যা—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া লিখিত আমার "আলু ও পেঁয়াজ" কবিতাটির প্রথমাংশে কীর্তন ও শেষাংশে গজলের সুর যোজনা করিয়া ও স্বয়ং গাহিয়া বহু আসর মাত করিয়াছিল। ভট্‌চায মহাশয়ের আগ্রহে গানটি একটি

গ্রামোফোন রেকর্ডের দুই পিঠে স্থায়িত্বলাভ করিয়াছিল। গানটির বিষয়বস্তু আজিও পুরাতন ইতিহাস হইয়া যায় নাই, জীবন্ত বর্তমানেরই সামিল হইয়া আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি :

আলু— মিনতি করি, শোন কাল্লু মিয়া,
ভিন্দালু রাঁধ যদি আমারে নিয়া,
শোন দোহাই তব
বেশি কি আর কব,
আহা ফুটিফাটা বেদনায় বিদরে হিয়া।
মোরে যা খুশি রাঁধ
গাঢ় বাঁধনে বাঁধ—
শুধু জাতটি মেরো না পল-অণ্ডু দিয়া।
দেখ হদিসে যদি সে তব হদিস থাকে,
মোরে কল্‌মা পড়ায়ে দিও কল্‌মি-শাকে।
দিও টম্যাটো-ওলে
ফুল- কপির ঝোলে,
দিও কচুর সাথেতে মোর নেকাহ্‌-বিয়া।
ফেলে পেঁয়াজে মোরে
মেরো নাকো বেঘোরে,
ওগো যা হও তা হও তুমি সুন্নি-শিয়া।
খাসী- মাংসে ফেলিয়া মোরে বানিও কাবাব,
দিও চপ-কাটলেটে তাতে ক্ষতি নাহি সাব্‌,
হীন বেসনে ফেলে
তুলো ভাজিয়া তেলে,
রব ফাউলে বাউল হয়ে কারি বনিয়া।
নীচ পিঁয়াজের সাথ
মোরে ক'রো না বেজাত,
মোরে প্রাণে মারো, মেরো নাকো জাত মারিয়া।
পিঁয়াজ— হরি ঠাকুর শোন, তেরা টিকির কিরে,
মোরে অম্বলে দিও দিয়ে ফোড়ন জিরে,

লাগে খোদার কসম
যদি রাঁধ আলু-দম,
মোরে দিও না তাহাতে ফেলে দু ভাগে চিরে।
মোর করিও ভাজি,
তাতে নহি নারাজী,
শুধু ফেলো না কাফেরী-ফেরে কলিজা ছিঁড়ে।
তব শাস্ত্রে যদিবা কিছু আস্থা থাকে,
মোরে শুদ্ধি করিয়া দিও মুলোর শাকে।
শোন তোমায় বলি,
দিয়ে কাঁচা কদলী
রেঁধো শুক্তো অথবা ফেলো ঘণ্ট-ভিড়ে।
গোল আলু-ভাগাড়ে
ফেলে মেরো না হারে—
দিও থেঁৎলে বরং মেরে মুগুর শিরে।
ফেলে মাংসে পাঁঠার রেঁধো ঘুগ্‌নি-দানা,
দিও কুমড়ো-ছোকায় আমি করি না মানা;
তব দোহাই ঠাকুর,
মোরে ভেজো চানাচুর—
শুধু মেরো না আমার জাতি-ধরমটিরে।
সব সহিতে পারি
পারি ছাঁটিতে দাড়ি
শুধু আলু-ছুঁৎ হ'লে ভাসি নয়ন-নীরে॥
শ্রীহরি ঠাকুর আর কাল্লু মিয়া।
একই দেহ দুই রূপ দেখ বুঝিয়া॥

এই গানটির জন্য আমি ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। সে যুগে সে এক মস্ত সম্মান। যাহা হউক, গান ও "অভিজ্ঞতা"র সঞ্চয় প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল, অর্থ তো পাইলামই; বহু প্রখ্যাত গায়ক-গায়িকা ও বাজিয়েদের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকারও আমার আয়ের পথ সুগম করিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। তখন কলিকাতার বেতার-প্রতিষ্ঠান বেসরকারী অথবা আধা-সরকারী, নাম ছিল মার্কনি ওয়্যারলেস অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং বা এই ধরনের একটা কিছু। তখন কর্তা ছিলেন একজন স্টেপলটন সাহেব, ছোট কর্তা—নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, খ্যাতনামা ক্ল্যারিওনেট-বাদক। নলিনীকান্ত নৃপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কাজেই তাঁহার প্রয়াসে কাজ হইল। বেতারে মাসে অন্তত একবার শনিমণ্ডলের আসর বসিতে লাগিল। এক ঘণ্টার প্রোগ্রাম বাবদ পরিচালক-হিসাবে আমি পঁচাত্তর টাকা করিয়া পাইতে লাগিলাম। নলিনীকান্ত আমার গৃহরঞ্জন করিবার জন্য মাসিক সামান্য ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে একটি বেতার-যন্ত্রেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—আমার দুই প্রিয় সোদরোপম ঘনিষ্ঠ সাহিত্যবন্ধু—এই আসরের দৌলতেই তাঁহাদিগকে পাইয়াছিলাম। এখানেও কাজী নজরুল আমার সহায় হইয়াছিল। শনিমণ্ডলের আসর অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। তখন সুবিধা ছিল, স্ক্রিপ্ট বা লেখা আগাম দাখিল করিতে হইত না, মাইকের মুখামুখি দাঁড়াইয়া বক্তব্য প্রস্তুত করা চলিত। 'শনিবারের চিঠি' হইতে পাঠ-আবৃত্তি-গানই হইত বেশি। রেডিওর এমনই একটি আসরে কাজী আমার 'পথ চলতে ঘাসের ফুলে'র কয়েকটি গান গাহিয়াছিল।

এই সময়কার 'শনিবারের চিঠি'র আপিসের একটি চিত্র "পুরাতনী" নাম দিয়া ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

> ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর, 'শনিবারের চিঠি' বৎসর-কালের অজ্ঞাতবাসের শেষে সদ্য-স্থাপিত নিজস্ব ছাপাখানা "শনিরঞ্জন প্রেস" হইতে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় পাকাপাকি

রকম ডেরা বাঁধিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি' আপিসে প্রত্যহ নিয়মিত আড্ডা জমিতেছে—প্রায়-নন্-স্টপ, তবে তেজটা সন্ধ্যার ঝোঁকেই বেশি। দীর্ঘ বিরোধের পর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়াছে। তিনি প্রায় আসিতেছেন এবং হাসি গান ও পানের পিকে আসর সরগরম করিয়া তুলিতেছেন; পাশেই অবস্থিত চায়ের দোকানটি কাজেই দ্রুত ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমাদের ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইডের কাজ করিতেছেন। মনিটার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' আপিসের চাকুরি-অন্তে বৈকালে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের মুখে দৈনিক রোঁদ সারিয়া চলিয়া গেলে আমাদের নিশীথ মজলিস বসিত, শত্রুরা অন্যায় করিয়া বলিত—ভৈরবী-চক্র। নলিনীকান্ত সরকার প্রায়শই প্রথমার্ধের উৎসাহ বর্ধন করিয়া দ্বিতীয়ার্ধে কাটিয়া পড়িতেন, রাত্রির গভীরতার সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-সাধনা নিবিড়তর হইত, পাশেই যন্ত্রহীন ছাপাখানায় দুই হাতের কম্পোজের কাজ চলিতে থাকিত।

একদিনের বৈকালিক সভা, তারিখ ঠিক মনে নাই; এইটুকু স্মরণ আছে—অসহযোগ আন্দোলন প্রশমনের জন্য সরকার কি একটা কঠিন আইন জারি করিয়াছেন, সেই দিন প্রাতেই দুঃসংবাদ দৈনিকপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্র মৈত্র খালি গায়ে একটি মোটা কম্বল চাদরের মত জড়াইয়া খবরের কাগজ বগলে প্রবেশ করিলেন, হাতে কলেজ স্ট্রীট প্রাঙ্গণ হইতে সদ্য-কেনা একটি বই—রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনী ও অনেকগুলি কৌতুকাবহ পাদপূরণ-কবিতার সংগ্রহ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নূতন মেরুন-রঙের ক্রাইসলার গাড়ি হইতে তাম্বুলরাগ-রঞ্জিতবক্ষ কাজী নজরুলের প্রবেশ এবং হুঙ্কার, "দে গরুর গা ধুইয়ে"—এটি তাঁহার সন্ধ্যা ভাষায় চায়ের হুকুম। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পাশের দোকান অভিমুখে ছুটিলেন। রবি তখনও কম্বলের খোলস ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার মুখখানা বজ্রবর্ষী মেঘের মত থমথম করিতেছিল। চা আসিতেই সর্বাগ্রে একটি বাটি টানিয়া লইয়াই তিনি বোমার মত ফাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, আবার এই নতুন নাগপাশের জ্বালায় ছেলেরা আর কেউ বাঁচবে না। আমরা চায়ের বাটিতে হাত রাখিয়া প্রশ্নাতুর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতেই তিনি বজ্রনির্ঘোষে নূতন আইনের

সংবাদ ঘোষণা করিয়া টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, প্রতিবিধান চাই। নিশ্চেষ্ট ব'সে থাকবে তোমরা? নজরুল এই অবসরে রবির সংগৃহীত বইখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, বেশ, কাজে লেগে পড়া যাক। রসসাগরের পাদপূরণ পদ্ধতিতে আমরা এর প্রতিবাদ করি এস। বলিয়াই তিনি শুরু করিলেন:

পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ
ভাগো ভাগো, মীন-বৎস!

আমি জুড়িয়া দিলাম—

আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য।

উভয়ের সমবেত চেষ্টায় শেষটা এইরূপ দাঁড়াইল:

কাজী— ফেলিয়া খ্যাপলা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই-কাৎলা,
আমি— চুনোপুঁটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাতলা।
কাজী— পুকুরের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশটে গন্ধে,
আমি— এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলের গিঁঠানো রন্ধ্রে।
কাজী— লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বঁটিতে,
আমি— অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়িয়ে
ভরিবে কোঁচড়ে কটিতে।
কাজী— কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
আমি— জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মরিয়া যাইরি তরিয়াই।...

এই পাদপূরণ খেলায় রবির ক্রোধ অনেকখানি প্রশমিত হইল।...

এই আড্ডায় শ্রদ্ধেয় শরৎ পণ্ডিত—দাঠাকুর—মহাশয় প্রায়ই আসিতেন। কাজী নজরুল ও আমার মাখামাখি বন্ধুত্ব লইয়া তিনি একটি অতি সরস, আমাদের পক্ষে ড্যামেজিং, ছড়া বাঁধিয়া তখন সকলকে শুনাইতেন।

'বসুমতী'র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। 'প্রবাসী' ছাড়ার পর দুই-তিন মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে, অবস্থা সঙিন। বারান্দায় শীতের রোদে পিঠ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, সদর রাস্তায় মোটর কার থামিবার শব্দ এবং পরক্ষণেই আমাদের গলিতে ক্রমাগ্রসরমাণ এক জোড়া পদশব্দ শুনিলাম। কেহ আমারই সন্ধান করিতেছেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতেই 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গ" নামক সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখকরূপে মাসিক এক শত টাকা বেতনে বাহাল হইয়া গেলাম। আমাকে কোথায়ও যাইতে হইবে না, প্রত্যূষে দৈনিক পত্রগুলি আসিবে, সেগুলিরই সংবাদ বা মন্তব্যের উপর প্যারার মত করিয়া মন্তব্য লিখিয়া দিতে হইবে, বেলা দশটা নাগাদ সাইকেল-পিয়ন আসিয়া লইয়া যাইবে। বেতনও লোক-মারফৎ আসিবে। গ্রামোফোন-রেডিওর অনিশ্চিত আয়ের বিষম ধকলের মধ্যে খানিকটা শক্ত মাটির আশ্রয় মিলিল। সতীশচন্দ্র আমার নিদারুণ দুরবস্থার কথা কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন কি না জানি না, তাঁহার অপ্রত্যাশিত সাহায্য দেবতার কৃপারূপেই গ্রহণ করিলাম।

কুয়াশার আঁধি ছিন্নভিন্ন করিবার সুবাতাস সতীশচন্দ্রই সঙ্গে আনিলেন—আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। নিয়মিতই লেখা জোগাইয়া চলিলাম, কখনও গাফিলতি হয় নাই। বাংলা ২৬এ চৈত্র, ১৯৩২এর এপ্রিল মাসের কোনও একটি দিন বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান উপলক্ষে তাঁহারই সম্বন্ধে "সাময়িক প্রসঙ্গ" লিখিলাম। সুবাতাস তাহা বহন

করিয়া বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সুদক্ষ পরিচালক, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলি।শং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের দৃষ্টিপথে লইয়া গেল। আমি তখন কিছুই জানিতে পারিলাম না, কুয়াশার মধ্যেই হাঁপাইতে লাগিলাম।

হাঁপাইতে লাগিলাম, কারণ হঠাৎ 'বসুমতী'-লব্ধ দম ফুরাইল। "সাময়িক প্রসঙ্গে"র এক কিস্তিতে বাংলা দেশে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুনারীহরণের উপর একটি কঠিন গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বসিয়াছিলাম। তাহাতে দণ্ডবিধি-আইন ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগে প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, ধর্ষণকারী অথবা ধর্ষণেচ্ছু ব্যক্তিকে হত্যা করিলে কোনও অপরাধ হয় না এবং তাহাই করা উচিত। বাংলা দেশে মুসলমানী শাসন তখনও একচ্ছত্র না হইলেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কাজেই 'দৈনিক বসুমতী' আইনের কবলে পড়িল। বিচারে জমার টাকার (তখন বিদ্রোহী পত্রিকাগুলিকে রাজদ্বারে দুই-দশ হাজার টাকা জমা রাখিতে হইত) মধ্যে এক হাজার জব্দ হইবার হুকুম হইল। সতীশচন্দ্র ভয় পাইলেন এবং আমিও তাঁহার স্নেহাশ্রয়চ্যুত হইলাম। আমার অত্যন্ত দুঃসময়ে সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

কুয়াশার মধ্যে আরও দুই দিক হইতে সুবাতাস বহিয়াছিল। হেমন্তবালা দেবীর কথা বলিয়াছি। তিনি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বিরূপ রবীন্দ্রনাথকে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতেছিলেন। নিতান্ত অবসর-বিনোদনের খেলা—চিঠি লেখার খেলায় তিনি তখন রবীন্দ্রনাথকে অবিরত যোগ দিতে আহ্বান করিতেন। তাঁহার আশেপাশে প্রত্যহ দুঃখকর বা কৌতুককর যাহা কিছু ঘটিতেছে, বিশেষ করিয়া আমার গলিপথ দিয়া কখন কি ধরনের সাহিত্যিক আমার সহিত সমাগত হইবার জন্য আসিতেছেন, তাঁহাদের চলন বলন চেহারা ধরন প্রভৃতি খুঁটিনাটির নিখুঁত বর্ণনা মাসীমা নিয়মিত

পাঠাইতেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে তাহা হজম করিতে হইত। আমার অনেক পারিবারিক—মায় চাল-ডাল-নুন-তেলের খবরও রবীন্দ্রনাথকে শুনিতে হইত। মাসীমার ছেলেমানুষিও অনেক ছিল। যেমন, এত সব সাহিত্যিক সজনীকান্তের কাছে আসেন, আপনি কেন আসিবেন না? এই সকল চিঠির নকল ও রবীন্দ্রনাথের জবাব আমি পরে দেখিয়া কৌতুক ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। উপরের প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, কেন আসিব না, সজনীকান্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেই যাইব। মাসীমা রবীন্দ্রনাথের কাছে কাজীর টাকের এবং পানখাওয়ার ধরনের একটি অপরূপ বর্ণনা দাখিল করিয়াছিলেন। বারম্বার আঘাতে রবীন্দ্রনাথের শক্ত বিরাগের ভিত্তিমূল মাসীমা নিশ্চয়ই শিথিল করিয়া আনিয়াছিলেন, নতুবা কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহ আবার লাভ করিলাম কেমন করিয়া?

ঠিক এই রবীন্দ্র-বিরাগ-কালে দাদামহাশয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহও কম আশা যোগায় নাই। এই সময়েই তাঁহার সহিত নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ঘটে। তিনি কি চোখে আমাদের প্রথম দেখিয়াছিলেন তাঁহার "স্মৃতিকথা" (১৩৫০) হইতেই তাহা উদ্ধার করিয়া শুনাইতেছি:

> স্বামীহারা ভাগ্যহীনা অকালবিধবা যেমন তার একমাত্র শিশু-পুত্রটিকে নাড়াচাড়া ক'রে আশার আলোক সৃষ্টি ক'রে দুঃখের পথ অতিক্রম করে, আমরাও জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, বুঝে হোক না-বুঝে হোক, সাহিত্যকেই দুঃখের দিন কাটাবার উপায়ের মত গ্রহণ করেছিলুম। তাতে কোন্ সুখ আছে, সে আমাকে কি দেবে—কেউ আমাদের ব'লে দেন নি। সাহিত্য তাকে নিজেই টেনেছিল।
>
> দেখি বালকেরাও পল্লীতে পল্লীতে হাতে লিখে পত্রিকা বার করছে। বিদেশেও যেখানে বিশ ঘর বাঙালী আছেন, সেখানেও এই হাওয়া বইছে। যুবকদের মধ্যে তো থাকবেই—থাকবার কথাই।

সে সব ছাপার অক্ষরে পাকা দলিল হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেবার ইচ্ছা-আগ্রহের ত্রুটি নাই। কিন্তু একটি অভাব লোকের নজরে পড়ে—সেবা যেন দায়িত্ব-ভোলা। এতে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে, সাহিত্যনিষ্ঠ চিন্তাশীলেরা বিচলিত হন।

তরুণেরাই যে ভবিষ্যতের ভরসা, উত্তরাধিকারী—child is the father—সাহিত্য যে নিজত্ব খোয়াবে, জাতীয় বিশেষত্ব হারাবে! কিন্তু এই আকস্মিক noveltyর স্রোতকে বাধা দেওয়াও সহজ নয়, তারও মোহ আছে, সে নূতন যে! এবং যথাসময়ে মোড় ফেরাবার প্রয়াস ও যত্ন পাওয়াই সমীচীন। তখন সেটা বিবেচনা ব'লে বিজ্ঞতার বাধার মধ্যে ঠেকে থাকে, অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বাইরের বিরোধ মাথা পেতে নেবে কে! মানুষ অনেক কিছু পারে, কিন্তু যেচে নিন্দাভাজন হতে চায় না।

এই অবস্থায় সহসা তাঁরা অযাচিতভাবে যাঁকে পান, তিনিই আমাদের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। ১৬।১৭ বৎসর পূর্বে বীরভূমের এই বীর যুবকটি ছিলেন আমাদের অপরিচিত। ক্রমে আত্মপ্রকাশে তাঁকে পেলুম প্রবল aggressive সাহিত্যপ্রেমিকরূপে, যৌবন-ধর্মসুলভ উগ্র ও ব্যগ্র কর্মী।

তাতে বিবেচকরাই বেশি চমকে যান, কিন্তু মনে মনে অনুচ্চারিত স্বাগতম্‌ও জানান।

আমাদের রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসবে [১১ই পৌষ, ১৩৩৮] কলিকাতা যাই ও স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার অধুনা ৺ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য স্বীকার করি। দয়া ক'রে অনেকেই দেখা করতে আসতেন। সেই ভাগ্যলব্ধ প্রবাহের সুমধুর দানের মত একদিন দুই বন্ধুর আগমন হয়। তাঁরা সরাসরি সাহিত্যের কথা আরম্ভ ও প্রায় দেড় ঘণ্টায় শেষ করেন। এমন সাহিত্যরসপুষ্ট উচ্ছ্বসিত সাহিত্য-কথা পূর্বে শুনি নাই। মগ্ন প্রেমিক, সাহিত্যই ধ্যানজ্ঞান। পরিচয়ের আদানপ্রদান বা অন্য কথা—অবান্তর।

অবাক হয়ে উপভোগ করছিলাম, অপরেশবাবুও উপস্থিত ছিলেন। আগের কথাটা শেষে পেলুম, একজন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিতীয় আমার প্রিয় প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত

সজনীকান্ত দাস। তাঁরা আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রে গেলেন।

অপরেশবাবু বহুদর্শী লোক ছিলেন, বললেন, 'এঁরাই একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক,—দেশকে অনেক কিছু দিতে এসেছেন, দিয়ে যাবেন।' তিনি আজ এ রঙ্গভূমে নাই, কিন্তু সেই অভিজ্ঞ প্রবীণের কথা সার্থক হয়েছে। থাকলে কত আনন্দই পেতেন।

সুনিবিড় কুয়াশার মধ্যে চড়ায় ঠেকা অবস্থায় আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না যে, 'বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গে" বঙ্কিমচন্দ্রের তমোনাশী প্রভাব তখনই আমার উদ্ধারসাধনে কার্যকরী হইয়াছিল, বন্দরাগত সমধর্মী বন্ধুদের প্রসারিত কর শিথিল হইবার পূর্বেই স্থায়ী চাকরির আকারে তাহা দেখা দিল। কিন্তু মজার কথা এই যে, যোগাযোগ ঘটিল একটু তির্যকভাবেই। ভট্টাচার্য চৌধুরী কোম্পানি তখন মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসাবে 'উপাসনা' প্রেস খরিদ করিয়াছেন এবং শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বন্দোবস্তে তাঁহার 'উপাসনা' পত্রিকাটিকে ঢালিয়া সাজিতেছেন। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত 'উপাসনা'র সাড়ম্বর ঢক্কা-নিনাদী বিজ্ঞাপনকে কঠিন ব্যঙ্গ করিয়া আমি 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্যে" কিছু মন্তব্য লিখিয়াছিলাম। একনায়কত্বে অভ্যস্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়কে উত্তেজিত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। আজ বুঝিতে পারি, তিনি আমার ধৃষ্টতায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জীবিত বা মৃত আমাকে ধরিয়া আনা চাইই। হয় শির লইবেন, নয় শিরোপা দিবেন। আমার ভাগ্য সবে সুপ্রসন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই শিরোপাই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে লইবার জন্য রথ আসিতেছিল। চীনাংশুক-কেতনের মত পুরোগামী হইয়া সাহিত্যিক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীকিরণকুমার রায় একদা আমার আবাসে দর্শন দিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

"কি ছিল বিধাতার মনে"

ব্যাপারটা একটু খোলসা করিয়া বলাই দরকার।

'প্রবাসী'র চাকরি ছাড়া ও 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি ধরা অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের কার্তিক হইতে ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত চৌদ্দ মাস 'শনিবারের চিঠি'তে অবিশ্রান্ত বেপরোয়া ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার আক্রমণ চালাইয়া আমি বস্তুত নিজের ভাগ্যের সঙ্গেই পাঞ্জা লড়িতেছিলাম। নিজের প্রতি নিষ্ঠুর হইবার সাধনায় অন্যের সুখ-দুঃখ মান-অপমান গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতাম না; নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিতে গিয়া খাপ-খোলা তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাহাকে সম্মুখে পাইতাম তাহাকেই আঘাত করিয়া বসিতাম। 'শনিবারের চিঠি'র সেই পুরাতন সংখ্যাগুলির পাতা উল্টাইয়া উপলব্ধি করিতেছি যে, আমার ব্যক্তিগত সঙ্কটজনিত অস্থিরচিত্ততা সেখানে আত্মঘাতী শ্মশান-বৈরাগ্যরূপেই প্রকট হইয়াছিল। বিড়াল কোণা লইলে যেমন রুখিয়া দাঁড়ায়, আমিও সেইরূপ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভয়ে ও আশঙ্কায় মুহ্যমান অবস্থায় ভূতভয়গ্রস্তের রামনাম জপার মত কেবলই জপিতেছিলাম—আমি, আমি, আমি। বলিতেছিলাম:

ঈর্ষাক্ষুব্ধ নদীনীর তরণী দুলিছে অবিশ্রাম,
আকাশে মেঘের মায়া, রহি রহি বিদ্যুৎ-ভ্রূকুটি;
বজ্রের গর্জনমাঝে উচ্চে তুলি আপনার নাম,
দৃঢ়হস্তে ধরি হাল, ক্ষুব্ধ ঝড় মরে মাথা কুটি।

সুমুখে রচিছে পথ পিছে মানুষের ইতিহাস,
বিপুল আমার দম্ভে যুগে যুগে স্তম্ভিত পৃথিবী;
পিছনে গর্জিয়া আসে সময়ের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস,
ততবার উঠি জ্বলি যতবার যাই নিবি নিবি।

প্রশস্ত ললাটে মোর নিজহস্তে রচি জয়টীকা,
বিক্ষুব্ধ-তরঙ্গাহত তরণীর আমি কর্ণধার ;
অধোমুখী কভু নহে তিমিরে প্রদীপ্ত দীপশিখা,
নিজেরে যে করে নতি সে লভে সবার নমস্কার।

আমি ধরিয়াছি হাল, এ দুর্যোগে নাহি করি ভয়,
আপনি গাহিয়া চলি উচ্চকণ্ঠে আপনার জয়।

শির, তামেচা, বাহেরা—যথাযথ বজায় রাখিয়া 'শনিবারের চিঠি' এই কালে অদ্ভুত মারের কৌশল দেখাইয়াছিল। লক্ষ্য ছিল সর্বগ্রাসী—রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, প্রমথ প্রভৃতি প্রবীণ হইতে প্রায়-সদ্যোজাত তরুণ পর্যন্ত কেহই বাদ যান নাই। মোহিতলালের গুরুগম্ভীর ভারী ভারী প্রবন্ধ, ব্রজেন্দ্রনাথের বহু বিচিত্রতথ্যপূর্ণ পুরাতনী গবেষণা সমবেতভাবেও আমাদের পৌরাণিক ও আধুনিক সুতীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত শস্ত্রপ্রয়োগের সঙ্গে তাল রাখিতে পারে নাই। রবি মৈত্র এবং আমি—মাত্র এই দুইজনেই তুলক্লাম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিলাম। আমাদের দুইজনেরই তখন উদ্‌ভ্রান্তিযোগ ; এই ভয়াবহ ভাঙনের মধ্যে স্থায়ী কিছু সৃষ্টির আবেগে আমরা যাহাকে বলে—থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলাম। এই উদ্দাম চাঞ্চল্য যে বৃথা যায় নাই, রবির ক্ষেত্রে তাহা অচিরাৎ প্রকাশ পাইল ; তিনি পরে পরে অত্যল্পকালমধ্যে 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' রচনা করিতে বসিলেন। আমি অতি নগণ্য "টুকরি" দিয়া শুরু করিয়া 'রাজহংসে'র "কে জাগে" কবিতায় আসিয়া স্থির হইলাম।

আমাদের এই দক্ষযজ্ঞের যুগে শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "উপাসনা প্রেসে"র হস্তান্তর এবং 'উপাসনা' পত্রিকার নবকলেবর-ধারণ-বিজ্ঞপ্তি লইয়াই কাণ্ডটা ঘটিল। অপরাধ তেমন মারাত্মক কিছু নহে, বিজ্ঞাপন দিবার কালে সকলেই রাজা-উজিরমারী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, 'উপাসনা'র নূতন কর্মকর্তা "ভট্টাচার্য চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং" তাহাই করিয়াছিলেন। অকারণেই আমরা ক্ষেপিয়া

উঠিলাম। চৈত্রের (১৩৩৮) 'উপাসনা'র বিজ্ঞাপন লইয়া জ্যৈষ্ঠের (১৩৩৯) 'চিঠি'তে সোরগোল তুলিয়া বলিলাম :

> 'উপাসনা'র ভাগ্য ভাল, মকরধ্বজ ও ধুতুরা পাতার ব্যবস্থার পরিবর্তে ভট্টাচার্য চৌধুরী কোং অবধৌতিক মতে ইহার চিকিৎসা শুরু করিয়াছেন।…দুধটি মারিয়া যেমন ক্ষীর, ক্ষীরটি মারিয়া যেমন চাঁচি—তেমনি ব্যাসদেবের মহাভারতের পর যথাক্রমে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং তৎপরেই 'উপাসনা'… সাহিত্যে ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রবেশ করিলে চক্ষুলজ্জা কি এতখানিই ত্যাগ করিতে হয় ?

এইটুকু নিরাপদ গালি, কিন্তু এই সঙ্গে ভট্টাচার্য চৌধুরী কোং-পরিচালিত মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনর্থক খোঁচা ছিল। তাহা বরদাস্ত করিবার মত অহিংস ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন না। তিনি যখন আমার শাস্তিবিধানের জন্য আইনজ্ঞের পরামর্শ লইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে মাসাধিককাল পূর্বে 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত আমার বঙ্কিম-প্রশস্তি তাঁহার নজরে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আইনের বাঁধনের পরিবর্তে চাঁদির বাঁধনের কথা তাঁহার মনে হইল। সাবিত্রীপ্রসন্নকে সরাইয়া অপরাধী আমাকেই সম্পাদকীয় সিংহাসনে বসাইবার বাদশাহী সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হইল। এই সকল মনস্তাত্ত্বিক সংবাদ তখন আমি কিছুই জানিতাম না, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ধরা দিলাম। পূর্ব-ইতিহাস পরে স্বয়ং ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছিলাম।

আমি না জানিলেও আমাকে মনোনয়ন সংবাদটা 'উপাসনা' আপিসে চাউর হইয়াছিল। সাবিত্রীপ্রসন্নের সহকারী তখন শ্রীকিরণকুমার রায়। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সৌখিন সাহিত্যিক, কিন্তু চাকুরি-জীবনে তাঁহার তুল্য দক্ষ নিষ্ঠাবান সহকারী সম্পাদক আমি আর দেখি নাই। তিনি পরিহাস করিয়া নিজেকে বলিতেন—শাশ্বত সহকারী সম্পাদক; বোঁটারূপে তাঁহার অবস্থান

চিরস্থায়ী, ফুলের অর্থাৎ সম্পাদকের পরিবর্তন বার বার ঘটিতে পারে। ঘটিয়াছিলও তাহাই, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পরে সজনীকান্ত দাস এবং তাহারও পরে বিজয়রত্ন মজুমদার 'উপাসনা'-'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হইয়াছিলেন ; কিন্তু ধ্রুবতারার মত কিরণকুমার রায়—কি. কু. রা. অটুট ও অটল ছিলেন। কিরণকুমার অসামান্য সাহিত্যরসবোধের অধিকারী ছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁহার 'আমার সাহিত্য-জীবনে' তাহার বহু নিদর্শন দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারই মধ্যস্থতায় আমি তারাশঙ্কর, শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রভৃতি সাহিত্যিকের ও শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ দত্তের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম।

'উপাসনা'র আপিস ও ছাপাখানা ভট্টাচার্য চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং-পরিচালিত বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঠিক দক্ষিণে ৫৬ ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। হেড আপিস ছিল ২৮নং পোলক স্ট্রীটে। হেড আপিসে কানাঘুষা উঠিতেই বোঁটা কিরণকুমার সরোজকুমার-সমভিব্যাহারে ফুলের পরীক্ষা লইতে আসিলেন। নিছক সাহিত্যপ্রসঙ্গে আলাপ হইল ; সরোজকুমারের মিঠা হাতের গল্পের আমি ভক্ত ছিলাম। কথায় কথায় জানা গেল, তিনিও বনফুল ও আমার মত ১৯১৮ সনের ম্যাট্রিকুলেট। অল্প আলাপেই বন্ধুত্বে পাক ধরিয়া দানা বাঁধিতে লাগিল। আলাপচারী করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন, কি বুঝিলেন জানি না ; আমি কিন্তু আসল রহস্যের বাহিরেই রহিয়া গেলাম।

এই কাহিনী আপাতত এখানেই স্থগিত রাখিয়া 'শনিবারের চিঠি'র প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। ১৩৩৮ সাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল। কেন চাহিল, আজ তাহার সঠিক জবাব দিতে পারিব না। হয়তো তাহার মনের আকাশে চকিতবিদ্যুৎরেখাবৎ পরিবর্তিত ভবিষ্যতের একটা আভাস

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিংবা হয়তো ক্লান্ত চরণে আরও পথ অতিক্রম করিবার দুঃসাধ্য সাধনায় একবার নিজের মনেই বোঝাপড়া করিয়া লইতেছিল। সেই আত্মগত চিন্তার স্বরূপ ছিল এই :

১৩৩৮ সাল শেষ হইল।

মহাত্মা গান্ধী জেলে বদ্ধ আছেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তীব্র দৃষ্টি আজ কারাগারের কঙ্করাস্তীর্ণ পথে পরিত্যক্ত পরশমণি খুঁজিতে ব্যস্ত—ভারতবর্ষে যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানার্হ বলিয়া জানিতাম, বিধানচন্দ্র রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যতীত তাঁহাদের আর সকলে লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কি? রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত এই সত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা প্রাতে চায়ের পেয়ালা এবং চুরুটের টিন লইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতেছি এবং কিছুক্ষণ এইভাবে দৃষ্টিবিনিময় করিতে করিতে হঠাৎ কেন জানি না উত্তেজিত হইয়া বলিতেছি—"দাদা গো, যাহা হইবার হইয়াছে, ভাবিয়া লাভ কি? তাহার চাইতে আইস একপাত্র খাওয়া যাক, অথবা চল 'নটীর পূজা' দেখিয়া আসি।" দৃষ্টি-বিনিময় বেশি হইলে মন আরও একটু উদার হয়। ফলে, মদের দোকান ও সিনেমা-হাউসগুলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বালাই লইয়া জলজল করিয়া জ্বলিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী জেলে, গতকল্য রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার বাংলা'র রবীন্দ্রনাথ, 'দেশ দেশ নন্দিত'-করা রবীন্দ্রনাথ, 'জনগণমন-অধিনায়ক' রবীন্দ্রনাথ এরোপ্লেনে চড়িয়া ভারতের বাণী শুনাইতে পারস্য যাত্রা করিলেন। অর্ধবস্ত্রপরিহিতা ভৈমী পথভ্রান্ত হইয়া একাকী অসহায় অবস্থায় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপ্রদেশে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে আর নিষাদপতি নল ঋতুপর্ণ রাজার সহিত বিমানচারী রথে চাপিয়া গান্ধার-রাজদুহিতার স্বয়ম্বর-সভায় বরমাল্যের লোভে যাত্রা করিয়াছেন—এরূপ ঘটনা যে মহাকাব্যের বিষয় হইত, রবীন্দ্রনাথের পারস্য-যাত্রার মধ্যে আমরা সেই মহাকাব্যিক মহিমা দেখিতে পাইলাম।

আর অকালবৃদ্ধ শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে'র জাবর কাটিতেছেন। শ্রীকান্তের সৌভাগ্য যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ আজ জীবিত নাই। দেখিতেছি, দরজিপাড়ার আমাদের সেই ঠুনঠুন

পেয়ালা' দাদাটি আজিও অধীর আগ্রহে মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করিতেছে বলিয়া শরৎচন্দ্র থামিতে পারিতেছেন না।

প্রবীণ প্রভাতকুমার লজ্জায় দেহরক্ষা করিয়াছেন; বাঁচিয়া আছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। তবু আছেন বলিয়া এখনও শুনিতে পাই—"বহু বাক্যব্যয় করা নিষ্ফল হতে পারে। কিন্তু বোবা হবার যে কোনও মাহাত্ম্য আছে, এ যুগে আমরা তা মানি নে। আর এ প্রবৃত্তি যে অমর, অন্তত বাংলা দেশে তার প্রমাণ বাংলায় নিত্য নতুন লেখক আবির্ভূত হচ্ছে।" অর্থাৎ যুগন্ধর প্রমথবাবু বলিতেছেন, বাংলা দেশে এটা 'টকি'র যুগ। 'সাইলেন্ট' যাঁহারা, তাঁহারা সরিয়া পড়িতেছেন।

সুতরাং বৎসরের শেষে আমরাও নিজেদের কথা কিছু বলিতেছি, যুগধর্মের কথা ভাবিয়া সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন।

ইহাই ছিল তৎকালীন পরিবেশ। 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্যের কথাও এইভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে:

সাহিত্যের নামে কিছুকাল যাবৎ যাহা শুরু হইয়াছে তাহাকে সাহিত্য বলিয়া গণ্য না করিলেই চলিত কিংবা ঠাট্টা তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট হইত—'শনিবারের চিঠি'র প্রথম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। কেবল সাহিত্য নয়, আধুনিক সমাজে যাহা কিছু মেকী ও মিথ্যা বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই লইয়া রঙ্গ করা তাহার অভিপ্রায় ছিল, এবং এই রকমের আমোদে নিজেদের খোশখেয়াল চরিতার্থ করিবার সুযোগ আমরা প্রথমে লইয়াছিলাম। কিন্তু সহসা সেই সময় সাহিত্যের আদর্শ লইয়া একটা বিতর্ক আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে দেখা গেল—যাহাকে সাহিত্যের ধূলাখেলা বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং সেই খেলায় ধূলামাটি কোনও রূপে গায়ে না লাগিলেই যথেষ্ট বলিয়া কোনও আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই, সেই ধূলাখেলায় প্রবীণ ব্যক্তিগণের যোগ আছে এবং তাহাকে তাঁহারা বর্তমান যুগের সাহিত্য-সাধনার নূতন ধারা বলিয়া তাহার জয় ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহাদের সৃষ্টিশক্তি দূরের কথা, রসবোধের পরিচয়ও কখনও পাই নাই, অথচ যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা বা সাহিত্যসমজদার বলিয়া পরিচিত হইতে চান, তাঁহারাই আপন আপন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা

আবেগ চরিতার্থ করিবার জন্য এই অপোগণ্ড সাহিত্যের ওকালতনামা গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম" লইয়া যে ব্যক্তিগত অভিমান ও ঈর্ষার স্রোত প্রবাহিত হইল, এবং তাহার ফলে যে পাঠক-সম্প্রদায় অতি অপথ্য গল্প ও উপন্যাস এতদিন গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করিতেছিল তাহাদের রুচিহীন ক্ষুধায় অতঃপর যে রুচিজ্ঞান সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা হইল, তাহাতে সাহিত্যের জন্য কোনও চিন্তার কারণ না থাকিলেও, পারিবারিক ও সামাজিক নীতির জন্য চিন্তিত হইবার কারণ ছিল। তথাপি এই রুচির সংশোধন 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য ছিল না। যে যুগে যাহা অনিবার্য তাহা ঘটিবেই—যে সকল কারণে সমাজে ও সাহিত্যে এই অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার নিরাকরণ কোনও পত্রিকার সাধ্যায়ত্ত নয়। ক্রমাগত কুপথ্য সেবন করিলে স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার প্রতিক্রিয়া আসিবে। এজন্য 'শনিবারের চিঠি' কোনও প্রকার সংস্কার-কর্মে ব্রতী হয় নাই। কিন্তু যে মিথ্যা নীতির প্রচার এই সকল তথাকথিত সাহিত্য-পণ্ডিতেরা সদম্ভে করিয়া চলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ—কোনও নীতির পক্ষ হইতে নয়—স্বভাবের নিয়মেই অপরিহার্য। 'শনিবারের চিঠি' সেই স্বভাবধর্মেরই অভিব্যক্তি। যাহা মিথ্যা বলিয়া জানি তাহাকে অচেতন জড়বৎ যাহারা সহ্য করিয়া থাকিতে প্রস্তুত নয়—তাহারাই 'শনিবারের চিঠি'র লেখক ও পরিচালক। সংস্কারমূলক গঠনকার্য নয়, একটা বলিষ্ঠ ও প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদই এই আশাহীন কর্মের উদ্যমস্বরূপ তাহাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

আশ্চর্য এই যে, এই সুগভীর আত্মচিন্তাজনিত স্বগতোক্তির অব্যবহিত পরেই উদ্দেশ্য-বদলের আভাস দেখা যাইতে লাগিল, প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদেই আর সে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল না। সংস্কার-মূলক গঠনকার্য না হউক, সৃষ্টিধর্মী গঠনকার্যের দিকে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। যাঁহারা কোদালকুড়ুলধারী ভাঙনের মজুর ছিলেন, তাঁহারা হাঁকডাক পাড়িয়া গড়নের মজুরদের আহ্বান জানাইলেন। কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমির উপরেই নূতন ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল। কারবালার মরুভূমির উপর

প্রতিষ্ঠিত ৩২।৫।১ বীডন স্ট্রীটের বিশুষ্ক আবহাওয়া রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের সমান্তরাল ভাবে নিত্য-প্রবহমান খালের শীকরকণাস্পর্শে সরস হইতে বিলম্ব হইল না। অন্তরালবর্তিনী মা গুরু-শিষ্যের মধ্যবর্তিনী হইয়া আগাইয়া আসিলেন। দুস্তর ব্যবধানের উপর ক্ষীণ হইলেও মিলনের সেতু রচিত হইল।

পারস্যভ্রমণ শেষে ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ (৩ জুন, ১৯৩২) কবি দেশে ফিরিলেন। কলিকাতার অনতিদূরে বৈষ্ণবতীর্থভূমি শ্রীপাট খড়দহে গঙ্গার ঠিক গা-ঘেঁষিয়া নির্মিত একটি প্রাসাদে তিনি কয়েক-দিন অবস্থান করিলেন। ছেলের উপর মায়ের হুকুম হইল, কবিকে লেখা একটি জরুরী চিঠি লইয়া খড়দহ যাইতে হইবে।

মুশকিলে পড়িলাম। জয়ন্তীর পর হইতে কয়েক সংখ্যা ধরিয়া কবিগুরুর মুণ্ডপাত করিয়া হাতের সুখ করিতেছিলাম, হঠাৎ এ কী নিদারুণ আদেশ! 'না' বলিবার উপায় ছিল না, মা পুত্রবধূ মারফত হুকুম জারি করেন; সুধারাণীর নিকট প্রেরিত তাঁহার চিরকুটগুলির মর্যাদা প্রায় বাদশাহী পাঞ্জার সমান। সুতরাং যাইতে হইল। খড়দহে তখন মোহিতলালের এক সাহিত্যরসিক বন্ধু থাকিতেন, মোহিতবাবুর দৌলতে তাঁহার সহিত আলাপও হইয়াছিল। তিনি বাঙালীর 'বেঙ্গলিটি'র বড় পাণ্ডা ছিলেন। ভোরে রওয়ানা হইয়া প্রথমে তাঁহার গৃহেই দর্শন দিলাম। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা পাকা করিয়া গৃহস্বামীর এক বিদুষী কন্যা সমভিব্যাহারে কবি-সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম, ইচ্ছা ছিল সঙ্গিনীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া দিয়া কোনও প্রকারে সঙ্কোচ ও লজ্জার দায় এড়াইব। সংবাদ মিলিল, কবি দ্বিতলে আছেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ভূ-তলে দ্বার রক্ষা করিতেছেন; তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই। রথীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোনিবেশসহকারে এক খণ্ড মসৃণ চামড়ার উপরে একটি লৌহশলাকার সাহায্যে ফুল তুলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলাম, সেই চাহনিতেই

ভড়কাইয়া গিয়া আমার সঙ্গিনী অন্তর্ধান হইতেছেন। তখন আর উপায় নাই। বসিয়াই রহিলাম। রথীন্দ্রনাথ খুব ধীর ও শান্ত কণ্ঠে ছোট্ট একটি প্রশ্নের চিমটি কাটিলেন—কি, খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন? আমার 'শনিবারের চিঠি'র মেজাজ সঙ্গে সঙ্গেই চাড়া দিয়া উঠিল; বলিয়া ফেলিলাম, আজ্ঞে, তার জন্যে এত কষ্ট ক'রে এতখানি পথ আসবার দরকার ছিল না, আপনাদের সব খবর বাজারেই পাওয়া যায়। শর-নিক্ষেপ করিয়াই লজ্জা হইল, শান্ত কণ্ঠেই বলিলাম, দেখুন, আমি দূত, সুতরাং অবধ্য। রথীন্দ্রনাথের মুখে মৃদু প্রসন্ন হাসি দেখা দিল, বলিলেন, উপরে খবর গেছে, আপনি বসুন। অনতিবিলম্বে সংবাদবাহী ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া কবি-সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম সারিয়া তাঁহার হাতে হেমন্তবালা দেবীর পত্রখানি দিলাম। নতমুখ নীরব রবীন্দ্রনাথ যেন একটা অবলম্বন পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

হঠাৎ-অপ্রসন্নতার ধাক্কা কাটাইয়া কবি যখন কথা আরম্ভ করিলেন, প্রথমে মনে হইল—তিনি একা বসিয়া স্বগতোক্তি করিতেছেন। তিনি যেখানে পূর্বমুখী হইয়া বসিয়া ছিলেন তাহার পিছনেই একটি জানালা, সেই জানালা-পথে গঙ্গার আবিল গৈরিক জলধারা চোখে পড়িতেছিল। শীর্ণকায়া নদীর ভীমামূর্তি দেখিয়া আমার মুখে-চোখে বিস্ময় ফুটিয়া থাকিবে। তিনি বলিলেন, এই নদীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ-নাড়ীর যোগ, আমি গঙ্গার সন্তান। এই গঙ্গা যেখানে পদ্মা হয়েছে, সেখান থেকে দক্ষিণে পাবনা পর্যন্ত এক সময় আমার বিচরণক্ষেত্র ছিল। একটু এগিয়ে এসে নীচে চেয়ে দেখ আমার সে যুগের বিশ্বস্ত বাহন 'পদ্মা'র সংস্কার হচ্ছে। ওই 'পদ্মা'য় আমি দীর্ঘকাল বাস করেছি, ওকে আমি ভালবাসি, তাই ছাড়তে পারি নে। ও জীবনভোর অনেক খেটেছে, ওকে ছুটি দেওয়াই উচিত ছিল।

পরে শ্রীহরিহর শেঠের যত্নে ও আহ্বানে চন্দননগরে যেবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাঁহাকে ওই পুনঃসংস্কৃত 'পদ্মা'-বোটেই অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। খড়দহের সেই 'গঙ্গার সন্তান' কথাটি স্মরণ করিয়াই তখন আমি আমার 'পঁচিশে বৈশাখে'র "গাঙ্গেয়" কবিতাটি লিখিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়া চলিলেন, আমি সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতুম। মাঝ-পদ্মায় কখন যে বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব তা নিজেও জানতুম না। পুরোনো মাঝি-মাল্লারা আমার মুখচোখের চেহারা দেখে টের পেত, ডিঙি নিয়ে তৈরি থাকত তারা। যতক্ষণ দম থাকত মাথা তুলতুম না, শরীর অবশ হয়ে এলিয়ে এলে একটা হাত বাড়িয়ে দিতুম জলের ওপরে, মাঝিরা তৎপরতার সঙ্গে এসে আমাকে ডিঙিতে তুলে নিত। এই ছিল আমার দৈনন্দিন খেলা, সর্বনেশে খেলা, কি বল ? ডুবে যে কেন যাই নি আজও তাই ভাবি, ওই মাঝি-মাল্লাদের দয়াতেই।

পর পর এমনি অনেক গল্প। প্রায় দুই ঘণ্টা মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছিলাম ; সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে একটিও কথা হয় নাই। ওই দিনই বলিয়াছিলেন, আমি খুব ভোগী—লোকের এমন একটা ধারণা আছে। কথাটা সত্যি নয়। ছেলেবেলা থেকে যে ভাবে আমরা মানুষ হয়েছিলুম তাতে ভোগের স্থান ছিল না। আমার মতন কৃচ্ছ্রসাধনও বুঝি কেউ করে নি। দিনের পর দিন শুধু মুগের ডালের সুরুয়া খেয়ে কাটিয়েছি। সে সময় ছোটগল্প আর কবিতার বান ডেকেছিল আমার মনে।

রথীন্দ্রনাথ নীচে হইতে খবর পাঠাইলেন, কবির স্নানাহারের সময় হইয়াছে। আমি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সম্ভবত তিনি সেই দিন প্রথম আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, হেমন্তবালার লেখার শক্তি অসাধারণ, ভাষা সাবলীল, আর্টিস্টের ডিট্যাচমেণ্ট (নির্লিপ্ততা) যদি ও লেখায় আনতে পারে স্থায়ী নাম রাখতে পারবে।

শরতের মেঘের মত হালকা মনে প্রসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরিলাম। এই সাক্ষাতের মধ্যে অপূর্ব বা অসাধারণ কিছুই ছিল না, অথচ আমি দূরবিসর্পিত নূতন পথের সন্ধান পাইলাম।

মোহিতলাল তখন প্রত্যেক মাসের প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপর নির্মমভাবে ছুরি চালাইতেছিলেন। আমারও তাহাতে সায় ছিল, কিন্তু আমার মতির পরিবর্তন হইতে লাগিল। রবীন্দ্র-প্রশংসিত হেমন্তবালা দেবীর লেখা সংগ্রহ করিয়া যে মাসে ছাপিতে আরম্ভ করিলাম (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯), সেই মাসেই অকস্মাৎ ভট্টাচার্য চৌধুরী কোম্পানির ডাক আসিল। সত্যবাণী দেবী এই বেনামে মাসীমার লেখা পর পর ছাপা হইতে লাগিল—'শনিবারের চিঠি'তে সমাজ ও ধর্ম-বিষয়ক নূতন সুর যোজিত হইল।

পূর্বেই বলিয়াছি, আসল পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল রবি মৈত্রের ও আমার লেখায়। রবি তাঁহার সমস্যামূলক সামাজিক উপন্যাস 'ঘৃতকুম্ভ' রচনায় হাত দিলেন, জ্যৈষ্ঠ হইতেই তাহা ধারাবাহিক ভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হইতে লাগিল। আমিও ওই মাসে "টুকরি"তে ভরিয়া গালাগালিনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পাঁচমিশালী মাল সরবরাহ করিলাম। বৈশাখের "টুকরি"র ধরন জ্যৈষ্ঠেই আমূল বদলাইয়া গেল। এইখানেই আমার কাব্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত। কৈফিয়ৎ ছিল এই :

গোবর নহেক, হে সখি, আমার
কাব্য-বাঁশের টুকুরিটায়,
ছন্দ আমার আজিও কেন যে
চলিতে মিলের হুমড়ি খায়।
অনেক কষ্টে রাশটা আলগা করি,
চোখে দেখি নাকো কি যে টুকরিতে ভরি—
মনের নদীতে চলিছে ডুবিছে তরী,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়িছে বসিছে
ঘুঘু চরিতেছে মন-ভিটায়।

তারি দু-একটা টুকরি-ছন্দে
ভরিতেছি সখি, টুকরিটায়।

জ্যৈষ্ঠের (১৩৩৯) ‘শনিবারের চিঠি’ হইতেই আমার এই মনের যাত্রাবদলের কয়েকটি নমুনা দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। এই টুকরা-কবিতাগুলি আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ‘আত্মস্মৃতি’তে মোড় ফিরিবার প্রমাণ হিসাবে দাখিল করিলে খুব অন্যায় হইবে না :

উমা

মামার বাড়িতে গিয়াছিল উমা, ফিরিয়া আসিয়া কহে,
সবাই সেখানে রহিয়াছে বাবা, তুমি কেন সেথা নাই ?
কথা যাই হোক, ভাবটা তাহার এই—
দুই বৎসর পূর্ণ হয় নি আজো।
কি জবাব দেব, ভাবিয়া হইনু সারা।
চুপ ক’রে থেকে কহিলাম আমি শেষে—
সেথা যদি থাকি, উমারে আমার আনিতে যাইবে কেবা ?

খোকন

পাশের মাঠেতে ডন-বৈঠক করে
পাড়ার যতেক মাসেল-লোলুপ ছেলে।
প্রাচীরের গায়ে পাহাড়প্রমাণ কাঠ
তারি ধোয়াজল বর্ষার ভরে মাঠ,
জল নহে যেন লাল রক্তের ধারা।
খোকা কহে, আজ ডন নয় বাবা, রক্তে করিব স্নান—
আকাশে চাহিয়া বলি তারে চুপি চুপি—
এখনো সময় হয় নি খোকন, ঘোচে নি সর্দি-ভয়।

বড় হ’লে

আমি বড় হ’লে, তুমি মোরে বাবা কেমন লইবে কোলে ?
—কঠিন প্রশ্ন, সহজ জবাব তার,

কোলে তুলে নিয়ে, চুমু খেয়ে মুখে, কহিলাম খোকনেরে—
তুমি বড় হ'লে আমিও যে বড় হব।
যাঃ!—বলিয়া খোকা কোল হতে নেমে গিয়ে
দ্বিধা-বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, তাই যদি হবে বাবা,
ঠাকুরদা কেন নেয় না তোমায় কোলে?
মনে মনে নেয় হয়তো—খোকাকে কহিলাম মনে মনে,
মন হতে তবু গেল নাকো সংশয়।

পুতুল

উমার বিষম ভাবনা হয়েছে মনে,
কাঠের ছেলেটি দু দিন খায় নি মাই—
বুকে নিয়ে তারে, ঘোরে পাগলের মত,
যারে দেখে তারে বলে, এরে মাই দাও।
এগারোটা যেই বাজে—
কাঠের পুতুল উঠানে ফেলিয়া উমা মার কাছে গিয়ে—
দু বাহু বাড়ায়ে, 'মা' ব'লে কাঁদিয়া উঠে
বুকের বসন টানিয়া মুখটি বুকেতে লুকাতে চাহে।
আমি ভাবি শুধু উমার মায়ের কথা,
উমারে ফেলিয়া সেও কি কখনো খুঁজিবে মায়েরে তার!

অপু

অপু ও অপর্ণায়—
একের সৃষ্টি যেন অপরের লাগি।
কোথা লীলা তবু তাই ভেবে কাঁদে কেন যে অপুর মন,
রাণুদিদি গাঁয়ে ঘাটে জল নিতে চলে।
মামার বাড়িতে অনাদরে তার কাজলের চোখে জল—
এ দুর্ভাবনা নহে তো অপর্ণার।
সে আজো কোথায় ব'সে আছে পথ চেয়ে,
অপু চ'লে গেছে অকারণ রাগ করি।

কাঁদিবার লাগি থাকে নাকো সংসারে,
বাঁচিবার লাগি আসে না অপর্ণারা।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরেতে ঢুকেই রাসমোহনেরে* ডাকে,
—ধোঁয়ানো গরম একটি পেয়ালা চা—
সিগারেট তার পরে হয় ভাল, না হ'লে বিড়িই সই।
তারো পরে নহে কলিকাতা দমদম।
বারাকপুরের বনে,
ঘেঁটুর গন্ধে বায়ু হ'ল মন্থর;
থরে-থরে-ফোটা ওড়্‌কলমির ফুল,
ঝাঁকে-ঝাঁকে-ওড়া নামহীন কত পাখী;
মাছরাঙা-বসা রেল-লাইনের তার—
তারো পরে ফিজি, দিয়াছেন কথা পণ্ডিতজী† তো কবে,
হিন্দী একটু শিখিয়া নিলেই হবে—
জেনেছে সেথায় গাছেদের কিবা নাম।

বাস্তব

থরে থরে মেঘ জমেছে আকাশ-কোলে,
রহিয়া রহিয়া গুরু গরজায় বাজ,
বিদ্যুৎ-অসি চকিতে ঝলসি উঠে,
দূর বনচূড়া সাজে অপরূপ সাজে।
বস্তি-মালিক কবিতা-লিখন-রত,
উড়ো উড়ো চুলে লাগিছে জলের গুঁড়া—
তেতলার ঘরে বউ শুয়ে এক পাশে,
'আহা' 'উহু' করে, আর পড়ে 'গৃহদাহ'।

---

* 'শনিবারের চিঠি' আপিসের বেয়ারা।

† পণ্ডিত বাণারসী দাস চতুর্বেদী বিভূতিভূষণকে কথা দিয়াছিলেন, ফিজি লইয়া যাইবেন।

নীচে বস্তির চালে চালে খোলা কখন সরিয়া গেছে,
মেঝে ছাপাইয়া ছুটিছে জলের ধারা।
কোনো ঘরে কারো তিন বছরের শিশু
ধুঁকিছে, হয়েছে ডবল নিউমোনিয়া।
বুকে নিয়ে শিশু, চাল-ফুটো জল হইতে বাঁচাতে তায়
জননী এখানে ওখানে সরিয়া বসে—
রেডিওতে চলে গান—
রবি ঠাকুরের 'বর্ষারাতের শেষে'।

অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসিত রোগীকে হাতে লইয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যেমন সর্বাগ্রে গন্ধক-প্রয়োগে পূর্ব পদ্ধতির ঔষধের বিষক্রিয়া দূর করেন আমার তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-কবিতার প্রতিষেধক হিসাবে এই "টুকরি"-কবিতাগুলি ঠিক সেইরূপ কাজ করিল। দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের বিষাক্ত আবেষ্টনী হইতে মনের এই ছন্দোবদ্ধ সহজ সরল প্রকাশ আমাকে মুক্তির পথ দেখাইল।

ষোড়শ অধ্যায়

"কে জাগে ?"

আমার স্মৃতিকথায় বন্ধুবর ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়ের প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ১৯এ পৌষ ১৩৬১ (৪. ১. ৫৫) তাঁহার ইহলৌকিক জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। যে বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখন এইরূপ দুর্ঘটনা অনিবার্য; জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গীরা একত্রে পথ চলিতে চলিতে একে একে বিদায় লইবেন, হতভাগ্যতম যাত্রীকে একেলা মহাপ্রস্থানের পথে চলিতে হইবে—ইহাই ভবিতব্য। যাঁহাদের সহিত সাহিত্য-যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পথেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনা এই যে, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রত্যেকেই কীর্তিমান হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, আমার ব্যক্তিগত শোক সমগ্র বাঙালী জাতির শোকের দ্বারা লঘু হইয়াছে। কিন্তু বিরিঞ্চিবিলাসের ক্ষেত্রে সে সান্ত্বনা নাই, তিনি আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য সহযাত্রী হইলেও সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই, তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ একা আমাকেই বহন করিতে হইতেছে। বিমল দাশগুপ্তের বেলাতেও প্রায় তাহাই ঘটিয়াছে।

দুরূহ দুর্গম পথে চলিতে চলিতে মানুষ স্বতঃই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে। সহযাত্রীরা স্বস্ব পথ রচনার তাগিদে তৎপর হয়। মানুষ তখন নিজের পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতেই চলে। আমিও তাই চলিতেছিলাম। যাত্রার প্রারম্ভে ক্ষুধিত মন চারিদিক হইতে রসদ সংগ্রহ করিতেছিল; যে সকল মহাজনের চিন্তা ও সাহিত্য-রসে পুষ্ট হইতেছিলাম, আমার লক্ষ্যপথে তাঁহারাই খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছিলেন। বেড়াটাই মুখ্য ছিল, গাছটা গৌণ। তাহার পর

গাছ কখন বড় হইয়াছে, চরম পরিণতির দিকে শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারণ করিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে নিজেই তাহা জানিতে পারে নাই; সংরক্ষণী বেড়ার কথা আর তাহার মনেও নাই। অবোধ গাছ আপন মহিমাতেই মুগ্ধ। নানা দিগ্‌দেশ হইতে পক্ষিকুলকে আহ্বান জানাইতেই সে ব্যগ্র। আত্মপরিণতির চিন্তা-লেশহীন ঔদ্ধত্য হয়তো তাহার শালীনতা ও বিবেচনা-বুদ্ধি খণ্ডিত করিয়া তাহাকে আত্মসর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে।

১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠের "টুকরি"ই আষাঢ়ে "পান্থ-পাদপ" হইয়া দেখা দিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে হিমালয় কল্পনা করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহার পরে ইহা আমার নবকাব্য-অভিযানের দ্বিতীয় ফসল, 'রাজহংসে'র অন্তর্ভুক্ত। আমার একমেবাদ্বিতীয়ম্ মুদ্রিত উপন্যাস 'অজয়ে'র নায়ক যে কয়জন নারীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, পান্থপাদপ তাঁহারাই; তাঁহাদের সহিত আরও কয়েকজন যুক্ত হইয়াছেন, সকলেই নিষিদ্ধ নাটকের অভিনেত্রী, শুধু একজন ছাড়া, যাঁহার সম্পর্কে মন্ত্রের সমর্থন আছে। নায়ক বলিতেছেন:

ফেল ক'রে ক'রে করিলাম বি. এ. পাস,
তারি কল্যাণে জীবন-যাত্রা আজো করি নির্বাহ,
আপনার ভুলে বাহিরের বিষে জর্জর হয়ে ফিরি,
স্নেহ-সুধারসে নূতন জীবন লভি।
আকাশের মেঘ নহে এ তো, নহে মেঘেতে বিজলি-রেখা,
পদ্মাও নহে, নহে কাঞ্চননদী,
হিমালয় নহে, সাগরের তটে ওঠে আর ভাঙে ঢেউ,
নহে ঝড়, নহে অবিরল জলধার।
ঘন অরণ্য নহে এর পটভূমি,
এ নহে কো ধু-ধু মরুময় প্রান্তর—
চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ-দীপ নহে।
যে গাঁয়ে আমার বহু পুরুষের ভিটা,

যেথায় একদা হঠাৎ আসিয়া বিস্ময়ে আঁখি মেলি
বিচিত্র এই ধরণীর পেনু অপরূপ পরিচয়,
সে গাঁয়ের সে যে অতি-পরিচিত ছায়া-সুশীতল দীঘি,
কূলে কূলে ভরা কাকের চক্ষু জল।
তীরের বাতাস বনফুলে মধুময়,
অসীম-যাত্রী পথিক-পাখীর পাতা-ছাওয়া নীড়খানি।
বাহির-বিশ্বে ঝড়ে আর জলধারে—
হিমালয়-চূড়ে, উত্তাল-ঢেউ অসীম সাগর-বুকে,
মেঘ-বিদ্যুতে বিচিত্র ওই অগাধ শূন্য মাঝে—
বহুবল্লভী পতঙ্গ মন, খুঁজে ফিরে বিস্ময়;
বিস্ময় যবে টুটে, মনখানি ভ'রে যায় অবসাদে—
আতপতপ্ত ধূলিধূসরিত ঘামে ভিজে ওঠে মন,
শীতল দীঘিতে ডুবিয়া শীতল হই,
পাতা-ছাওয়া নীড়ে যাপি কালো নিশীথিনী।
গ্রামের কুটীরে স্তিমিত প্রদীপখানি—
সন্ধ্যা জ্বালায়, স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত করে মন।
কিছু নাই বিস্ময়?
কে জানিত এই গাঁয়ের দীঘিতে এতখানি বিস্ময়!
বহু বিচিত্র পসরা লইয়া নিথর সরসী-বুকে
একটি একটি করিয়া নয়ন মেলে শিশু-শতদল,
পাতা-ছাওয়া নীড়ে শাবক-কাকলি শুনি,
স্তিমিত প্রদীপে স্নেহরস তারা ঢালে।
অবাক হইয়া রহি—
নিরুদ্দেশের যাত্রী পথিক, যাত্রা ভুলিল তার।

কিন্তু যাত্রা-ভোলা পথিকের কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। আরও আছে এবং সেই আরোর মধ্যেই তাঁহার কবি-জীবনের আসল রহস্য নিহিত আছে। তিনি উপসংহারে বলিতেছেন:

তোমরা সবাই সত্য আমার অঙ্কের ইতিহাসে,
সবাই মিথ্যা ছায়াছবি পরদায়—

অনাদি অসীম যাত্রা আমার তার ইতিহাস নাই।
মরুপথে যেবা চলিতেছে সখী, মরীচিকা গুনে গুনে
প্রহর গনিয়া চলা কি তাহার সাজে ?
আঁধি আসে আর আঁধি স'রে স'রে যায়—
ধু-ধু মরুভূমি প'ড়ে থাকে সীমাহীন।
তোমরা এসেছ, তোমরা গিয়েছ স'রে,
একে একে সখী, সব ছায়া রোদ হবে,
সব আঁধি পিছে পথের মতন পিছনে রহিবে প'ড়ে।
জননীর কোল হতে যে নেমেছে ভূঁয়ে,
প্রিয়ার আঁচল বাঁধে তারে কত দিন!
চির-পথিকের অজানা যাত্রাপথে
তোমরা, হে সখী, ছায়া-সুশীতল পাদপ হইতে পার,
আঁধার মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছ।
আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশি কিছু নহে,
আমি তোমাদের নহি—
চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

এইবার আসল কাহিনীতে আসা যাক। পোলক স্ট্রীটের মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের হেড আপিসে আমার সম্পূর্ণ অগোচরে আমাকে হত্যা অথবা হজম করিবার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, কিরণকুমার এবং সরোজকুমারের আগমন যে তাহারই ফাতনা-আন্দোলন তাহা বুঝিতে পারিলাম আসল ছিপটি যখন দৃষ্টিগোচর হইল। নানা বৈষয়িক বৈগুণ্যের ফলে ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া সদ্য-সমাগত শীত-শিহরিত অগ্রহায়ণের (১৩৩৯) এক প্রভাতে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের কম্পোজ-ঘরের টুলে একা বসিয়া প্রাতরাশ হিসাবে মুড়ি ভক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের হাঁকডাক শুনিলাম।—চির-হৈহৈ-বিলাসী শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

মহাশয়ের পুরুষোচিত উচ্চকণ্ঠে "সজনী" আহ্বান শুনিয়া একটু চমকিত হইলাম বইকি। নলিনাক্ষ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু, প্রবাসী আপিসেই তাঁহার সহিত আলাপ সম্বোধনের মধ্যপর্যায়ে নামিয়াছিল। আমার আহ্বানে ঘরে ঢুকিয়াই তিনি হরফ-কেসের উপর রক্ষিত সান্‌কি হইতে এক খাবলা মুড়ি লইয়া মুখে দিতে দিতে প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলিলেন, জামা গায়ে দিয়ে এস, আমার সঙ্গে যেতে হবে। কোথায় এবং কেন, প্রশ্ন করিবার দিন আমার তখনও আসে নাই। যে ভাবে কিছুদিন পূর্বে বিরিঞ্চিবিলাসের অনুগমন করিয়াছিলাম, ঠিক সেইভাবেই নলিনাক্ষের অনুগমন করিয়া সদর রাস্তায় আসিলাম। একখানি সুবৃহৎ মোটরকার অপেক্ষা করিতেছিল, নলিনাক্ষের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া যেখানে নীত হইলাম সেটা পোলক স্ট্রীট—এবং পোলক স্ট্রীটের ২৮ নম্বর বাড়ি। বহু খণ্ডপ্রতিষ্ঠান-নদীর মিলন-সমুদ্ররূপ সেই আটাশ নম্বরের এক সুবৃহৎ এবং সুসজ্জিত কক্ষে অনন্তনাগশয্যায় নারায়ণের মত সকল শাখা-প্রতিষ্ঠানের প্রায় সর্বময় কর্তা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় সগৌরবে আসীন ছিলেন, বঙ্গলক্ষ্মী যে অলক্ষ্যে তখন তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন তাহাও অনুভব করিলাম। তখন মহামতি হিটলারের সম্যক প্রাদুর্ভাব ঘটে নাই, ঘটিলে হিটলারের কথাই মনে হইত। কদমছাঁটে মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া কাটা, মুখের মধ্যে শঙ্করাচার্যের এবং নীরোর মুখভাবের একটা সমন্বয় যেন চকিতে নজরে পড়িল। আমাকে দেখিয়াই ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া একটা সিগারেট-কেস খুলিলেন। লক্ষ্য করিলাম সিগারেটগুলি দুই ভাগে কর্তিত হইয়া কেসে অবস্থান করিতেছে। তাহারই একটি তুলিয়া মুখে লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন, 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গ" আমি লিখি কি না। সংক্ষেপে জবাব দিলাম, আগে লিখিতাম, এখন লিখি না। গত ২৬এ চৈত্রের

কাগজের কথা তোলাতে বলিলাম, "বঙ্কিমপ্রসঙ্গ" আমারই লেখা। ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ একেবারে সরাসরি কাজের কথা পাড়িলেন। 'উপাসনা' পত্রিকাকে তিনি ঢালিয়া সাজিতে চান, আমি সম্পাদক হইতে রাজী আছি কি না। ইতস্তত না করিয়া বলিলাম, রাজী আছি। তবে সঙ্কোচের সঙ্গে সাবিত্রীবাবুর চাকরির কথাও উল্লেখ করিলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় আশ্বাস দিলেন, সে বিষয়ে চিন্তার কারণ নাই। আমাকে 'উপাসনা' সম্পাদনা ও পরিচালনার আনুমানিক ব্যয়সহ একটি খসড়া প্রস্তুত করিতে বলা হইল, এবং আরও বলা হইল যে, পত্রিকার নাম, সহকারী নিয়োগ, লেখক ও চিত্রশিল্পীদের দক্ষিণা ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা আমার থাকিবে। সেদিন ছিল পয়লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার। আমি সাত দিনের সময় প্রার্থনা করিলাম।

একটি দুই পয়সার একসারসাইজ বুকে প্রায় খেলাচ্ছলে কবি-জনোচিত একটি পরিকল্পনা রচনা করিলাম;—খেলাচ্ছলে, কারণ তাহা যে গৃহীত হইবে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। মুমূর্ষু রোগীও শয়ন উপবেশন ঔষধপথ্যসেবন ব্যাপারে স্বাধীনতা চায়; মৃত্যু-পথযাত্রী আমারও অবাধ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে দ্বিধা হইতেছিল। চাকরিটা যাহাতে না হয় পরিকল্পনায় তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। 'উপাসনা' নাম বদলাইয়া খসড়ায় নাম দিলাম 'বঙ্গশ্রী,' নিজের বেতন ধরিলাম মাসিক তিন শত টাকা। লেখকদের দক্ষিণা ধরিলাম 'প্রবাসী'র আকারের কলম-পিছু দুই টাকা, বড় ও ছোট-ভেদে কবিতা পাঁচ টাকা ও দুই টাকা; ত্রিবর্ণ চিত্রের দশ, একবর্ণ চিত্রের পাঁচ এবং কার্টুন ছবির জন্য দুই টাকা করিয়া ধার্য করিলাম। 'প্রবাসী'র অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব কাজে লাগাইলাম।

সাত দিনের দিন অর্থাৎ ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নবেম্বর, ১৯৩২) বখাটে ছোকরার কলেজ যাওয়ার ভঙ্গিতে একসারসাইজ বুক হাতে প্রায় শিস দিতে দিতে ২৮নং পোলক স্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম।

যাওয়া মাত্র ডাক পড়িল। আমি খাতাখানি ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাতে গছাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একটা সিগারেট ধরাইব কি না। নলিনাক্ষ সান্যালের উপস্থিতি বাধা দিল। চুপ করিয়া বসিয়া সামান্য শীত সত্ত্বেও ঘামিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, শুনেছি আপনার খরচের হাতটা একটু বড়, অনেক দেনাও আছে। চমকাইয়া উঠিলাম, ভয় হইল, চর লাগান নাই তো? আমার ভয় যে মিথ্যা নয়, পরে প্রমাণিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সিক্রেট সার্ভিস বিভাগ খুব দক্ষ ছিল। ভোলানাথ দত্ত অ্যাণ্ড সন্স, প্রবাসী আপিস ও স্বয়ং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁহারা ধাওয়া করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমাকে চমকাইতে দেখিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ের চাঁচাছোলা মুখে একটু হাসি দেখা দিল, বলিলেন, আপনার মাইনে যদিও মাসে তিন শো টাকাই গ্রাহ্য হ'ল, আপনাকে এখন দু শো টাকার বেশি দেওয়া হবে না। এক শো টাকা ক'রে জমা থাকবে। আপনারই কাজে লাগবে। আপনার খসড়ার অন্যান্য বিষয়ে আমি রাজী। আপনি একটু ব'সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে যান।

আমার কিছু বলিবার বা করিবার শক্তি ছিল না। এ কি হইল? ঘুঁটি কাঁচাইবার সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত সচিব প্রবোধবাবু দুইখানি টাইপ-করা কাগজ আমার সামনে ধরিলেন। দেখিলাম, পরদিন ২৪এ নবেম্বর হইতে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে শ্রীসজনীকান্ত দাস 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; ৫৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে তাঁহাকে বসিতে হইবে। বাড়তি এক শত টাকার উল্লেখ কাগজে কলমে কোথাও ছিল না। সেটা মুখের কথাই থাকিল।

একটা অত্যাশ্চর্য যোগাযোগের কথা বলি। আমার ডায়েরিতে দেখিতেছি, নিয়োগপত্র হাতে পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ অব্যবস্থিতচিত্ত

হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, আমার সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতাকে আমি টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। সরাসরি বাড়ি ফিরিতে পারি নাই, কোনও বন্ধুর সঙ্গও কামনা করি নাই। পকেটে কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, সন্নিকটবর্তী ব্ল্যাকবার্ন লেনের চীনা হোটেল ন্যানকিংয়ে তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রাত্রি দশটা নাগাদ উটরাম-ঘাটের জেটিতে গিয়া বসিলাম। কৃষ্ণপক্ষের নবমী সেদিন।

> সে কি রাত্রি! সে কি অন্ধকার!
>
> মনে হয়েছিল এ রাত্রি কোন কালে শেষ হবে না। অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব যেন অনুভব করেছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে ছিলাম, সীমাহীন অনন্ত আকাশ যেন রাত্রির সঙ্গে নেমে এসেছিল আমার চারিদিকে। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাহত আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই; অসীম অনন্ত অন্ধকার অকূলের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি।

আমার ডায়েরি হইতে এ উদ্ধৃতি নয়, যদিও সেই রাত্রে ঠিক ইহাই আমার মনের কথা ছিল। উপরের উদ্ধৃতি তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবন' হইতে; ওই একই দিনে একই সময়ে আরও মর্মান্তিক, আরও গভীরতর কারণে তিনি দিশাহারা হইয়াছিলেন—প্রিয় কন্যা বুলুর আকস্মিক বিয়োগে। তিনি লিখিয়াছিলেন:

> বুলু মারা গেল ৭ই অগ্রহায়ণ রাত্রে। রাত্রি দশটায়। পরের দিন সূর্য উঠল। আলো হ'ল। কিন্তু আমার তখন অধীর অস্থির অবস্থা। মনে হচ্ছে পালিয়ে যাই। কোথায় যাই!···দ্বিতীয় দিন সকালে উঠেই কাজ আছে ব'লে কলকাতা চ'লে এলাম। হাওড়ায় যখন পৌঁছুলাম তখন যেন জ্বর আসছে মনে হ'ল। স্টেশন থেকে এসে উঠলাম 'উপাসনা' আপিসে ধর্মতলা স্ট্রীটে। এসে দেখি, অভাবনীয় ব্যাপার। 'উপাসনা' উঠে যাচ্ছে। সাবিত্রীপ্রসন্ন বিদায় নিচ্ছেন। 'উপাসনা'র স্থানে 'বঙ্গশ্রী' প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সজনীকান্ত দাস আসর জাঁকিয়ে বসেছেন।

২৪এ নবেম্বর অর্থাৎ ৮ই অগ্রহায়ণ আমি নূতন চাকরিতে যোগ দিই। উপরের ঘটনা ২৫এ নবেম্বরের। আমার তখন সেখানে সসেমিরা অবস্থা, মোটেই আসর জাঁকাইয়া বসি নাই। স্বাধীনতার বিয়োগে আমিও মুহ্যমান, পালাই-পালাই করিতেছিলাম। অথচ পলায়নের পথ যে রুদ্ধ, মোটেই তাহা নহে। আমার নিজের দোষে সাময়িকভাবে আর্থিক বিপর্যয় ঘটিলেও সহৃদয় বন্ধুদের সহায়তায় তাল প্রায় সামলাইয়া লইয়াছি। 'শনিবারের চিঠি'র যশ ও আয় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে। একটু চেষ্টা করিলেই তাহাকে তরণী করিয়া জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া কঠিন হইত না। সাবিত্রীপ্রসন্নও 'উপাসনা'তে "শনি-মণ্ডল" সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন :

> 'শনিবারের চিঠি'র যাঁহারা লেখক এবং উৎসাহদাতা তাঁহাদের লইয়া রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস ইহার মধুচক্র, তাঁহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া ফেরেন শ্রীযোগানন্দ দাস, শ্রীপ্রমথনাথ রায়, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, ডাঃ সুশীল দে, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইহার পৃষ্ঠপোষক। বেতারে ইঁহাদের কার্যাবলী মাঝে মাঝে শোনা যায় ইহা সকলেই জানেন।

ইহা ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয়। যোগানন্দ-অশোক-হেমন্ত তখন অন্তর্ধান হইয়াছেন ; সুনীতিবাবু পৃষ্ঠপোষক আছেন, কিন্তু বড় একটা আসেন না। মোহিতলাল, সুশীলকুমার ঢাকা হইতে নিয়মিত লিখিতেছেন, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী কলিকাতা হইতে। গবেষণাব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং কার্টুন ছবিতে বনবিহারী ও প্রফুল্লচন্দ্র (পি. সি. এল.) অবিশ্রান্ত সহায়তা করিয়া চলিয়াছেন। ইতালীয় ভাষাবিদ্ প্রমথনাথ রায় তখন অসুস্থ হইয়া রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে আমার হেপাজতে ছিলেন বটে। কিন্তু আসলে তখন 'শনিবারের চিঠি' আসর মাৎ করিতেছিল রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ও

'ঘৃতকুম্ভ', প্রমথনাথ বিশীর 'মন-জুয়ান' ও 'বিদ্যা-সুন্দর', সদ্য-সমাগত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'জামাইষষ্ঠী' এবং আমার অজস্র অফুরন্ত ব্যঙ্গ ও গম্ভীর গদ্য-পদ্য রচনার দ্বারা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-রূপে রবীন্দ্রনাথের নিয়োগ এবং সাতান্ন বর্ষ বয়সে শরৎ-জয়ন্তী প্রধানত আমাদের লেখনী-কণ্ডূয়নের উদ্দীপনা যোগাইয়াছিল। তথাকথিত অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা তখন ছত্রভঙ্গ। আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির দিকেই আমরা নজর দিয়াছিলাম বেশি; অস্পৃশ্যতা ও অশিক্ষা দূরীকরণই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ফলে 'শনিবারের চিঠি' শুধু সাহিত্যিক সমাজের কৌতূহলোদ্দীপক পত্রিকা হইতে ধীরে ধীরে একটা সর্বজনীন রূপ লইতেছিল।

ঠিক এই অবস্থায় 'বঙ্গশ্রী'র শ্রীসম্পাদনে আমার অন্তরের সায় ছিল না। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক আমি থাকিতে পাইব না—চাকরির এই শর্ত আমার মারাত্মক মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল। চাকরিতে যোগ দিয়া যথারীতি কর্মাধ্যক্ষের আসনে বসিতেছিলাম, সহায়ক সাহিত্যিক মণ্ডলী অনুগ্রহ করিয়া ভিড়ও করিতেছিলেন, কিন্তু আমি দিনের চাকরির শেষে এক রকম উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিলাম। সেই নিদারুণ বিষাদযোগে রবীন্দ্র মৈত্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার অবকাশ আমি পাইয়াছিলাম, কর্মাধ্যক্ষরূপে প্রথম কয়েক দিন কাগজপত্রে কয়েকটা সহিমাত্র করিতে হইয়াছিল, পৌষের অর্থাৎ শেষ সংখ্যা 'উপাসনা' বাহির করিবার দায়িত্ব ছিল সাবিত্রীপ্রসন্নের। তিনি আমাকে লেখার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি একটি কবিতা দিয়া ছুটি পাইয়াছিলাম। আমার মনের অব্যবস্থার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ জানিতেন না; আপিস ছুটি হইবার মুখেই দেখিতাম, তাঁহাদের দুইজনের একজন হাজির হইয়াছেন, কোনও কোনও দিন দুইজনই। ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরমুখো মানুষ, কিঞ্চিৎ

কর্মযোগ আওড়াইয়া বিদায় লইতেন, রবি আমাকে ধরিয়া লইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসিত, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে তাহার নানা পরিকল্পনার কথা বলিয়া আমাকে উৎসাহিত করিত। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র অভিনয়-সাফল্য সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ ছিল এবং ইহা দ্বারা শুরু করিয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চে সে নূতন প্রাণসঞ্চার করিবে—এ কথাও জোরের সঙ্গে বলিত। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় আর্ট থিয়েটারে (স্টার) তখন 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র মহড়া চলিতেছিল। আমি 'বঙ্গশ্রী'র ভার গ্রহণ করিলে 'শনিবারের চিঠি' চালাইবার সমস্ত দায়িত্ব সে লইবে—এই আশ্বাস দিয়াছিল, যদিও আমার নূতন চাকরির দ্বিতীয় দিনেই শ্রীপরিমল গোস্বামী উক্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, রবির উৎসাহ ও আশ্বাসে আমি বাহিরে ধীরে ধীরে স্থৈর্য লাভ করিতে লাগিলাম, কিন্তু মনের গহনে আমার কবিসত্তা অশান্ত হইয়াই রহিল। তারাশঙ্করের দেওয়া বাহিরের এই বর্ণনা নিখুঁত—"'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তকে ঘিরে নতুন কালের সাহিত্যরথীর সমাবেশ হয় নিত্য নিয়মিত। গল্পগুজবে, হাস্য-কৌতুকে, আলাপে আলোচনায়, চায়ে পানে, সিগারেটে বিড়িতে মধ্যে মধ্যে মুড়ি-বোঁদেতে, ভাজা চিনাবাদাম ছোলাতে মিশিয়ে সরগরম মজলিস।" কিন্তু যাহাকে কেন্দ্র করিয়া মজলিস, তাহার বুকে আদর্শচ্যুতির হাহাকার, বন্দী খাঁচার পাখীর অসহায় অন্তর্দাহ। মনে হইত, চাকরির শর্তপত্রে সর্ববিধ স্বাধীনতার উল্লেখ কথার কথামাত্র, আসলে 'বঙ্গশ্রী'র পায়ে বঙ্গবাণীকে আত্মনিবেদন করিতেই হইবে। 'উপাসনা'র শেষ সংখ্যার জন্য (পৌষ ১৩৩৯) সাবিত্রী-প্রসন্নকে যে কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে অজ্ঞাতসারে অন্নপূর্ণাকে জাগাইবার জন্য কাতর আহ্বান ছিল। শিব ক্ষুধায় কাতর। অন্নপূর্ণা জাগো—অন্নপূর্ণা না জাগিলে কি ঘটিবে সে ইঙ্গিতও ছিল :

জানি একদিন সতীহারা শঙ্কর
চমকি জাগিবে প্রলয়ঙ্কররূপে,
ফেলে বাঘছাল নাচিবে দিগম্বর,
কাঁপন লাগিবে মৃত-কঙ্কাল-স্তূপে।
আজো আসে নাই সেই ঘোর দুর্দিন,
শিবের ঘরণী গাঢ় নিদ্রায় লীন,
জাগে মহাকাল শঙ্কিত দীনহীন—
'জাগো প্রিয়া জাগো' ডাকিতেছে চুপে চুপে।
সে ডাকে বিশ্ব কাঁপিয়া উঠেছে মা গো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

শিল্পীবন্ধু শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় একটি রঙিন ছবিতে এই ভাবকে রূপ দিয়াছিলেন, ফাল্গুনের 'বঙ্গশ্রী'র মুখপাত হিসাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

মনের এই অবস্থায় নূতন আপিসে সাহিত্যিক হৈ-হৈ হট্টগোলের মজলিসের পর এক-একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে একা পথে বাহির হইয়া পড়িতাম, পায়ে হাঁটিয়া কখনও গঙ্গার ধার, কখনও বালিগঞ্জের লেক পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম, অনেক রাত্রে শ্রান্তক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট ফিরিয়া আসিতাম। ফিরিবার পথে মনে হইত, এই কর্মব্যস্ত নগরী, এমন কি নিখিল চরাচর নিদ্রামগ্ন, আমিই একা জাগিয়া আছি। রসা রোড ও রাসবিহারী অ্যাভেনিউ জংশনের কাছে একদিন দেখিলাম, পৌষের নিদারুণ শীতের মধ্যে চারিজন শববাহক কাঁধের বোঝা লইয়া ক্লান্ত চরণে চলিয়াছে, বিবিধ জড়তার মধ্যে তাহাদের "বল হরি হরিবোল" অতি ক্ষীণ ও করুণ শুনাইতেছিল। আমার মন এমনিতেই চড়া সুরে বাঁধা ছিল। আমি তাহারই মধ্যে সমস্ত জীবন ও জগৎকে ব্যঙ্গ করিয়া মহাকালের অট্টহাসি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, ইহাই শেষ, ইহাই সমাপ্তি; ইহার পরে আর কিছু নাই; নিঃশেষ মৃত্যুই

মানুষের অনিবার্য পরিণতি। অকস্মাৎ নিকটের কোনও দোতলা হইতে সদ্যোজাত শিশুর তীব্রতীক্ষ্ণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়া নগরীর ধূম্রধূলিকুয়াশা-লাঞ্ছিত আকাশমণ্ডলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমূঢ় জড়তাগ্রস্ত আমার চিত্তে বিদ্যুদ্দীপ্তিবৎ নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, আমার দেবতা যেন এক নিমেষে আমাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন—মাভৈঃ, এই অনন্ত অখণ্ড প্রবাহের শেষ নাই। প্রতিমুহূর্তেই ধ্বংস ও মৃত্যুকে উপহাস করিয়া নবজাতকের নূতন জন্ম হইতেছে, নবীন কিশলয় শুষ্ক গলিত পত্রের স্থান লইতেছে। সেই এক মুহূর্তে আমার ব্যর্থ ব্যথিত হতাশ জীবনের নবজন্মান্তর ঘটিল, আমি মরিতে মরিতে আবার বাঁচিয়া গেলাম।

সেই রাত্রেই লিখিলাম "কে জাগে ?" লিখিলাম ঃ

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল,
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা।
আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত।—
পৌষের শীত রাত্রি দুপুর বাজে।

* * * *

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

আর জাগে ভগবান—
জাগে নির্গুণ পরমব্রহ্ম, জাগেন নির্বিকার ;
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর,
অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া পড়ে—
তারে তিনি দেন কোল।

জাগে অশক্ত সর্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান!

শুধু হাসে মহাকাল—
হা-হা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী-দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসা রোড—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ,
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে!
সে ক্রূর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

এই কবিতার আকারে অভয় আসিয়া আমার সকল ভয় হরণ করিল, আমার মনের 'রাজহংস' ডানা মেলিয়া আকাশে উড্ডীন হইল, নূতন চাকরি যে জগদ্দল পাথরের বোঝা আমার বুকে চাপাইয়াছিল, শরতের মেঘের মত তাহা লঘু হইয়া গেল, নিঃশঙ্ক দৃঢ় চিত্তে নূতন কর্মভার গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত হইলাম। সাবিত্রীপ্রসন্ন 'উপাসনা'র শেষ সংখ্যা বাহির করিয়া তখন বিদায় লইয়াছেন, পৌষের মাঝামাঝিকালে অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি' "কে জাগে"-বক্ষে বাহির হইয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছে, পরিমল গোস্বামী সকল দায়িত্ব লইয়া সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, ১৫ই পৌষ সন্ধ্যায় 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র প্রথম অভিনয়ের অভাবনীয় সাফল্য রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শনি-মণ্ডলকে জয়যুক্ত করিয়াছে, নূতনের অর্থাৎ 'বঙ্গশ্রী'র জন্মের সকল আয়োজন এ দিকে সম্পূর্ণপ্রায়। মায়ামন্ত্রবলে আমার জীবনের হতাশা ও অবসাদ নূতন সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার দ্বিতীয় পর্যায় কবিজীবনের ভিত্তি 'রাজহংসে'র নাম-কবিতায় এই সময়েই

আমার মুক্ত মনের অবাধ আনন্দ-বিহারের প্রকাশ এইভাবে হইয়াছে ঃ

উড়িয়াছে রাজহংস মেঘাস্তৃত সুনীল আকাশে
দুই পক্ষ বিস্তারিয়া শূন্যে করি স্থিতির নির্ভর—
গতির নির্ভর করি আকাশের লঘু বায়ুস্তরে,
কবে সে করেছে যাত্রা, ছাড়িয়াছে মাটির আশ্রয়,
কবে উত্তরিবে গিয়া তারো নাহি জানে সে ঠিকানা
টলমল গাঢ়নীল হিমবক্ষ মানসের তীরে।
উপলমুখর সেই মেঘচুম্বী পাহাড়ের কোলে
নীড়ের আশ্রয় তার।
সে আশ্রয়ে নীড় আর শাবকের মাঝে
দিশাহীন নভোযাত্রা ক্ষণকাল রহে তার স্থির ;
বাহিরের স্থূল ডানা হয়তো ধূলায় মিশে যায়,
অন্তরের সূক্ষ্ম পক্ষ যুগে যুগে চলে ঝাপটিয়া।
শত শত জন্ম-বিবর্তনে—
সেথা তার নাহিক বিশ্রাম,
ক্লান্তি নাই, ক্ষোভ নাই তার।
ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক—
উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে ;
নিম্নে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ
ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমিরনীরে।
ধরিতে পারে না তারে, ঊর্ধ্বে তার বিরাট প্রয়াণ।
উচ্চে নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
চলিবে অনন্তকাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
কোটি কোটি গ্রহ-চন্দ্র কোটি তারা পাইবে বিলয়,
লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন।

সেই দিন সেই অতিশয় দুঃসময়ে আমার মানস-সরস্বতী আমাকে যে মহাজীবন-পথের ইঙ্গিত দিলেন, সুখে দুঃখে সেই পথকেই আমি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি। আমার সান্ত্বনা এই যে, সেই পথ ভূমার পথ, ক্ষুদ্রের নয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

'বঙ্গশ্রী' ও রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

১৩৩৯ পৌষেই প্রকৃতপক্ষে আমি গদিতে বসিলাম। ১লা মাঘ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' বাহির হইবে; তোড়জোড় শুরু হইয়া গেল। তোড়জোড় অর্থে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রত্যহ আকর্ষণ করিয়া আনিবার মত আড্ডা জমানো। 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'র কল্যাণে আর কোনও কাজে না হউক্, ওই কার্যটিতে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলাম। মূলধন ছিল অসীম ধৈর্য। বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত কুরূপ-প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী-কটুভাষী বেকুব-বুদ্ধিমান ভাবুক-কর্মী সৎ-বদমাস বহুবিধ বিচিত্র মানুষকে লইয়া যিনি দুনিয়ায় আসর জমাইতে পারেন, তিনিই অবতাররূপে পূজিত হন। এরূপ একটি ছোটখাট অবতার না হইলে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে কাগজ চালানো সম্ভব নয়। আমার ত্রিশ বৎসরের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতায় এই প্রত্যয় দৃঢ়তর হইয়াছে। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা অধিক ভাবপ্রবণ, কাজেই সম্পাদকত্বে প্রতিষ্ঠা অবতারত্বে প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা দুরূহতর সাধনা। আমি স্বভাবসুলভ ধৈর্য ও দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দ্বারা এই সাধনায় প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম। ধৈর্যের দিক দিয়া আমার আদর্শ ছিলেন একমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আমি যখন তাঁহার সংস্পর্শে আসি তখন আড্ডা জমাইবার বয়স তাঁহার ছিল না, তবে যৌবনে 'দাসী' 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'র প্রারম্ভযুগে তিনি যে সাহিত্য-মজলিসী ছিলেন তাহার প্রমাণ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের "বাঙাল বাঁকুড়াবাসী দুষ্ট রামানন্দ" প্রভৃতি কবিতার পংক্তিতে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘজীবনের কয়েকটি খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন বৎসর 'সাধনা' 'ভারতী' 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)' 'ভাণ্ডার' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতির সম্পাদকত্ব করিতে গিয়া এমনই বিপর্যস্ত

হইয়াছিলেন যে, পত্রিকা-সম্পাদকের কাজের কথা মনে হইলেই বিভীষিকা দেখিতেন; কাহারও নিষ্ঠুরতম পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, লোকটা মরিয়া মাসিকের সম্পাদক হইবে। সাহিত্যিকের জীবনে ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তি তিনি কল্পনা করিতে পারিতেন না। অনেক দিনের তালিমী সত্ত্বেও 'বঙ্গশ্রী'র আমলে বিবিধ জনসমাগমের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমিও মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতাম—'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র নকল গুরু শিয়ালমারার মত বিদ্রোহ করিতে ইচ্ছা হইত। বহু কষ্টে সামলাইয়া লইয়া আসর জাঁকাইয়া বসিয়া থাকিতাম। গুণী ও সুধী ব্যক্তিরা আসিতেন, অবসর ও মর্জি-মত আড্ডা দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমি একা স্থাণুবৎ সম্পাদকীয় চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া তিতিক্ষার পরীক্ষা দিতাম। পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, মৎ-সম্পাদিত দুই বৎসরের 'বঙ্গশ্রী'ই তাহার প্রমাণ।

এ যুগের সাময়িকপত্র-পরিচালকদের আমার এই কাহিনী হইতে কিছু শিখিবার আছে। পত্রিকা-আপিসে ঢালাও আড্ডা অর্থাৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতি যথোপযুক্ত সমাদরের অভাবে আমাদের কালেই বহু জমজমাট পত্রিকার পতন হইয়াছে, অনেকগুলি বিলকুল মরিয়া গিয়াছে। সাহিত্যিকের আড্ডাই সাহিত্য-পত্রিকার প্রাণ; ঢিলাঢালা স্বাচ্ছন্দ্য, তক্তপোশ তাকিয়া তামাক তাম্বূল' অবাধ রাজা-উজিরমারী গল্প অথবা তীক্ষ্ণ কথার তরবারিক্রীড়ার মধ্যেই সাহিত্যের আড্ডা স্ফূর্তি লাভ করে। আজকালকার টেবিল-চেয়ার-টেলিফোন-সমন্বিত সাময়িক পত্রিকার আপিসগুলি পাশ্চাত্ত্য আদর্শে নিছক কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি-ধরা ভাবে চালাইতে গিয়া কর্তৃপক্ষ হয়তো ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করিতেছেন, কিন্তু ফালতু স্বর্ণখণ্ডরূপ (ক্যাটালিটিক এজেন্ট) আড্ডার অভাবে সাহিত্য-মকরধ্বজে দানা বাঁধিতেছে না, স্বর্ণসিন্দূরেই ব্যর্থ হইতেছে। সাহিত্যের বিকাশ ও প্রকাশের পক্ষে মা-লক্ষ্মীর চেক-দাক্ষিণ্যই

যথেষ্ট নয়, চক্রে বসিয়া চা ও চুরুট-সহযোগে বাক্ ও বাৎ-এর অবাধ সাধনাও প্রয়োজন। শুধু সাহিত্য-পত্রিকার আপিসগুলিই নয়, শিল্পীদের স্বর্গধাম অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর কলিকাতা শাখারও ফরসি-ফরাস ছাড়িয়া বিলাতীকেতাদুরস্ত হইতে গিয়া সাহিত্যিক-শিল্পীদের কাছে আর সে আকর্ষণ নাই। তাহার ফল ভাল হয় নাই।

সম্পাদক-কাম-জেনারেলম্যানেজাররূপে ৫৬নং ধর্মতলা স্ট্রীট ভবনের দখল পাইয়াই আমি সর্বাগ্রে আড্ডার সুব্যবস্থা করিলাম। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য-জীবনে' লিখিয়াছেন:

> 'বঙ্গশ্রী'র আসরে সজনীকান্তের মহল ছিল তিনটে। প্রথম মহলে থাকতেন কিরণ রায়, তিনি আপ্যায়িত করতেন নূতন আগন্তুকদের; তার পরের মহল ছিল সজনীকান্তের সম্পাদকীয় দপ্তর; এখানেই বসত এই বিখ্যাত মজলিস। এর পর ছিল তাঁর খাসমহল, এখানে চারিদিকে ঠাসা ছিল হাজার পাঁচেক বই, এরই মধ্যে তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন এবং গভীর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

তারাশঙ্কর আর একটা মহলের খবর দিতে ভুলিয়াছেন। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের শাস্ত্র-প্রকাশ-বিভাগের সদাচারসম্পন্ন পণ্ডিতেরা ফরাস-তাকিয়া-সজ্জিত একটা প্রকাণ্ড হলঘরে পুথিপত্র খুলিয়া কাজ করিতেন। তাঁহারা বিদায় হইলে মাঝে মাঝে সেটি হইত আমাদের সঙ্গীত-জলসা-মহল। প্রধানত নলিনীদা—নলিনীকান্ত সরকার এই আসরে একসঙ্গে আদি ও অনাদি রসের জোগান দিতেন, আমরা চিৎ অথবা কাৎ হইয়া সুরতানময় রসের সাগরে ভাসিতে থাকিতাম। সেটিকে নিষিদ্ধ মহলও বলা চলে।

এই চার মহলের চার ফেলিয়া শাশ্বত সহকারী কিরণকুমারকে পুরোভাগে রাখিয়া আমি ধৈর্যসহকারে বসিয়া থাকিতাম। সৌভাগ্য-ক্রমে শুরু হইতেই রুই-কাতলা-চুনো-পুঁটির সমাগম হইতে থাকিত।

রাঘববোয়াল-হাঙ্গর, তিমি-তিমিঙ্গিল জাতীয় দুই-একজন যে না আসিতেন তাহা নহে। তারাশঙ্কর তালিকা দিয়াছেন :

> অধ্যাপক সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমূল্য সেন, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ, স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত সরোজ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, চিত্রকর শ্রীযুক্ত চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অরবিন্দ দত্ত, স্বর্গীয় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়,···মধ্যে মধ্যে আসতেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, কবি অজিত দত্ত, বিখ্যাত চিকিৎসক উদার আত্মভোলা শ্রীরাম অধিকারী ; কখনও কখনও আসতেন শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়, শিল্পী শ্রীঅতুল বসু, শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে আসতেন এবং আসর জমিয়ে তুলতেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

কয়েকজন আড্ডাধারীর নাম এই তালিকায় বাদ পড়িয়াছে, যথা—ঢাকা-প্রবাসী মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ সুশীলকুমার দে ও ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ (কলিকাতায় আসিলে), নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ডঃ মনোমোহন ঘোষ, কবি কৃষ্ণধন দে, মনোজ বসু, মহাজনপদাবলী-বিশারদ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ প্রমথনাথ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, স্ট্যাটিস্টিশিয়ান যতীন্দ্রমোহন দত্ত, রূপদক্ষ যামিনীকান্ত সেন, "বৃদ্ধের বচন"খ্যাত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, সটাক শশাঙ্কমোহন চৌধুরী, পক্ষীতত্ত্ববিদ্ সুধীন্দ্রলাল রায়, কবি হেমচন্দ্র বাগচী, কবি সুধীরকুমার চৌধুরী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও "কালো রবি" নামে খ্যাত 'নারায়ণে'র বহুনিন্দিত লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। আসর রীতিমত জমিয়া উঠিতে সপ্তাহ খানেকের বেশী সময় লাগে নাই। কাজী নজরুল ইসলাম রাত্রি গভীর হইলে কোন কোন দিন ধূমকেতুর মতন উদয় হইয়া চাদরের পুচ্ছতাড়নায় ও গানে পবিত্র শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগকে পবিত্রতর করিতেন, সঙ্গে থাকিতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—আমাদের পবিত্রদা। বন্ধুবর গোপাল হালদার তখন আলিপুরদুয়ারের বক্সা-ফোর্টে আটক

ছিলেন, সুনীতিকুমার-মারফত তাঁহার দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি আসিলে সকলে মিলিয়া পড়া হইত। মাদ্রাজ প্রবাস হইতে শিল্পী দেবীপ্রসাদ আসিলে হৈচৈ-এর অন্ত থাকিত না।

মোটের উপর, বাংলা-সাহিত্যে উদিত ও উদীয়মান প্রায় সকলেই আসিয়া ধরা দিয়াছিলেন; দীনেশরঞ্জন দাস, মুরলীধর বসু ও যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক) সহ গোটা 'কল্লোল'-'কালি-কলম' দলটাই আসিয়া জুটিয়াছিলেন, আসেন নাই কেবল অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব। অনেক পরে রামকৃষ্ণরসায়িত অচিন্ত্যকুমারের উদার স্পর্শলাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু ধ্যানী-মৌনী বুদ্ধদেবকে টলাইতে পারি নাই।

'বঙ্গশ্রী'র বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য কি কি হইবে এবং ধারাবাহিক কোন্ কোন্ রচনা ইহাতে স্থান পাইবে অচিরাৎ স্থির হইয়া গেল। বিভাগগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—প্রচলিত পত্রিকাসমূহ অপেক্ষা কিছু বৈচিত্র্য এইগুলিতে ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি বিদেশী পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব মনোরম ভঙ্গিতে সচিত্র "বিচিত্র জগৎ" লিখিতে লাগিলেন। বিষ্ণুশর্মা (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) আমাদের "অন্তঃপুরে"র অতি প্রয়োজনীয় কথা সরসভাবে লিখিয়া একটা নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিলেন, বাংলার আর্থার মী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অচিরাৎ আসিয়া বাংলা দেশের বিদ্যার্থীদের জন্য "চতুষ্পাঠী" খুলিয়া বসিলেন, কিরণকুমার ও শশাঙ্কমোহন চৌধুরী "সন্ধানী" বিভাগে পৃথিবীর নবতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। প্রথম কিছুকাল জীবতত্ত্ববিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার সুবিখ্যাত "বিজ্ঞান-জগৎ" লইয়া উপস্থিত হন নাই বলিয়া একদা-বিজ্ঞানের-ছাত্র আমি "সৃষ্টি-রহস্য" নাম দিয়া বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ লিখিতে লাগিলাম। পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়ের ভারও নিজের হাতেই রাখিলাম। 'বঙ্গশ্রী'র সেই 'বিচিত্র জগৎ' ও 'বিজ্ঞান-জগৎ' আজ পুস্তকাকারে বিধৃত হইয়া বাংলা-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য

হইয়াছে। "অন্তঃপুর" ও "চতুষ্পাঠী" পুস্তকের স্থায়ীরূপ লয় নাই বলিয়া মনে মনে আমার ক্ষোভ আছে। প্রমাণ-সাইজের নূতন সাময়িক পত্রিকা যাঁহারা বাহির করিবেন, তাঁহারা 'বঙ্গশ্রী'র এই বিভাগগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলে উপকৃত হইবেন।

শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র এক-একখানি উপন্যাস লইয়া উপস্থিত হইলেন, আমি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুবাদের মধ্য দিয়া ('রাজমোহনের স্ত্রী') আসরে নামাইলাম। ধারাবাহিক উপন্যাসের দিক দিয়া 'বঙ্গশ্রী' একরূপ নিশ্চিন্ত হইল।

সৃষ্টিধর্মী গল্প ও কবিতার নির্বাচনে আমার বিচারবুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সজাগ রাখিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, বঙ্গ-বীণাপাণির বীণার ওই দুইটি তারই প্রধান। গল্পে যাঁহাদের বাছাই করিয়াছিলাম তন্মধ্যে সীতা দেবী, সরোজকুমার, মনোজ, রবীন্দ্র মৈত্র ও সুধীরকুমার চৌধুরী তখনই খ্যাতনামা, প্রথম ছয় মাসে ইঁহাদের প্রত্যেকের মাত্র একটি করিয়া গল্প নির্বাচিত হইয়াছিল। সর্বাধিক সম্মান পাইয়াছিলেন প্রায়-নবাগত তারাশঙ্কর; তাঁহার দুইটি গল্প প্রথম ছয় মাসে 'বঙ্গশ্রী'কে অধিকতর শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল। বস্তুত, এই গল্প দুইটি হইতেই বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার জয়যাত্রা শুরু। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "এইখানে যাত্রা শুরু হ'ল 'বঙ্গশ্রী'তে।" 'বঙ্গশ্রী'র কবির সংখ্যা খুবই কম—মোহিতলাল, সুশীলকুমার, প্রমথনাথ বিশী, কৃষ্ণধন দে ও হেমচন্দ্র বাগচী। তৎকালীন প্রমথনাথের "পৃথ্বীরাজে"র "অযুত কণ্ঠে ওঠে ঝঞ্চনা, অযুত কণ্ঠে 'পৃথ্বীরাজ'" অথবা "শকুন্তলা"র "গাহিবে সে সুর, আঁখি ভরপুর, আজি কতদূর—শকুন্তলা" এবং কৃষ্ণধন দের "নিশির ডাকে"র "চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল—খোল বধূ দ্বার খোল"—আজিও আমার মনে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে।

বঙ্গ-সাহিত্যে 'বঙ্গশ্রী'র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দান ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের "বুদ্ধকথা," তৎপরেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়" এবং সুকুমার সেনের (অধুনা ডক্টর) "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" ও "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"। আমার স্বল্প দুই বৎসরের কার্যকালের মধ্যেই 'বঙ্গশ্রী'র এইগুলি কীর্তি। এই চারখানিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-পিপাসুদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছে।

অমূল্যচন্দ্রের সঙ্গে আমার পুরাতন পরিচয়; খ্রীষ্টধর্ম-প্রভাবিত ডাফ হস্টেলে যে দুই-একজন কালাপাহাড়ী হিন্দু সাহস করিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম ১৯২০ সনে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি কোথায় কি ভাবে ছিলেন আমার জানা ছিল না। দেখিলাম, তিনি বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম বিষয়ে বিশেষ গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি "বুদ্ধকথা"র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—দুই-চার পাতা উল্টাইয়াই অনুভব করিলাম, অমূল্যচন্দ্রের কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন হাতে পাইয়াছি। বাংলা ভাষায় বুদ্ধকথা এরূপ চমৎকারভাবে আর কখনও লেখা হয় নাই, এমন বিস্তারিতভাবেও নয়। রত্নটি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না। 'বঙ্গশ্রী'তে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট আনন্দ বিধান করিয়াছিল। অমূল্যচন্দ্র তাঁহার গবেষণা সমাপ্ত করিবার জন্য এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জার্মানি গিয়া ডক্টরেট-ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। বিষয়ান্তরে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার 'বুদ্ধকথা'ও দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুকুমার সেন মহাশয়কে বাংলা গদ্য ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করিবার কৃতিত্ব আমার। তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' পুস্তকাকারে আমিই প্রকাশ করি। তিনি আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অন্যতম প্রধান গবেষক। তারাশঙ্কর যেমন মৌলিক সৃষ্টি ব্যাপারে 'বঙ্গশ্রী'র অক্ষয় কীর্তি, ডক্টর সেন তেমনই গবেষণার ব্যাপারে।

সপ্তাহকালের মধ্যেই প্রথম দুই সংখ্যার জন্য প্রায় তৈয়ারী হইলাম, গোল বাধিল প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের গৌরব কাহাকে দিব তাহা লইয়া। জীবিতকে এই সম্মান দিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হইতে হয়। হেমন্তবালা দেবীর দৌত্য সত্ত্বেও আমার প্রতি তাঁহার বিরূপতা সম্পূর্ণ কাটে নাই। তাঁহার নামে প্রেরিত 'বঙ্গশ্রী' 'শনিবারের চিঠি'র মতই ফেরত আসাতে এই মর্মান্তিক সত্য আরও প্রকট হইয়াছিল। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইতে সাহসী না হইয়া মৃতের দরবারে হাত পাতিতে হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-তরণীর দীর্ঘকাল-বৈঠাবাহী রামকমল সিংহের কৃপায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা "ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস" দিয়া গোড়াপত্তন হইল।

ঠিক ১লা মাঘ তারিখে (১৩৩৯) "শ্মশান-ঘাট" (তারাশঙ্কর) ও "ম্যালেরিয়া" (সরোজকুমার)-সমৃদ্ধ 'বঙ্গশ্রী' আত্মপ্রকাশ করিল। শিল্পী হরিপদ রায়ের হংস-লাঞ্ছন-প্রচ্ছদ-শোভিত 'বঙ্গশ্রী' সর্বত্র সমাদৃত হইল, আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। চাকরি-সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া সর্বাধিক হৈ-হৈ করিলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবির একটি গল্প প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসাহিত্যিকসুলভ উদারতায় তারাশঙ্করের "শ্মশান-ঘাট"কে স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তারাশঙ্কর তাঁহার 'সাহিত্য-জীবনে' এই কারণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছেন।

সুনীতিকুমার আয়র্ল্যাণ্ড জার্মানি প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সচিত্র কাহিনী দিয়া গোড়া হইতেই 'বঙ্গশ্রী'র আসর জমাইয়া ফেলিলেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের "সাগা" বা বীর-কাহিনীগুলি বাঙালীকে শুনাইবার ঝোঁক তাঁহার বরাবরই আছে। 'বঙ্গশ্রী'তে দুই-একটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহার বিবিধ কাজের প্রচণ্ড চাপ সরাইয়া তিনি যদি অন্তত এই কাজটি সম্পূর্ণ

করিতে পারেন, বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করিবেন। সুনীতিবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সত্যসুন্দর দাস (মোহিতলাল), হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতির কল্যাণে 'বঙ্গশ্রী'তে সাহিত্য-প্রবন্ধের যেন বান ডাকিল। একটু মাথা ঘামাইতে হয় প্রথম মুখপাতের প্রবন্ধের জন্য। দ্বিতীয় সংখ্যায় পুনরায় রামকমলদার কৃপায় প্রখ্যাত 'সাধারণী'-সম্পাদক বঙ্কিমবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকার "সেকালের টোলে"র কথা শুনাইতে আসিলেন। পুরাতনপন্থী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রবন্ধটি আমার মান বাড়াইল।

সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলিলাম, এইবারে দুঃখের কথা বলি। ১লা ফাল্গুন 'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির হইল, সেই দিন সায়াহ্নে পোলক স্ট্রীটের হেড আপিসে কর্তার কাছে হাজিরা দিতে হইল। পরের দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ধর্মতলার আপিসে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের উৎসব। এই দিনটির কথা বিশেষভাবে আমার স্মরণ আছে, কারণ এই দিনই আমার সাহিত্যপথের ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী বন্ধু রবি মৈত্রের সহিত শেষ দেখা। আসরে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রবির উপস্থিতিতে স্বভাবতই আলোচনা 'বঙ্গশ্রী' হইতে 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র বিপুল অভিনয়-সাফল্যের দিকে ধাবিত হইল। রবি স্বয়ং তখন সেকেন্দার বাদশাহের ন্যায় দিগ্বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর। তাহাকে প্রশ্রয় দিবার মত সহানুভূতি সকলের থাকিবার কথা নয়। রবি সেটা অনুভব করিয়া শেষ পর্যন্ত আমার হাত ধরিয়া আমাকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে টানিয়া লইয়া গেল। ভূম্যাসনে বসিয়া শুইয়া সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিশ্রম্ভালাপ চলিল। রংপুর হইতে রবির মায়ের অসুখের খবর সেই দিনই তারযোগে আসিয়াছে, পরদিন দ্বিপ্রহরের পরই শিলং মেলে সে রংপুর রওয়ানা হইবে। ঢাকা হইতে মোহিতলালও 'বঙ্গশ্রী' ও 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য আমাকে মুহুর্মুহু ডাকিয়া পাঠাইতে-

ছিলেন। পূর্বদিন ছুটি লইয়া আসিয়াছি, পরের দিন ঢাকা মেলে আমিও ঢাকা রওয়ানা হইব। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া দুই বন্ধু পরস্পর বিদায় লইলাম। রবি তাহার 'মানময়ী'র প্রথম মুদ্রিত কপিখানি আমাকে ও আমার গৃহিণীকে নিবেদন করিয়াছিল। কারণ এই যে, আমারই রাজেন্দ্র-লাল স্ট্রীটের বাড়ির একটি কক্ষে তাহাকে বদ্ধ করিয়া বাহিরে শিকল তুলিয়া দিয়া আমি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 'মানময়ী' রচনা শেষ করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। একটা পূরা দিন লাগিয়াছিল। গৃহিণী জানালা-পথে এই সময়ে তাহাকে ঘন ঘন চা সরবরাহ করিয়াছিলেন। রবি সব শেষে সেদিন কৌতুক করিয়া বলিল, যদি আর না ফিরি এই বইখানা যত্ন ক'রে রেখে দিও, ওর মধ্যেই আমাকে পাবে। সেদিন মনে হইয়াছিল কৌতুক, সপ্তাহকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম—কৌতুক নয়, রবি মর্মান্তিক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আমার নিকট চিরবিদায় লইয়া গিয়াছে।

পরদিন শিলং মেলে রবি এবং ঢাকা মেলে আমি যথাক্রমে উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গ যাত্রা করিলাম। মোহিতলালের সহিত পরামর্শ-শেষে কলিকাতায় ফিরিলাম ৭ই ফাল্গুন সকালের ঢাকা মেলে। পৌষ হইতে নিযুক্ত 'শনিবারের চিঠি'র নূতন সম্পাদক শ্রীপরিমল গোস্বামী আমার রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাসাতেই তখন বাস করিতেছিলেন, তিনি দূর-সম্পর্কে রবির ভাগিনেয়। তাঁহার মুখেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত রংপুরে রবির আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম। রবি ৩রা ফাল্গুন রাত্রে পীড়িতা মাতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়, ৪ঠা ফাল্গুন রাত্রি দশটায় হঠাৎ তাহার কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে। চারিদিক হইতে ডাক্তার বৈদ্য কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হন বটে; কিন্তু ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়া, না, সাপ্রেস্‌ড্ স্মলপক্স এই সংশয়ের মধ্যে চিকিৎসার বিলম্ব হয়। সকালে রংপুরের জনৈক ডাক্তার কুইনিন ইনজেকশন

দিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রবির প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ৫ ফাল্গুন ১৩৩৯ (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) সকাল দশটায় বাংলা-সাহিত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনাময় প্রাণ, হিন্দুসমাজের একজন নিষ্ঠাবান সেবকের জীবন মধ্যপথেই খণ্ডিত হয়।

রূঢ় ধাক্কা খাইয়া প্রথমটা ঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই, বিশ্বাস করিতে বাধিয়াছিল। যখন বিশ্বাস হইল, আমি বিমূঢ় ও মুহ্যমান হইয়া গেলাম। সেই অবস্থায় দ্বিতলে শোবার ঘরে গিয়া আমি বালিশে মাথা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছু খাইতে বা কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিলাম না। আমার সাহিত্য-জীবনের সেই প্রথম শোক—নিদারুণ শোক; শনিমণ্ডলেও সেই প্রথম ভাঙন ধরিল। অনেক রাত্রে উঠিয়া বসিলাম। রবির চেহারা স্পষ্ট হইয়া আমার চোখে ভাসিতেছিল—তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রায় স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি তখনই লিখিলাম :

অপরূপ রূপ, রূপ অপরূপ, বুঝি না ছায়ার মায়া—
তরল আঁধারে অর্ধোত্থিত তব দক্ষিণ বাহু—
তোমার রোমশ বাহু,
ঝুলে পড়িয়াছে খদ্দরী আস্তিন,
শীর্ণ করাঙ্গুলি—
নখাগ্রে তার জাতির মুক্তি-বারতার স্পন্দন—
এ অভিশপ্ত এই লাঞ্ছিত জাতি।

বন্ধু, বন্ধু মোর—
কোথা তব মুখ, কোথা বাণী তব—বজ্রকঠিন বাণী,
থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ আবেগে ভাবগদগদ ভাষা,
অশ্রুজড়িত চাপা কণ্ঠের স্বর?
তোমার আঁখির নীল,
আয়ত চক্ষে বুকের নীলাভ জ্বালা,
কোথায় বন্ধু, অবিন্যস্ত মাথার বিরল কেশ
দেখিতে যে নাহি পাই—

মৃত্যুর কালো ছায়া—
এত কি নিরেট নিবিড় অন্ধকার !
মৃত্যুর নীরবতা—
এমনই বধির কঠোর বাক্যহীন !

'তব দক্ষিণ বাহু
আঁধার মৃত্যু পারিল না গ্রাসিবারে ;
আমি দেখিতেছি—বাক্যমুখর ক্ষীণ স্পন্দন তার
বলিতেছে, আমি আছি।
তব অনাবৃত বক্ষের উপবীতে
লেগেছে আগুন-ছোঁয়া—
বলিতেছে, জাগো জাগো,
জাগো চণ্ডাল, জাগো কঙ্কাল, জাগো,
জাগো জাগো ব্রাহ্মণ।

অগ্নি-জ্বালায় প্রদীপ্ত তব বক্ষের উপবীত
পরাইয়া দাও, দাও কঙ্কাল-গলে ;
শুনি এ শ্মশানে কঙ্কাল-মঙ্গল।

বন্ধু, বন্ধু মোর—
তুমি কি চলিয়া গেছ ?
তবে কেন শুনি ওঁরাও-আবাসে জীবন-জয়ধ্বনি,
চামার-মুচির ডোমের মুখেতে নির্ভর-আশ্বাস
দেখিতে যে আজো পাই।
বাবা-ঠাকুরের সেবার লাগিয়া তারা প্রতীক্ষা করে।
নিরীহা নির্যাতিতা,
সবাই তো ভাই আশ্রয় পায় নাই।
তোমার 'ছেলেরা' সবে
আসন পাতিয়া ব'সে আছে পাতা পেড়ে—
কলেজের ফীস্ হয় নি সবার দেওয়া।

বন্ধু, তোমার নাটকের প্লট মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
উদাসী আজিও একাকিনী কাঁদে মাঠে ;
থার্ড ক্লাস সেই র'য়ে গেল থার্ড ক্লাস—
তবে কেন ছিঁড়ে চ'লে গেলে মায়াজাল ?
বাস্তবিকার আসরে আজিও হরিকুমারেরা বসি
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতেছে নাকী সুরে,
শেষ না হইতে দিবা তুমি কেন ছেড়ে গেলে দিবাকরী,
বলিয়া গেলে না, কোথা থাকে তব ত্রিলোচন কবিরাজ !
বন্ধু, তুমি তো দেখে গেলে নাকো মানময়ী গার্ল-স্কুলে
বদনের মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে হাজারে হাজারে আসে,
ঘৃতকুম্ভটি প্রাঙ্গণে আছে প'ড়ে—
দধিকর্দমে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ।

... ...

বন্ধু, তোমার দক্ষিণ বাহু আরো কি কহিবে কথা ?
শুনিতে না পাই মিলায় ছায়ার মায়া ;
আমারই মনের ভুল—
তুমি নাই, তব দক্ষিণ বাহু নাই,
কান পেতে শুনি অসীম শূন্যে চকিতে থামিয়া গেছে
গতি-আবেগের অনাহত গীতধ্বনি।

আকাশের নীহারিকা—
বিরাট বিপুল প্রচণ্ড বেগে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই ;
ধরার ধূলায় গুঁড়া গুঁড়া হয়ে ঝরিয়াছে নীহারিকা,
বাতাসে উড়িয়া গেছে।

... ...

বন্ধু, তোমার ভস্ম-বিভূতি উড়িছে আকাশ ছেয়ে
ভস্মের চোখ নাই।
পায় না দেখিতে, কাঁদিছে বিধবা, কাঁদিছে উন্মাদিনী,
পিতারে হারায়ে কাঁদিছে সাতটি শিশু।

মরজীবনের সীমান্তে আসি কাঁদিতেছে অভাগিনী
মাতার শয়ন-শিয়রে জ্বলিছে
ঘৃতের প্রদীপ নহে,
মৃত পুত্রের চিতা।

পরে ইহারই সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ একটা ভূমিকা যোগ করিয়া "রবীন্দ্রনাথ মৈত্র" কবিতা প্রস্তুত হইল। ভূমিকার গোড়াটা এই:

রবি নাম তব, ধর নাই রবি-রূপ—
তোমারে ঘিরিয়া গ্রহ শশী আজও করে নি ভ্রমণ শুরু;
তুমি নীহারিকা, নেবুলা-বাষ্প, অসীম শূন্য ব্যোপে
গতির আবেগে শিহরে ঈথর নীল
বাষ্প-বিকারে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান।
লক্ষ তারকা অযুত রবির কোটি গ্রহ-চন্দ্রের
সম্ভাবনায় ব্যাকুল তরল প্রাণ।
জ্ব'লে নিবে যায়, জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে ধাতব বাষ্প যত,
গলিত লৌহ গলিত স্বর্ণ জল মাটি ধোঁয়াধার—
জমাট বাঁধিয়া ধরে নি কঠিন দেহ।
রবি নাম তব, নীহারিকা ইতিহাস।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি কালে প্রকাশিত মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে কবিতাটি মুদ্রিত হইল। ফাল্গুন সংখ্যা হইল "রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যা"। তাহাতে মোহিতলাল, সুনীতিকুমার, গোপাল হালদার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী ও কৃষ্ণধন দে রবির ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্য-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করিলেন; আমি রবির দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহায়তায় তাঁহার জীবনী লিখিলাম। 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আজ যাঁহারা নামে মাত্র জানেন, বাংলা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ অথচ বিস্ময়কর প্রতিভার বিষয় তাঁহাদের আরও জানা উচিত—এই বোধে রবি-মানুষটির সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় 'আত্মস্মৃতি'-ভুক্ত করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সাহিত্যিক মর্যাদা—তিনি তাঁহার আটত্রিশ বৎসরের জীবনে যে সকল কীর্তি পুস্তকাকারে এবং মাসিক, সাপ্তাহিক অথবা দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় রাখিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারাই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-সাহিত্যরসিকেরা নির্ধারণ করিবেন। তাঁহার জীবনীর উপকরণ যৎসামান্য, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার কর্মজীবন সাহিত্যিক মনের দ্বারা পূর্ণভাবে প্রভাবিত ছিল। তাঁহার অসম্পূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই তাঁহার মৃত্যুহীন জীবনের সন্ধান মিলিবে। তাঁহার লৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যায়—তাঁহার আদি পৈতৃকবাস ছিল ফরিদপুর জিলার নাহুরিয়া গ্রামে। রবির পিতা প্রিয়নাথের বয়স যখন আড়াই বৎসর মাত্র তখন পিতামহের মৃত্যু হয়; পিতামহী তাঁহার পিত্রালয় যশোহরের ঝিনাইদহ মহকুমার ফাজিলপুর গ্রামে বাস করিতে থাকেন, প্রিয়নাথও সেখানেই লালিতপালিত হন। ফরিদপুর রতনদিয়া গ্রামের উমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, রবি ইঁহাদের সপ্তম সন্তান। তাঁহার জন্ম হয় ১৩০২ কিংবা ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসের এক রবিবারে, কাজেই নাম রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাল্য ও কৈশোরে অতিশয় মেধাবী এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতা শেষ বয়সে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ফাজিলপুরে বসবাস করিতে থাকেন, স্থানীয় শৈলকুপা হাই স্কুলে রবি ভর্তি হন। এইখানেই স্বদেশী-আন্দোলনের আবর্তে পড়িয়া, সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের বাণী ও রচনাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বদেশী কবিতা ও নাটকাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তদানীন্তন সরকারের বিরূপ দৃষ্টিও তাঁহার উপর পতিত হয়। এই দৃষ্টির প্রকোপ তাঁহাকে আজীবন ভোগ করিতে হয়।

১৯১৩ সনে শৈলকুপা হাই স্কুল হইতে রবি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৫ সনে কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৭ সনে ওই কলেজ হইতেই

কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাস করেন। পরে ইউনিভার্সিটি কলেজে এম. এ. ও ল পড়িবার কালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন। ১৯১৭ সনে বি. এ. পরীক্ষার পরই (১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ) ফরিদপুর জেলার ভীমনগর-নিবাসী দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কন্যা হরিবালা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, কলিকাতায় পঠদ্দশায় নাট্যকার ডি. এল. রায়ের স্নেহ লাভ করিয়া নাটক রচনাতেই তিনি বিশেষ উৎসাহী হন; কবিতা, গল্প, ছড়া প্রভৃতিও অজস্র লিখিতেন। ১৩৩৯, ৫ই ফাল্গুন রংপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৪ঠা ফাল্গুন সন্ধ্যার পরও তিনি একটি নাটক রচনা করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের দুইটি লক্ষ্য ছিল, সমাজসেবা ও বাণীসাধনা; তিনি যৌবনপ্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজ নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক কর্মজীবন হয়তো কালপ্রবাহে হারাইয়া যাইবে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে আমরা তাঁহাকে হারাইয়াও যাহাতে পুনঃ পুনঃ পাইতে পারি সে ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই মানুষটির সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে ক্ষতি হইল তাহার আর পূরণ হইবে না; তাঁহাদিগকে চিরটা-কাল এই আক্ষেপ করিয়াই কাটাইতে হইবে যে, আমাদের রবি সর্বসাধারণের রবি হইতে পারিলেন না; সেই প্রাণস্ফুলিঙ্গ সমস্ত জাতির প্রাণে আগুন ধরাইয়া গেল না। রবিকে যাঁহারা চিনিতেন, তাঁহাদের কাছে মানুষ-রবি সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বা দিবাকর শর্মার চাইতেও ঢের বড় ছিলেন— তাঁহার সাহিত্যকে চাপা দিয়া তাঁহার মনুষ্যত্ব, তাঁহার পৌরুষ, তাঁহার প্রাণ বড় হইয়া দেখা দিত; তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতেন। বাংলা দেশের সামান্য-সংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে এই ক্ষমতা দেখিয়াছি। রবি বাঁচিয়া

থাকিতে আমরা কখনও তাঁহার লেখাকে প্রাধান্য দিতে পারি নাই; অসম্বৃত বেশবাস ও কেশকলাপ, নীল চক্ষু, রোমশ বাহু ও মেঘগম্ভীর নিনাদে রবি নিজেকে এমনই জাহির করিতেন যে, আর পাঁচজনের ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিকট ম্লান হইয়া যাইত। তিনি তখন আমাদের কাছে একটা মানুষ মাত্র থাকিতেন না—একটা আদর্শ, একটা ভাবরূপে প্রতিভাত হইতেন।

আদর্শ বা আইডিয়া মাত্র নয়, রবি ছিলেন অদ্ভুতকর্মা। হিন্দু সংগঠন, শুদ্ধি আন্দোলন, নারীনির্যাতন-প্রতিকার এবং কোল ভীল সাঁওতাল ওঁরাওদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এই কাজে দুই-দুইবার সাক্ষাৎ-মৃত্যুকে বরণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তবু তিনি ভয় পাইয়া জীবনের ব্রত ছাড়েন নাই। তাঁহার আর একটা ব্রত ছিল—দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ইহার জন্য একটা সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় ছিল। একটি প্রথম ভাগ, একটি ওয়ার্ড বুক, একটি স্পেলিং বুক এবং একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ তিনি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রচনা করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপি আকারেই সেগুলি বিনষ্ট হইয়াছে।

তাঁহার একটা ছবি আজও আমার মনে ভাসিতেছে। সকলে বসিয়া খোসগল্প করিতেছি, রাজা-উজির মারিতেছি, হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কির বন্যা বহিতেছে, হঠাৎ দেখিলাম রবি বিমর্ষ হইয়া গেল। প্রথমটা বিস্মিত হইলাম। পরে প্রণিধান করিয়া বুঝিলাম, বাচালতার মধ্যে একজনের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়াছে যাহা জাতির অকল্যাণকর। আহত রবি আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না, অকস্মাৎ আড্ডা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। এই মহাপ্রাণ মানুষটিকে আমরা বিস্মৃত হইব, রবির অকালমৃত্যু সেই দুর্ভাগ্যেরই কারণ হইয়াছে। ছাপার অক্ষরে তাঁহার উপন্যাস 'মায়াজাল,' তাঁহার গল্প 'থার্ড ক্লাস,' 'উদাসীর মাঠ,' 'ত্রিলোচন কবিরাজ,' তাঁহার নাটক 'মানময়ী গার্লস স্কুল,' তাঁহার ব্যঙ্গ-রসরচনা

'দিবাকরী,' 'বাস্তবিকা,' তাঁহার কবিতা 'সিন্ধু-সরিৎ' তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র 'শনিবারের চিঠি' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আজিও বাঁচিয়া আছে ; কিন্তু রবি-মানুষটিকে এই যুগের এবং ভবিষ্যৎ যুগের বাঙালীর কাছে আজ তুলিয়া ধরিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমাদের ক্ষতি ব্যক্তিগত ক্ষতিই রহিয়া গেল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অদলবদল

১৩৩৯, ৯ই অগ্রহায়ণ (২৫ নবেম্বর ১৯৩২) তারিখের ডায়েরিতে দেখিতেছি :

> চাকরির শর্ত অনুযায়ী 'শনিবারের চিঠি'র নূতন সম্পাদক বাছাই আজই করিতে হইল। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সকল দায়িত্ব লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিরণকুমার রায় পরিমল গোস্বামীর নাম করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণকে চিনি, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও সত্যেনদা (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের বিবিধ ব্যক্তিগত দুর্বলতার উল্লেখ করিয়াই সাহিত্যিক কৃতিত্বের জন্য শুধু সম্পাদকীয় ভার তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে বলিলেন। 'নারায়ণে'র নানা গল্প-নাটক-উপন্যাসের রুচি আমার পছন্দবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহাকেই নির্বাচন করিব একরূপ স্থির করিয়াই আপিস গিয়াছিলাম। রবি ঠিক ভরা দ্বিপ্রহরে ঝড়ের মত আমার নিভৃত সম্পাদকীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলিল, অনেক ভেবে দেখলাম, পরিমলই 'শনিবারের চিঠি'র উপযুক্ত সম্পাদক হবে। ও আমার ভাগনে। ওকেই নাও। 'উপাসনা'য় ফোটোগ্রাফির উপর দুই-একটি প্রবন্ধ ছাড়া পরিমল গোস্বামীর কোনও সাহিত্যিক রচনার সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু ইতস্তত করিবার উপায় নাই। রবিকে কথা দিতে হইল। সন্ধ্যার মুখে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণকে গাড়িবারান্দার ছাতে লইয়া গিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলাম। পরিমল গোস্বামী সেই দিনই চাকরি লইলেন।

অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি' অবশ্য দিন ছয়-সাতের মধ্যে আমার সম্পাদকত্বেই বাহির হইল। এই সংখ্যায় চারিটি উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল, প্রমথনাথ বিশীর সম্পূর্ণ কাব্য "বিদ্যাসুন্দর," রবি মৈত্রের "মিল-মেধ-কাব্য," আমার "কে জাগে" এবং শ্রীহলধর ভড় বিরচিত "উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভা"। হলধর ভড় অবশ্য গুপ্তনাম;

লেখক গণিতবিদ্ অধ্যাপক মোহিতমোহন ঘোষ স্বনামেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। এই একটি মাত্র রচনার দ্বারা তিনি কতটা খ্যাতি অর্জন করিলেন জানি না, 'শনিবারের চিঠি'র খ্যাতি অনেক বাড়িয়া গেল। সাপ্তাহিক যুগে আমার "কামস্কাটকীয় ছন্দ," মাসিক-নবপর্যায়-যুগে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "হিঙ্গলী-দর্শন" যে-জাতীয় আলোড়ন তুলিয়াছিল, "উর্দোস্কৃত"ও ঠিক তাহাই করিল। বাহির হইবামাত্র অগ্রহায়ণ সংখ্যা নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল। এই বিদায়ী-সফলতা আমার "বাধ্যতামূলক" বিরহ-ব্যথাকে প্রায় অসহ করিয়া তুলিল।

নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সম্পাদক ৫/সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের আপিস-ছাপাখানা-বাড়িতেই ডেরা বাঁধিলেন। আমি ও পরিমলদা দুইজনে দুই দিক হইতে জাল ফেলিয়া বঙ্গসাহিত্য-অরণ্যের দুই ভাবী বিহঙ্গম-ধুরন্ধরকে ধরিয়া চিরতরে বাঁধিয়া ফেলিলাম। আমি ধরিলাম তারাশঙ্করকে, পরিমলদা ধরিলেন বলাইচাঁদ অর্থাৎ বনফুলকে। পরিমলদার শিকারও অনতিবিলম্বে মৎকবলিত হইল। সমসাময়িক আরও অনেকে এই যুগে আমার আকর্ষণের বিষয় হইয়াছেন, তোরণদ্বার পার হইয়া বৈঠকখানাতেও আড্ডা জমাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরে এই দুইজন ছাড়া আর কেহই প্রবেশাধিকার পান নাই। অবশ্য পূর্বগামী মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ সেখানে তৎপূর্বেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরে স্নেহাস্পদ আরও দুই-চারিজন প্রবেশ-পত্র পাইয়াছেন। ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ ও করুণানিধানের কথা বাদ দিতেছি। "আত্মস্মৃতি"-পাঠকেরা জানেন বনফুলের সহিত আমার আগেই পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু সে পরিচয় মাত্র। ক্যাটালিটিক এজেন্টের মত পরিমলদাই আত্মীয়তায় পাক ধরাইয়া কাটিয়া পড়িয়াছেন। আর কোনও কারণে না হউক, এই কারণেই তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। তারাশঙ্কর

'উপাসনা'র ধারাবাহিক পথে ধরা দিলেও আমি তাঁহাকে নিজেই অর্জন করিয়াছিলাম।

"উর্দোস্কৃত" একটি নিত্যরসে টলমল মাণিক্যবিশেষ। কিন্তু কালের কপোলতলে তাহা বিশুষ্ক হইয়া রেখামাত্র না রাখিয়া হারাইয়া গিয়াছে। রচনাটির কিঞ্চিৎ এখানে ধরিয়া রাখিলে অন্যায় হইবে না:

আজ প্রায় তিন মাস হইল মামা বাত সারাইবার জন্য আমার বাসায় আসিয়াছেন। মামার বাত সারিয়া গিয়াছে, এখন প্রত্যহ দুপুরবেলায় স্টীমারে চাঁদপাল ঘাট হইতে রাজগঞ্জ অবধি ভ্রমণ করেন। সেদিন মামার সহিত স্টীমারে বেড়াইতেছি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের জেটি হইতে একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুসলমান স্টীমারে উঠিলেন। শ্রোতার অভাবে এতক্ষণ মামার গল্প বন্ধ ছিল। মুসলমানটিকে সাদরে নিজের পাশে বসাইয়া একটি বিড়ি দিলেন। মিঞা সাহেব ব্যাগ হইতে একখানা হাতপাখা বাহির করিয়া দাড়িতে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, বিসমিল্লা, কি গরম!

মামা। হ্যাঁ, সামান্য গরম পড়েছে বটে তবে বোগ্‌দাদের তুলনায় এ কিছুই নয়।

মিঞা। আপনি বোগ্‌দাদ গ্যাছলেন না কি?

মা। আমি ধনপতি বসু। পৃথিবীর কোন্ জায়গায় যাই নাই তাই জিজ্ঞাসা করুন।

মি। বোগ্‌দাদে কি খুব গরম?

মা। গরম তা আর বলতে? সেবার তিনটে উট আমার চোখের সামনে হার্টফেল হয়ে মরে গেল। আর.র পড়ে রইল আমার তাঁবুর সামনে। তখন ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে, ঘণ্টায় ২৫।৩০টা হাত পা মাথা অ্যাম্পুটেট করছি, উটগুলোকে যে টাইগ্রিসে ফেলে দেব সে সময় নাই। দু দিন বাদে হাসপাতাল থেকে বেরুবার সময় পেলুম। বেরিয়ে দেখি, উটগুলো পচে নি। তিন দিন দিনযামিন্যোস্বায়ংপ্রাতঃ রৌদ্র লেগে একেবারে আমসত্ত্বের মতন হয়ে গেছে।

মি। বলেন কি? হাড্ডি ভি শুকিয়ে গেল?

মা। একদম বিলকুল শুকিয়ে খেংরাকাটি বনিয়ে গেল।

মি। তাজ্জব কি বাত!

মা। এ আর তাজ্জব কি? তখন চীনদেশে ডাক্তারি করি। বুদ্ধদেবের উইসডম টুথ উদ্গম উপলক্ষ্যে আমাদের ২১ দিন ছুটি। সঙ্গে একটি চীনে হাবসী চাকর নিয়ে চীনের পাঁচিল দেখতে বেরুলুম। গিয়ে দেখি, চীনারা কাঁচা পাঁপরে জলের ছিটে দিয়ে পাঁচিলের ওপর রাখছে আর খানিক বাদে পাঁপর মুচমুচে ভাজা হয়ে উঠছে।

মি। বিসমিল্লা, এমন কাণ্ড তো কখনও শুনি নি!

মা। শুনবেন কোত্থেকে? আগে তো আর ধনপতি বোসের দেখা পান নি! আমি 'চীনময় ভারত' ব'লে একখানা বই লিখছি, তাতে এই সব কথা থাকবে। গরমে পাঁচিলের পাথরগুলো ফটাফট ফাটছিল, তার এক টুকরো ছিটকে লেগে হাবসীটা মরে গেল।

মি। একদম মরে গেল?

মা। একদম আপাদমস্তক মরে গেল। প্রতি বৎসর পাঁচিলের কাছে ৩৭ হাজার লোক গরমে গলে মারা যায়—

মি। পাঁচিলের ধারেই পচে, না, তাদের কলসীতে পুরে গোর দেওয়া হয়?

মা। পচেও না, গোরও দেওয়া হয় না। গরমে গলে শিলাজতু হয়ে হিমালয়ের গা বেয়ে তিব্বতে এসে পড়ে আর কবিরাজরা তাই কুড়িয়ে নিয়ে ওষুধ করেন। যাক, অনেক কথা হ'ল। শালিমারে এসে পড়েছি দেখছি, আসুন, আর একটা বিড়ি নিন, আমিও একটু তামাক খেয়ে নিই।

তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, তাই তো মিঞা সাহেব, এতক্ষণ আলাপ হ'ল, আপনার নাম তো জানা হ'ল না! কোত্থেকে আসছেন?

মি। আমার নাম গাজী বিটকেলউদ্দীন, ঢাকা জিলার মক্তব হতে বাংলা বাত ইমপ্রুভ করবার জন্য কলকাতায় এসেছি।

মা। আহা-হা! আপনিও বাতে ভোগেন নাকি? ও অতি সাংঘাতিক ব্যায়রাম।

মি। আরে মশাই, আমি বাত ব্যায়রামের কথা বলছি না। আমার বাত বাংলাবাত, যাকে আপনারা বলেন, ব্যাঙ্গলী লিংগুয়েজ।

হিঁদুদের হাতে পড়ে বাংলা বাত একদম পয়মাল হয়ে গ্যাছে। আমি এই বাংলা লিংগুয়েজে উর্দু ও আরবী বাত ঢুকিয়ে এমন একটি চীজ বানাব যে দুনিয়া সুদ্ধ লোক অবাক হয়ে যাবে।

মা। সাবাস মিঞা, সাবাস! এ অতি উত্তম কথা বলেছেন। বাংলা ভাষায় বাত ধরিয়ে দিতে পারলে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়। আপনার প্ল্যানটা খুব ভাল, এতে পার্কে ডেঁপো ছেলেগুলোর বক্তৃতা বন্ধ হবে, বাড়িতে মেয়েদের ঝগড়া বন্ধ হবে—

মি। না না, আপনি কিছু সমজাচ্ছেন না। আমরা চাই আপনাদের বাংলা ভাষায় শওকরা ৫৫টি উর্দু ও ফারসী কথা ঢোকাতে। আপনাদের হাতে পড়ে সংস্কৃতের ঠেলায় বাংলা লিংগুয়েজ একেবারে জাহান্নামে গেছে, আমরা ওর উদ্ধার করতে চাই।

মা। ও বাবা! আপনি তো সোজা লোক নন। তা এ ভাষাকে বাংলা বলবেন কেন? একে বলুন উর্দোস্কৃত।

ইহাই হইল মামার উর্দোস্কৃতের গোড়াপত্তন। আজ সমগ্র ভারতের কল্যাণে বঙ্গবলিদানের পর উর্দোস্কৃতের মহিমা আমরা সঠিক বুঝিতে পারিব না, কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে সত্যই উহা ভয়াবহ মূর্তি লইতে বসিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিণ্ডিকেট-সভার মিনিট-বইয়ে ইহার অনেক প্রমাণ মিলিবে। যাহা হউক, "উর্দোস্কৃতে"র শেষটা অংশত এই :

আজ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে উর্দোস্কৃত-প্রচারিণী-সভার প্রথম অধিবেশন। সর্ববাদিসম্মতিক্রমে দামাদুদ্দৌলা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে গাজী বিটকেলউদ্দীন উঠিয়া বলিলেন—ভাইছাব ও বহিনছাবীগণ, আজ মোদের কি সুরোজ! আমরা এতগুলি আদমী আদমিনী জাড়পীড়িত বকরা-বকরীর ন্যায় একত্র হইয়াছি। টিকিওয়ালা মৌলবীদের হাতে পড়িয়া বাংলা ভাষার নাজেহালত্ব লাভ হইয়াছে, তবে সোবে হয় দৌলতখসম [ধনপতি] বসু ও সের[বাগ]চী ছাহেবের মেহেরবানিতে উহার পুনর্জান প্রাপ্তি হইবে। নজর করুন হিন্দু বাঙ্গালীরা কি পাজী। আমরা শওকরা ৫৫জন হইলেও ওরা আমাদের বাত মোটেই পুছে না। একমাত্র বিনয়কুমার সরকার ছাব—দুনিয়া, দৌলত,

পয়জার প্রভৃতি বাত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু হিঁদুয়ানির চক্রে পড়িয়া তিনিও একখানি কেতাবের নাম 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' রাখিয়াছেন। কেন, উস্কোর বদলে 'জরু, গরু ও মুল্লুক' নাম দিলে কি ক্ষতি হইত ?

বিটকেলউদ্দীন এই বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন দাড়ি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ও চতুর্দিক সাবাস, সাবাস, কেয়াবাৎ শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন দৌলতখসম বস্থ ছাব কিছু বলিবেন। ইনি উর্দোস্কৃতে বহুত কেতাব বানাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু পড়িবেন। তখন মামা ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে বলিতে লাগিলেন, মজলিসখসম জবরাশয় [সভাপতি মহাশয়] ও ভদ্রাভদ্র মাজলিস্তগণ, উর্দুই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাত। উরস দুলাইয়া যাহা পড়া যায় তাহাকে উর্দু বলে। আপনাদের নিশ্চয়ই নজরুক্ত হইয়াছে যে, আদমী শিশুগণ যখন নয়া পড়িতে শুরু করে তখন তাহারা ছাতি দুলাইয়া পড়িতে থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে পহেলা সকলেই উর্দুতে পাঠ করে। আমরা মেহেরবানি করিয়া শওকরা ৪৫টি সংস্কৃত বাত রাখিতেছি। এই বাতে যে আচ্ছা কেতাব বানানো যাইতে পারে তাহা দেখাইবার ওয়াস্তে আমি রামায়ণ-খানি উর্দোস্কৃতে বানাইয়াছি। আপনারা স্থিরমেজাজিস্থ ও খাড়কর্ণ হইয়া শ্রবণ করুন। এই বলিয়া মামা একতাড়া কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

সীতার সাথ রিস্তাদশ-[দশরথ]-ছাওয়াল রামের শাদি হইয়া গিয়াছে; কয়দিন খুব জোর খানাপিনা চলিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ ভরত দুসমনঘ্ন সকলেই হাজির। সীতামায়ির ললাটে সিন্দুর পানি-পানি করিতেছে। নবাবর্ষি জনক চারপায়োপবেশনে উজু করিতেছেন, তাঁহার সামনে বশিষ্ঠ মৌলবী দুনিয়া-দোস্ত [বিশ্বামিত্র] মোল্লা গৌ চুরি করিয়াছে বলিয়া নালিশের আরজি পেশ করিতেছেন। এমন সময় 'হরিনাম হক্, হরিনাম হক্' বলিতে বলিতে নারদ মোল্লা আসিয়া হাজির—ইয়া আজানুলম্বিত নূর, হাতে অলাবুর বদনা। জনক তখনই তাঁহাকে লুঙ্গিগর্দান [গলবস্ত্র] হইয়া আ-জমীন সেলাম করিলেন।...

মামার বক্তৃতা শেষ হইলে সকলে 'দৌলতখসম বসুকা জয়' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সভা ভঙ্গ হইল। শ্রোতারা উৎসাহে মামাকে চ্যাংদোলা করিয়া রিক্‌শায় চাপাইয়া দিল, আমিও রিক্‌শার এক ধারে বসিলাম। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। রিক্‌শা যখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ব্রাহ্মমন্দিরের কাছ দিয়া যাইতেছে তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, শুনিলাম কয়েকটি যুবক সিঁড়ির উপর বসিয়া গান গাহিতেছে—

চিদাশ্‌মানে হ'ল পূর্ণ আস্‌নাই-চন্দ্রোদয় হে!

উর্দোস্কতের আবিষ্কারক মোহিতমোহন ঘোষকেও আজ কেহ স্মরণে রাখে নাই, কিন্তু তাঁহার একক রচনাটির মতই তিনি মানুষটিও ছিলেন মাণিক্যবিশেষ। ১৯১১ সনে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পরীক্ষায় উত্তরপাড়া বিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯১৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্র হিসাবে বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম. এস-সি. পাস করেন। সঙ্গে সঙ্গে সার্ আশুতোষের দৃষ্টি এই দরিদ্র অথচ কৃতী ছাত্রটির উপর পড়ে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপকরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। বিশুদ্ধ অঙ্কের ছাত্র হইলেও মোহিত-মোহন সর্ববিদ্যাবিশারদ বা চৌকস ছিলেন; সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ছিল, ব্রিজ খেলাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মাতৃভাষায় তাঁহার অতিশয় সরস রচনাভঙ্গির পরিচয় "উর্দোস্কতে"র উদ্ধৃতাংশেই মিলিবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় মাতৃ-ভ্রাতৃপরায়ণ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিতে করিতেই তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের এই অপরিস্ফুট প্রতিভার প্রতি এই সুযোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

রবির আকস্মিক মৃত্যুর প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া একদিন তাহার ইটালির বাসায় গেলাম। তাহার প্রতিপালিত, কলিকাতায়

শিক্ষারত কিশোর-যুবকদের এবং তৎসঙ্গে তাহার ঘরজোড়া সুবৃহৎ আলমারির বই ও পুথিগুলির কাতর হাহাকার যেন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কয়েকটি মোটা মোটা খাতায় ও টুকরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাগজে অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত তাহার বহু গদ্য-পদ্য রচনা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করিলাম। ক্ষীণ আশা ছিল, এই কাগজপত্রের মধ্যে "ঘৃতকুম্ভে"র শেষাংশ, অন্তত তাহার একটা প্রাথমিক খসড়াও খুঁজিয়া পাইব। এই অপূর্ব উপন্যাসখানি ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি'তে আরম্ভ হয় এবং পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্বের অষ্টম অধ্যায় বাহির হয়। ওই পর্যন্ত কপি আমরা পাইয়াছিলাম। ঘাঁটাঘাঁটি করিতে করিতে পূর্ণ ও খণ্ডাকারে অনেক কবিতা গল্প ও নাটিকা পাইলাম, কিন্তু প্রার্থিত বস্তু মিলিল না। অনেকগুলি রচনা 'শনিবারের চিঠি'র "রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যা"ভুক্ত করিলাম, 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাতেও অনেকগুলি লেখা বাহির হইল। আজও পর্যন্ত দেখিতে পাই, রবির অপ্রকাশিত লেখা এখানে ওখানে বাহির হইতেছে। কিন্তু "ঘৃতকুম্ভ" অসম্পূর্ণ আছে। রবির দাদাদের ইচ্ছা ছিল, আমিই উহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু রবির রচনার উপসংহার করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। রবির এক দাদা "ঘৃতকুম্ভ" শেষ পর্যন্ত নিজেই শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমি উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই।

রবির রচনাবলীর মধ্যে "কুকরি" শীর্ষক একটি ছোট্ট কবিতা ছিল, পরিমলদা তাহা চৈত্রের 'শনিবারের চিঠি'ভুক্ত করেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার "টুকরি"-কবিতাগুলি রবির খুবই ভাল লাগিত। বিশেষ করিয়া অমলদা (শ্রীঅমল হোম), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার নিজের সম্বন্ধে রচিত "টুকরি"-গুলি সে প্রায়ই আমাদের আড্ডায় আওড়াইত। অমলদার সঙ্গে পরিচয় তখনও ঘনিষ্ঠ হয় নাই, তাঁহার ভাবী ভায়রাভাই হাবল

(হিরণকুমার) সান্যালের কৃপায় একটুকু ছোঁওয়া লাগিয়াছিল, একটুকু কথা শুনিয়াছিলাম এই মাত্র। কিন্তু রবির কণ্ঠে যখন শুনিতাম :

জহরলালের নিজ হাতে সই-করা,
টেবিলে পড়িয়া বই তাঁর একখানা ;
রবি ঠাকুরের লক্ষরূপের লক্ষ ফোটোগ্রাফ।
অদ্ভুত মায়াজাল—
শাখাপাতাহীন গাছ, মনে হয় পুষ্পস্তবকানত,
ফুলের গন্ধে নন্দিত চারিদিক।
বেলোয়ারি ঝাড়, কাচ তার একখানা
কোহিনুর-ভ্রমে তুলে রাখি সিন্দুকে।
ট্রামে চাপে তাই মনে হয় যেন রোল্‌স্,
কথা কহে, যেন মনে হয় গান গাহে।

তখন সকলেরই মনে হইত, মানুষটি আমাদেরও খুবই চেনা, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। প্রায় তেইশ বৎসর পার হইতে চলিল, তাঁহার সহৃদয় হৃদয়লোকে ধীরে ধীরে প্রবেশাধিকার পাইয়া অভিষিক্ত ও ধন্য হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার বহির্বাস বা "টোগা"র ভাঁজের একটুকু ব্যতিক্রম দেখি নাই। ধোপদুরস্ত অমলদা ঢিলাঢালা আমাদের বিস্ময়ই রহিয়া গিয়াছেন। যাক, অমলদার কথা পরে হইবে। রবি তাহার নিজের নামের "টুকরি"টিও সমান দরদ দিয়া আবৃত্তি করিত, তাহার স্মৃতিশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ :

রিক্‌শায় চেপে বেলেঘাটা পুল পারে
যেতে যেতে বলো মাথাভরা রুখু চুলে
লক্ষ টাকার স্বপ্ন কজন দেখে !
দাড়ি গোঁফ যদি থাকে থাক্ খোঁচা খোঁচা
হোক খদ্দরী ধুতি পাঞ্জাবি ম্লান—
ক্ষতি কি হ'লেই মহিলাকুলের সভা !
হোথা গারো হিলে শিষ্য হাজার দশ

কাটিহারে আছে ন হাজার সাঁওতাল,
তবু মন কাঁদে, কোথা পাট-ক্ষেতে বিধবা-নির্যাতন!
নির্যাতিতের কথা—
কহিতে গেলেই গলা চড়ে ধাপে ধাপে
চোখ ভ'রে আসে অকারণ আঁখি-জলে।
দেশ কি ধর্ম বড়
যাচাই করিয়া আজিও হয় নি দেখা।
প্ল্যাটফর্মের দাঁড়াইয়া একধারে
থার্ড কেলাসের দেখিছে প্যাসেঞ্জার।
ওদিকে আবার শর্মা শ্রীদিবাকর
হরিকুমারের করিছে অন্বেষণ।

মৃত্যুর পর দেখা গেল, ক্ষত্রিয় রবির মনের উত্তাপে 'শনিবারের চিঠি'র "টুকরি" কুকরিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সে লিখিয়াছে:

ঘুঁটে কুড়াইতে কুড়ায়ে চাঁপার কলি
শনিবার-হাটে কহিছে, কে লিবি ঘুঁটে?
সস্তায় যায়—চারি গণ্ডার দরে!
ফুলের ব্যাপারী ক্ষ্যাপারে কহিছে ডাকি,
ঘুঁটে-কুড়ানো তো ব্যবসা তোমার নহে,
মারিতেছ রুজি গোবেচারাদের শুধু!
ক্ষ্যাপা হ্যা-হ্যা হাসে উনুনে ঢালিতে যায়।
উমার জননী খন্তি লইয়া রোখে।
নীচে এসে ক্ষ্যাপা পাখা খুলে পড়ে প্রুফ।
টুকরি উজাড় করিয়া ফেলিল টানি
আস্তাকুঁড়েতে খ্যাপার ঘরণী রেগে।
মাটিতে বুঝিবা ভেল্‌কি লুকায়ে ছিল
নিমেষে টুকরি হইল কুকরিখানা।
চাদরের ভাঁজে লুকায়ে আনিনু ঘরে,
ভাবিতেছি এবে কাহারে জবেহ করি!

'শনিবারের চিঠি'তে ইহাই রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সর্বশেষ রচনা। সে চাহিয়াছিল, আমি ওই ছন্দে তীক্ষ্ণ "স্যাটায়ার" রচনা করি। তাহার আকাঙ্ক্ষা যে আমি পূর্ণ করিয়াছি, আমার 'রাজহংস' ও 'মানস-সরোবরে' তাহার প্রমাণ আছে। সে খুশী হইয়াছে কি না জানিবার উপায় নাই।

নূতন চাকরি-জীবনে বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই নানা দিক দিয়া নানা অদলবদল হইয়া গেল। শহরতলীসন্নিহিত রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে আর ভাল লাগিতেছিল না, ব্যবসায়ের পক্ষেও স্থানটা অসুবিধাজনক। একমাত্র আকর্ষণ—মাসীমা হেমন্তবালা দেবীর সান্নিধ্য, তিনি ক্রমাগত পত্রধারায় আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য অনেকটা ধুইয়া আনিয়াছিলেন। মাসীমাকে লেখা কবির কয়েকটি পত্রেই দেখিতেছি, আমার প্রসঙ্গ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একটু একটু নমুনা দিলে মাসীমার কৌশলটি অনুধাবন করা সহজ হইবে। ১৩৩৯, ৪ঠা কার্তিকের চিঠিতে দেখিতেছি :

> সজনীকান্ত যদি আমাকে চিঠি লিখতে চান নির্ভয়ে লিখতে বোলো, আমি কখনো তাঁকে অসম্মান করব না। যাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল বা মনের মিল নেই তাঁদের সঙ্গে সেই অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক কারণবশত আমার ব্যবহারকে কলুষিত করতে আমি অক্ষম। অনেক সময় দেখতে পাই আমার সঙ্গে সৌহার্দ্যের অভাব অহৈতুক, আমার অবাধ দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও তা দূর হয় না, যেহেতু আমি অতিমানব নই সেই জন্যে সেটা আমাকে বেদনা দেয় কিন্তু তাই বলে আমিও বেদনা দিয়ে তার শোধ নিতে গ্লানি বোধ করি। দৈবাৎ কখনো যদি আত্মবিস্মৃত হই তবে লজ্জা পাই।

২৭ কার্তিক ১৩৩৯ তারিখে লেখা চিঠিতে আছে :

> সজনীকান্ত তোমার জন্মদিনে যে কবিতা তোমাকে দিয়েচে সেটা পড়ে ভালো লাগল।

অনেক পরের আর একখানি চিঠিতে দেখিতেছি :

হঠাৎ খবর পেলুম আমাদেরি বংশের কোন লোক সজনীকান্তকে নিন্দা করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। কিছুদিন আগে সজনীকান্ত ···পত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে আমার কাছ থেকে লেখা চাইবার জন্যে আশ্রমে এসেছিলেন। আমি দিতে পারি নি, তাঁকে উপেক্ষা করা তার কারণ নয়। এই অনুরোধ নিয়ে তাঁর ভাষায় ও ব্যবহারে আত্মশ্লাঘব-জনক কিছুই প্রকাশ পায় নি। লেখার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ জানান নি বাংলা দেশে এমন সম্পাদক অল্পই আছেন, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে সম্মান করেচেন কিন্তু আত্ম-সম্মানের হানি করেচেন এমন কথা বলা অসঙ্গত। যা হোক আমাকে জড়িত করে এই রকম অন্যায় কুৎসাবাদের সৃষ্টি করায় আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ ও দুঃখ বোধ করচি।

হেমন্তবালার মধ্যস্থতায় গুরুশিষ্যের পুনর্মিলন-কাহিনী স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়; মাসীমা যে ক্ষুরধার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে নানা কৌতুকের সাক্ষাৎও মিলিবে। বলা বাহুল্য, এই সকল ঘটনার কোনটিই আমার জ্ঞাতসারে ঘটে নাই, কবিগুরু ও ভক্তের মধ্যে পত্রধারায় আমাকে লইয়া নেপথ্য-বিধান চলিতেছিল। আপাতত অদলবদলের কথায় ফিরিয়া আসা যাক।

স্থানান্তর-সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন বাল্যবন্ধু দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৫।২ মোহনবাগান রো-এর বাড়ির সন্ধানই শুধু দিলেন না, সে বাড়ি পাইবারও ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ও জ্ঞান-দা (আয়কর-উকিল জ্ঞান রায়) সম্প্রতি ‘বঙ্গশ্রী’র আড্ডায় খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কীর্তি মিত্তির লেন সংলগ্ন মোহনবাগান রো-এ তাঁহাদের প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ বাড়তি লাভ। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৩ (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪০) বন্ধুবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে প্রথমে আমি একা নূতন-গৃহপ্রবেশ করিলাম, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ নিজস্ব তন্ত্রমতে বাড়িটা শোধন করিয়া বলিলেন, এই পত্তন শুভ হইবে। তাঁহার পুরশ্চরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় (কারণ পরদিন শনিবার ১লা পৌষ, যাত্রা নাস্তি) পুত্রকন্যাসহ গৃহিণী আসিয়া নূতন গৃহে অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং পরিমল গোস্বামী নীচের একখানি ঘর দখল করিলেন ; প্রবাসী প্রেসের মুদ্রাকর মানিকচন্দ্র দাসও চাকরিগত ব্যবধান সত্ত্বেও সঙ্গ ছাড়িলেন না। বস্তুত কিছুকাল পরে রেঞ্জার্সের ঘোড়দৌড়-প্রতিযোগিতায় ছত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়া আমহার্স্ট রো-এ স্বগৃহ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গ ছাড়েন নাই। সন্তানহীন এই মানুষটি আজীবন আমার পুত্র শ্রীমান রঞ্জনকে পুত্রবৎ স্নেহে লালন-পালন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল 'শনিবারের চিঠি'র সহিত আমার সম্পর্কে। আমি নামেমাত্র পরিচালক, জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ সমস্তই পরিমলদা করেন। এইভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া তিনি বাল্যবন্ধু বনফুলের শরণাপন্ন হন। সাহেবগঞ্জের (ভাগলপুর) স্কুল-বোর্ডিং-এর সহবাসী ইঁহারা। পরিমল সঙ্কটে পড়িয়া বনফুলের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, পরিমললোভে শুধু অলি নয়, ফুলও যে ছুটিয়া আসে সজনীহীন 'শনিবারের চিঠি'তে সেই ইতিহাসই রচিত হইল। মাসের পর মাস একটি দুইটি করিয়া গোটা 'বনফুলের কবিতা' বইখানাই 'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হইতে লাগিল। আমি 'বঙ্গশ্রী'র শ্রী-সম্পাদনে ৫৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট আয়তনেই প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যাতক এবং প্রায়শই রাত্রিতেও নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে লাগিলাম। নূতনের প্রেমে পুরাতনের প্রতি এই নিদারুণ অবহেলা যে সাংঘাতিক হইতে পারে নাই, তিন বৎসর সাত মাসের (পৌষ ১৩৩৯—আষাঢ় ১৩৪৩) দুধ-মা পরিমল গোস্বামীর অশেষ স্নেহই তাহার কারণ।

পরকীয়া-প্রীতি সাহিত্যে যত সমাদরই লাভ করুক, গার্হস্থ্য-জীবনে ইহার পরিণাম শোচনীয়। এই "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘরে"র ট্র্যাজেডি আমার বহু পরিচিত বন্ধুর জীবনে মর্মান্তিক

হইতে দেখিয়াও নিজে সাবধান হইতে পারি নাই। বিশেষ করিয়া এই কালটা ছিল আমারও জীবন-ব্যাকরণের পরস্মৈপদী যুগ। আমার আপন আঙিনায় ধূলা জমিতেছে, না, শ্যাওলা পড়িতেছে—ঘরের চালে খড় উড়িতেছে, না, কাক চিল বসিতেছে সেদিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না, পরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রাত্যহিক আসর জমাইতেই আমি ব্যস্ত ছিলাম।

সেখানে সর্বাপেক্ষা বড় আসর বসিবার কথা ছিল ১লা মাঘ ১৩৪০—'বঙ্গশ্রী' প্রকাশের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে। আমার ইষ্টদেবতা সেদিন প্রচণ্ড রূঢ় ভূমিকম্পের মূর্তিতে দেখা দিয়া এই নিদারুণ আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আমাকে আত্মস্থ করিবার প্রথম চেতনা সঞ্চার করিলেন। ১৫ই জানুয়ারি ১৯৩৪ বেলা আন্দাজ তিনটার সময় বিহারের ভূমিকম্পের ধাক্কা আমার বিহ্বল ও অসতর্ক মনকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া দিল। মধ্যাহ্ন-আহারান্তিক দিবানিদ্রার পর, সন্ধ্যার মজলিসে নব বৎসরের প্রথম সংখ্যাকে কেন্দ্র করিয়া আনন্দ-উৎসবের বিচিত্র পরিকল্পনা মাথায় লইয়া ট্রামে চড়িয়া বসিয়াছিলাম। শ্যামবাজার হইতে ধর্মতলা—উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিতেছিলাম; হ্যারিসন রোড জংশনের কাছে অর্থাৎ প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল। আচমকা তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতেই অনুভব হইল, আশেপাশের বাড়ি ঘরদুয়ার যানবাহন মানুষ সমস্তই দুলিতেছে। বাহিরের আকর্ষণে সম্মুখে আগাইয়া যাইব, না, ঘরের টানে পিছন ফিরিব—এই চিন্তা সর্বপ্রথম আমাকে অভিভূত করিল। আমার অব্যবস্থিতচিত্ততার মধ্যেই মাতা ধরিত্রী স্থির হইলেন। ক্ষণিক মানসিক দুর্বলতার জন্য মনে মনে হাসিয়া দক্ষিণগামী ট্রামেই বসিয়া রহিলাম, উত্তরে অবস্থিত হয়তো-বিপন্ন শিশুপুত্রকন্যা ও ঘরণীর দাবি অস্বীকার করিয়া দক্ষিণের দাক্ষিণ্যই বরণ করিতে চলিলাম।

আপিসে পৌঁছিয়াই শুনিলাম, সেই পুরাতন বাড়ির একাংশে ফাটল দেখা দিয়াছে। তখন সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাহিত্য-শিল্প-রসিকেরা অনেকেই আসিয়া জুটিয়াছেন। হৈ-হৈ-এর মধ্যে আমার মনস্কম্প স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। আমরা দল বাঁধিয়া লালদীঘির চত্বরে স্টিফেন হাউস, আরমানী গির্জা ও গড়ের ম্যাঠে অক্টরলনি মনুমেণ্টের ফাটল দেখিতে গেলাম। ধর্মতলায় ফিরিয়া চা-জলযোগের মজলিস বসাইলাম। কিন্তু আজিকার ধাক্কায় আমারও মনের মধ্যে কোথায় ফাট ধরিয়াছিল, ঠিক স্বস্তি পাইতেছিলাম না। সেদিনকার আড্ডায় 'শনিবারের চিঠি'র একেবারে আদিযুগের চারিজনের মধ্যে তিনজন—অশোক-হেমন্ত-সুধীরকুমার (একমাত্র যোগানন্দ বাদ) উপস্থিত থাকিয়া আমার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি অবহেলিত 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, আমি যাহাকে বলে মরমে মরিয়া গেলাম। অশোক চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তখন তাঁহার একদা-নিজস্ব কাগজে আবার মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল বেনামে নিয়মিত লিখিতেছেন। তাঁহার খোঁটাই সর্বাধিক বাজিল। যে নিশ্চিন্ত আরাম ও যশের মধ্যে 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি থিতাইয়া আসিয়াছিল, সেখানে আলোড়ন উপস্থিত হইল। অশান্ত ও অস্থির চিত্তে রাত্রে বাড়ি ফিরিলাম। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘর ও বাহির, উত্তর ও দক্ষিণ—দুই দিকের আকর্ষণ পরিমাপ করিতে করিতে লিখিলাম "দুই মেরু" :

আমার মনের এই দুই মেরু উত্তর দক্ষিণ,
দুই হিমমেরু নহে তুহিন-শীতল।
তুষার-আবৃত হিম উত্তর আমার,
ক্ষীণ রৌদ্রহীন আলোরেখা
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ঝলসিয়া—
মৃতের অধরে ম্লান পাণ্ডুহাসি যেন।

... ...

মনের দক্ষিণ মেরু, উত্তপ্ত ফুটিছে
রক্ত-রাঙা লাভা-স্রোত আগ্নেয়-গিরির।
মরে, পচে, পাকে চুল, শাখাপত্র খসি খসি পড়ে—
ফুলের সুগন্ধে বায়ু ক্ষণেক মন্থর,
পুতিগন্ধ ক্ষণে ক্ষণে নাকে আসি লাগে।
ভাল মন্দ রমণীয়, বীভৎস বিকৃতি—
চলে কালস্রোত।

... ...

দক্ষিণ মেরুতে মোর পৃথিবীর সব নদী মেশে—
আবর্ত পঙ্কিল।
ভেসে আসে শব-দেহ, ভেসে আসে কাঠ-খড়-কুটা,
বিচিত্র ধরার আসে মৃত্যু ও জীবন-পরিচয়।
আলো-অন্ধকারের সন্দেশ।
পথের বন্ধুরা আসে, ঝ'ড়ো হাওয়া, ডানা-ভাঙা পাখী,
ওড়ে চিল, ওড়ে মাছরাঙা ;
কানাকানি হাসি ও চিৎকার—

... ...

উত্তর উত্তরে মোর, দক্ষিণে দক্ষিণ,
দোঁহে দোঁহাকার নাহি জানে পরিচয়—
দুই শুধু এক হ'ল আমার অন্তরে ;
পরিচয়হীন ক্রোধে—
নিষ্ফল আক্রোশে দুয়ে এ উহারে হানে।
এই হানাহানি—
আমার অন্তর ব্যাপি নিরন্তর এ দ্বন্দ্ব-মন্থন
বিষবাষ্প উঠে আবর্তিয়া,
কুৎসিতে সুন্দর করে, সুন্দরে ভীষণ।

... ...

দক্ষিণে সবার আমি, উত্তরে আমার আমি একা,
পথের বকুল-ছায়ে উত্তরেতে আমার সমাধি—
ফাল্গুনের উন্মন বাতাসে

শাখাচ্যুত ফুলদল পড়ে ঝরি শিয়রে আমার ;
অজ্ঞাত পথিক আসি ফেলে বেদনার অশ্রুজল—
আমার মৃত্যুর মৃত্যু সেখানে হয়েছে বহুদিন।

দক্ষিণেরে ভালবাসি, উত্তর আমারে করে প্রেম,
সমাধি-শয়ন রচি মোর লাগি সে জাগে প্রহর,
দক্ষিণে আঁকড়ি লোভে আমিও অনন্তকাল ধরি
রচি উত্তরের ব্যবধান। ...

সেই দিন—সেই ১৫ই জানুয়ারি রাত্রে 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি সম্পর্কে আমার মনে মনে অনাস্থা-প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। সেই প্রস্তাব কার্যকরী হইতে পুরা এক বছর সময় লাগিল। ১৯৩৫ সনের ১৫ই জানুয়ারি আমি পাকাপাকি রকমে দক্ষিণকে বর্জন করিলাম, অর্থাৎ চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। এই এক বৎসরের মধ্যে আমার জীবনে আরও অনেক গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলাম। পরবর্তী বৈশাখে (১৩৪১) রবীন্দ্রনাথের স্নেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া এক দিকে মন যেমন হাল্‌কা হইল, অন্য দিকে ঢাকায় গিয়া একটা বিপুল পরস্মৈপদী বোঝা মাথায় লইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম—নিজ কলিকাতাতেও আনুষঙ্গিক কম বোঝার সৃষ্টি করিলাম না। বহু নূতন ও পুরাতন অজ্ঞাতনামা সাহিত্যিককে আবিষ্কার করিবার গৌরব অর্জন করিলাম। 'অঙ্গুষ্ঠ' ও 'মনোদর্পণ'-লেখকের 'রাজহংস' ও 'আলো-আঁধারি'র প্রায় সব কবিতাগুলিই রচিত হইল। ব্রজেন্দ্রনাথ ও রামকমল সিংহের আগ্রহাতিশয্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্পর্ক ঘটিল। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া শ্রীরামপুর মিশনরি কলেজে গবেষণার কাজ আরম্ভ করিলাম। আজ হিসাব খতাইয়া দেখিতেছি, সেইদিনকার বোঝা আজ প্রায় সকলই নামাইয়া ফেলিয়াছি, বোঝার ভারে মাথার মাঝামাঝি

টেরিটা শুধু বিপর্যস্ত হইয়া ব্যাকব্রাশে পরিণত হইয়াছিল, সেই চিহ্নটুকু আজও মস্তকে ধারণ করিতেছি।

'বঙ্গশ্রী'র দুই বৎসরে নূতন লাভ অনেক হইয়াছে। শত্রুপক্ষের শৈলজা প্রেমেন্দ্র নৃপেন্দ্র মিত্র হইয়াছেন, অপরিচিত তারাশঙ্কর বনফুল নির্মলকুমার (বসু) পরিমল চন্দ্রহাস (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) সরোজকুমার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘনিষ্ঠ ও আপন হইয়াছেন, উত্তমর্ণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব চুকাইয়া প্রেমের স্বর্ণসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছেন, সায়ান্স-কলেজ-মেসের স্নেহাস্পদ বন্ধু ললিতানন্দ গুপ্ত "অমলা দেবী"রূপে নূতনভাবে ধরা দিয়াছেন, কলেজের কাঁচা ছেলে শ্রীমান জগদীশ "কলেজ-বয়"রূপে আসিয়া লক্ষ্মণ-ভাইরূপে চিরসম্পর্কিত হইয়াছেন। মোটের উপর জমার খাতার অঙ্কই বেশি।

ঊনবিংশ অধ্যায়

আত্মদর্শন

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে একটু গুরুগম্ভীর গবেষণা করা যাক। মোটামুটি একটা গড়পড়তা হিসাব করিয়া দেখিতেছি, মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মময় জীবন "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে" আরম্ভ হইয়া একাত্তর বৎসরে শেষ হয়। অর্থাৎ ১৭ হইতে ৭১ মোট চুয়ান্ন বৎসরের ফলপ্রসূ জীবন মানুষের। মহা অসাধারণদের কথা স্বতন্ত্র। যীশুখ্রীষ্ট ও শঙ্করাচার্য তেত্রিশ-বত্রিশেই জীবনের বিপুল জ্ঞান ও কর্মসাধনায় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া সমসাময়িক ও সুদূর ভবিষ্যতের মানুষের হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অন্য দিকে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক অবতার বুদ্ধদেব এবং আধুনিকতম মহামানব রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-অরবিন্দেরা আশি বৎসর পর্যন্ত অম্লান জ্যোতিতে ধরাধামে বিরাজ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা নিপাতনে সিদ্ধ, কাজেই ব্যতিক্রম। আমার গবেষণালব্ধ ১৭ হইতে ৭১—এই ৫৪ বৎসরকে তিন অংশে বিভক্ত করিলে আঠার বর্ষের সমান তিনটি পর্ব পাই। প্রথম পর্বে মানুষ বহিঃকেন্দ্রিক (অবজেকটিভ) থাকে, দ্বিতীয় পর্বে হয় আত্মকেন্দ্রিক (সাবজেকটিভ), এবং তৃতীয় পর্বে তাহার উচিত বাহির ও অন্তরের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইষ্টকেন্দ্রিক হওয়া। উচিত বলিলাম এই কারণে যে, এই তৃতীয় পর্বে আমি সবে প্রবেশ করিয়াছি, আমার অভিজ্ঞতা আরও পাকা হইলে পোক্ত সাক্ষ্যই দিতে পারিব। প্রথম দুই পর্ব সম্বন্ধে আমার মতামত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সতের বৎসর বয়সে পিতামাতার স্নেহাশ্রয় ছাড়িয়া ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য বাহির হইয়া প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথম পর্বের আঠার বৎসরে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি 'বঙ্গশ্রী'র চাকুরিতে

১৭

ইস্তফা দিয়া দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করিলাম। বিগত আঠার বছরে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, পর্বশেষে তাহারই একটা তামামি বা “দি সামিং আপ” যাহা দাঁড়াইল তাহার নাম দিলাম “অসহায়” :

বাসনা-বহ্নি জ্বলুক জ্বলিতে দাও,
দেহ-জঞ্জাল পাবক-পরশকামী ;
মৃতার বক্ষে কেহ না বসন টানে,
শবের ললাটে সাজে না খয়েরী টিপ !
জীবনে বাঁচিবে তবু করিবে না ভুল,
কে তুমি পাষাণ, কে তুমি অহঙ্কারী—
চিরকাল যারে চলিতে হইবে পথে,
বিপথে যাবে না, তাও সম্ভব কভু ?
ভুল ক'রে ভালবাসিবে না অধরায়,
কেবা সে প্রেমিক, রসিক বলি না তারে ;
দিবে না আঘাত কভু যারে ভালবাস—
ভালবাসা সে কি লেজারে হিসাব রাখা ?
অপচয় করি কাঁদিবে না অনুতাপে,
হোটেলে মদের পাত্র সমুখে ধরি
বিমুখ করেছ প্রভাতে যে ভিখারীরে
কাঁদিবে না তুমি স্মরি তার ম্লান মুখ ?
বারাঙ্গনার অঙ্গ চাপিয়া বুকে
ভাবিবে না তুমি পকেটে রাখিয়া হাত,
কন্যারে তব কিনে দেবে ফুলঝুরি
বলিয়া এসেছ অফিস যাবার কালে ?
খেলিবে না রেস বাঁধা দিয়ে স্ত্রীর চুড়ি ;
মাতাল হইয়া ঘরে ফিরিবার মুখে
জ্বরেতে বেহুঁশ পত্নীর তরে তুমি
কিনিয়া যতনে নেবে না ফাউল-চপ ?
মিছা কথা বলি ঠকাবে না বন্ধুরে—
পীড়িত ছেলের নামে নেওয়া পয়সায়

মেলিন্স ফুডের বদলে কিনিয়া মদ
আরো পাঁচজনে ডাকিয়া খাবে না তাহা ?
... ...
ক্ষতি কি এতই ভুল ক'রে যদি থাকো,
খতায়ে দেখিলে দেখিবে সবারি ভুল—
এ রূপে না হয় দেখিবে অন্য রূপে
নিখুঁত জ্যামিতি নহে মানুষের মন !
... ...
মানবী-গর্ভে ধরায় জন্মে যেবা
তার মত আর কেবা আছে অসহায়,
ভুল সে করিবে, বড়াই করিবে আরো
সব কাজে তার বজায় প্রিন্সিপ্‌ল্‌ !
হায় রে মানুষ, হায় রে প্রিন্সিপ্‌ল্‌—
কে কোথায় জানি করিছে টহলদারি,
ভাবের ঘরেতে চুরি হয় তবু রোজই,
নয়নের জল ঝরিছে পৃথিবী জুড়ে !

অর্থাৎ আমি থমকিয়া ভিতরের দিকে চাহিলাম; আমার আত্মদর্শনের পর্ব আরম্ভ হইল।

এবং আরম্ভ হইল 'বঙ্গশ্রী'তেই। আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের এক পক্ষ আমার কবিপ্রকৃতি অর্থাৎ আমার বাধাবন্ধহীন উন্মাদ ও উচ্ছৃঙ্খল যৌবন; প্রতিপক্ষ দাঁড়াইলেন আমার বিবেক-বুদ্ধির প্রতীক-স্বরূপ স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য—ভট্টাচার্য মহাশয়। ব্যবসায়-বুদ্ধিতে এবং আপিস-গত ব্যবহারে পাকা সাহেব হইলেও তিনি আসলে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নৈষ্ঠিক বংশধর—পূর্ববঙ্গের নবদ্বীপ কোটালিপাড়ার ব্রহ্মণ্য ও পাণ্ডিত্য-গৌরব সম্বন্ধে নিত্য-সচেতন। ভূদেবের পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধের বন্ধনে স্বেচ্ছাবদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয় গোড়া হইতেই আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। লেখনীমুখে নিঃসৃত প্রাচীন আদর্শবাদী যে "আমি"—

তিনি প্রথমে তাহাকেই ভালবাসিয়াছিলেন এবং নির্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু নবযুগের উদ্দাম বন্যায় ভাসমান "আমার" সঙ্গে তাহার মিল ছিল না। তাঁহার স্বভাবত স্নেহপ্রবণ হৃদয় যাহাদের মধ্যে একসঙ্গে আদর্শ ও স্নেহের পরিতৃপ্তি খুঁজিত, সেই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও ছাত্র অমূল্যভূষণের দলে ভাগ্যগুণে আমিও পড়িয়া গিয়াছিলাম। দেবেন্দ্রনাথ ও আমি তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ মোতাবেক সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই, পীড়ারই কারণ হইয়াছিলাম। প্রকাশ্যে না হউক, ভিতরে ভিতরে সংঘাত শুরু হইয়াছিল 'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় বর্ষের গোড়া হইতেই।

ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমি গভীর শ্রদ্ধা করিতাম এবং এখনও করি। তিনি অক্লান্তকর্মা বিচক্ষণ ব্যবসায়ী বলিয়া নয়, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের নবজীবনদাতা বলিয়া নয়, কমার্সিয়াল ক্যারিয়িং কোম্পানি, বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস, মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানি এবং মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক বলিয়াও নয়, শুধু তাঁহার কলিকাতা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালার জন্য তাঁহাকে প্রণাম করি। বাস্তববাদী মিঃ ভট্টাচার্যের পরিচয় তাঁহার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিতে রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আদর্শবাদী ভট্টাচার্য মহাশয়কে আজ কেহ মনে রাখে নাই। নূতনের সংঘাতে প্রাচীন ভারতের কল্যাণকর আদর্শের বিপর্যয় দেখিয়া তাঁহাকে খেদে ক্ষোভে অশ্রুবিসর্জন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু নিছক অশ্রুবিসর্জনেই তাঁহার অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হয় নাই; তিনি তাঁহার আরাধ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠায় প্রভূত কর্মশক্তি ও অর্থশক্তিও নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহারই প্রত্যক্ষ ফল তাঁহার "কলিকাতা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা"। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচারে ও সংরক্ষণে এই প্রতিষ্ঠান চিরস্মরণীয়।

এদিকে 'বঙ্গশ্রী'র আসর দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া হইতেই আরও জাঁকিয়া উঠিল। নূতন দুইজনের আগমন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য;

শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বেই একটি গল্প ("সরীসৃপ," আশ্বিন ১৩৪০) লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রমপরিণতির কাহিনীও বিচিত্র। আমার যতদূর ধারণা, এই উপন্যাসের ভিত্তিতেই মানিকের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। মানিক তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে বলিলেও চলে। মুখচোরা লাজুক ছেলে, কিন্তু "সরীসৃপ" গল্পেই তাঁহার পোক্ত-পরিণত মনের পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ। লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত মানিক "একটি দিন" নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি "একটি দিন" সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক "একটি দিনে"র উপসংহার "একটি সন্ধ্যা" লইয়া উপস্থিত হইলেন। "একটি সন্ধ্যা"তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা "রাত্রি"তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে "রাত্রি"—"দিবারাত্রির কাব্য" হইল। এই উপন্যাসের নাম-পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে। এই উপন্যাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যস্থতায় আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় নবাগত শ্রীঅমলা দেবী: আমি যখন এম. এস-সি. সিক্স্থ্ ইয়ারে উঠিলাম, শ্রীমান ললিতানন্দ গুপ্ত ফিফ্থ্ ইয়ারে ভর্তি হইলেন ;- তিনিও আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন ৬নং বাদুড়বাগান লেনের মেসে। আমি তখন লায়েকিয়ানায় প্রবল প্রাগ্রসর, লেখাপড়া ছাড়া আর সব কাজেই আমার প্রচণ্ড উৎসাহ, সাহিত্যচর্চা তন্মধ্যে একটি। ললিতানন্দের মনে যে সাহিত্যের তুষের আগুন তখনই ধিকিধিকি জ্বলিত তাহা টের পাই নাই।. আমার সাহিত্য তখন বোলচালেই

সীমাবদ্ধ ছিল, লিখিত কোনও দলিল ললিতানন্দের কাছে দাখিল করি নাই। তথাপি তিনি কেন যে তখনই আমাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন তিনিই বলিতে পারেন। তারপর আমার বিজ্ঞান-ভারতীর সেবাইতি-ত্যাগের সঙ্গে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়, ১৯২৪ সনের গোড়াতেই। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তিনি তাঁহার বাস ও কর্ম-স্থল বাঁকুড়া হইতে গুরুকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীঅমলা দেবীর বেনামীতে একটি তীক্ষ্ণ শর প্রণামীস্বরূপ প্রেরণ করিলেন—"চন্দ্র-ডাক্তার"। প্রথমটা বিস্ময়বিমূঢ় ও আনন্দোৎফুল্ল হইলেও বাঁকুড়া ওয়েস্‌লিয়ান কলেজের বিজ্ঞান-শিক্ষক শ্রীললিতানন্দ গুপ্ত এম. এস-সি.কে ধরিয়া ফেলিতে পারিলাম। বাংলা-সাহিত্যে শ্রীঅমলা দেবীর শুভাগমন ঘটিল ফাল্গুন ১৩৪০এ প্রকাশিত "চন্দ্র-ডাক্তারে"র পিছু পিছু।

এই বৎসরে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকেও নূতন করিয়া পাইলাম, ঔপন্যাসিকরূপে। কবিতা-নাটক, ভ্রমণকাহিনী, সাহিত্য-প্রবন্ধ ও রসরচনাতেই তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা। কবে 'দেশের শত্রু' নাম দিয়া একটি অক্ষম উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি নিজেই হয়তো তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই বর্ষাস্ফীত 'পদ্মা'র উদ্দামতা লইয়া দেখা দিলেন। উপন্যাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কায়েম হইল।

ওই সংখ্যাতেই সদ্য-স্বর্গত (কার্তিক, ১৩৩৯) ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় দেখা দিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বাংলার ইতিহাস "বাঙ্গালার কথা" লইয়া। তাঁহার পুত্র ভূতপূর্ব হাইকোর্টের উকিল ও অধুনা অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এই যোগাযোগ ঘটাইলেন। ভূদেব-পৌত্রী কবি-ঔপন্যাসিক ইন্দিরা দেবীর পুত্র কবিবন্ধু শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেমন কালিম্পংয়ের পথে ট্রেনে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, ত্রিদিবনাথের সঙ্গেও ঠিক তেমনি সীতারামপুর-রূপনারায়ণপুর এই রকম কোনও স্টেশনে ট্রেনে

প্রথম পরিচয়। প্রভাতমোহনের বেলায় যেমন তাঁহার সদ্যঃপত্নী-বিয়োগকাতর পিতা এবং সহোদরারা আমাদের বন্ধুত্ব-সূত্রপাতের সাক্ষ্য ছিলেন, ত্রিদিবনাথের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়ে তেমনি তাঁহার পিতা বৃদ্ধ নিখিলনাথ সাক্ষ্য ছিলেন; একজনের কথা ভাবিতে গেলেই এই কারণে আর একজনের কথাও আমার মনে পড়ে। যাহা হউক, নিখিলনাথের "বাঙ্গালার কথা" প্রকাশের গৌরব 'বঙ্গশ্রী' দ্বিতীয় বৎসরের গোড়াতেই অর্জন করিল। দুঃখের বিষয়, বইখানি 'বঙ্গশ্রী'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ মাসে (অর্থাৎ বৈশাখ ১৩৪১ সালে) সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় আগমন রবীন্দ্রনাথের। হেমন্তবালা দেবীর দৌত্যে কাজ যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, নিজের দুর্বুদ্ধিতে গুটি প্রায় কাঁচাইয়াও আনিয়াছিলাম। ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে রামমোহন-তিরোভাবের শতবার্ষিক উপলক্ষে বর্ষকালব্যাপী রামমোহন-স্মরণোৎসবের সূত্রপাত হয়। বাংলা সাময়িক পত্র ও সভা-সমিতির ইতিহাসে ১৯৩৩-৩৪ সন রামমোহনকে, ১৯৩৬-৩৭ সন রামকৃষ্ণ পরমহংসকে, ১৯৩৮-৩৯ সন বঙ্কিমচন্দ্রকে, ১৯৪১-৫৫ সন রবীন্দ্রনাথকে এবং ১৯৫৪-৫৫ রামকৃষ্ণ-সারদা দেবীকে উৎসর্গিত। রামমোহন-বৎসরে আমরাও বিশেষ সংখ্যায় বিশেষ প্রবন্ধাদি দ্বারা তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়াছিলাম। কিন্তু অপরাধ হইয়াছিল; সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্বের অছিলায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে রামমোহন-দূষণও করিয়া বসিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং "রিফিউজড্" লিখিয়া সমোড়ক 'শনিবারের চিঠি' ও 'বঙ্গশ্রী' ফেরত পাঠাইলে কি হইবে, তাঁহার কানে এই দূষণসংবাদ দিবার খর-দূষণের অভাব হয় নাই। ফলে প্রায়-বিগলিত হিমালয় আবার শক্ত হইয়া গেলেন। কিন্তু বরফ একবার গলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে চেষ্টা করিয়া দৃঢ় রাখা কঠিন। রবীন্দ্রনাথও পারিলেন না। এইবার বরফ-ভাঙার কাজে

সাহায্য করিলেন মৎগেহিণী শ্রীমতী সুধারাণী দাস। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের "গদ্য ছন্দে"র উপর একটি বক্তৃতা-প্রবন্ধ সংগৃহীত ও বৈশাখ (১৩৪১) সংখ্যার প্রথম রচনা হিসাবে মুদ্রিতও হইয়াছিল ; কথা ছিল বীতরাগ কর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা ছাপা চলিবে না। অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রবন্ধ ছাপিয়া বসিয়াছিলাম। অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু বৈশাখের ৪ তারিখ পর্যন্ত তাহা পাওয়া না যাওয়াতে চিন্তায় পড়িয়াছিলাম। ইতিমধ্যে সুধারাণী যে নববর্ষের প্রথম দিনেই কবিগুরুকে প্রণাম প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা ছিল না, হয়তো মাসীমা হেমন্তবালা দেবীর প্রেরণা ছিল। হঠাৎ ৪ঠা বৈশাখ আপিসে গিয়াই সচিব-মারফৎ কবির অনুমতিপত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ উল্লসিতচিত্তে নববর্ষের প্রথম সংখ্যা কাগজ বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থায় মত্ত হইলাম। উল্লাসের সঙ্গে একটু বিস্ময়ও মনে উঁকি দিয়াছিল, কিন্তু তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ ছিল না। কর্মক্লান্ত দেহে রাত্রে বাড়ি ফিরিবার পথে ট্রামে বসিয়া আবার বিস্ময়ের ঘোর লাগিল। ঘোর কাটিল বাড়ি ফিরিয়া পড়ার টেবিলে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে সুধারাণীর নামাঙ্কিত খামখানি দেখিয়া। সাগ্রহে চিঠি পড়িলাম :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার নববর্ষের প্রণাম পেয়েছি, তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এই মাসের শেষভাগে আমি সিংহলে যাত্রা করব। কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তখন সজনীকান্ত যদি কলকাতায় থাকেন তা হলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তোমাকে হয় তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন।

বৎসরের আরম্ভে নানা ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘ সাত বৎসরের বিরতির পর এই চিঠিতে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম ঘণ্টা পড়িল। অনুমতি-পত্রের রহস্যভেদ হইল। খুশী হইলাম—শুধু এই কথা বলিলে সবটুকু বলা হইবে না। 'বঙ্গশ্রী'র চাকুরিগত যে ফাটল মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করিতেছিল, পুনর্মিলন-সম্ভাবনার মায়া-প্রলেপে সে অস্বস্তির কাঁটাটুকু কোথায় মিলাইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পাইলে সাহিত্য-জীবনে যে-কোনও পরিণতির জন্য আমি প্রস্তুত হইতে পারিব—এই বোধ আমাকে সাহস দিল। আমি নির্ভয় হইলাম।

ইতিমধ্যে আমার অবিমৃষ্যকারিতায় অথবা হঠকারিতায় আর একবার অন্যের ফ্যাসাদ ঘটিল। চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পরে আমার ভাবপ্রবণ মনে বেশ খানিকটা বিপ্লব ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ধূম বহ্নিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল অনেক কাল পরে "ভুলি নাই" শীর্ষক একটি কবিতায়। অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের অব্যবহিত পরে আমি কিছুকাল মৃত ও জীবিত যোদ্ধাদের ফোটো, গোপনে ব্লক প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আমার সহযোগী ছিলেন দীনেশচন্দ্র লোধ নামক এক ভদ্রলোক। কিছুকাল সর্বদা বিপদ সঙ্গে লইয়া নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে কলিকাতা-চন্দননগর করিতে হইয়াছিল। চন্দননগরের দাক্ষিণ তোরণদ্বারের মুখে একবার ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, আমাদের বাঁচাইয়াছিল তখন আমার নিত্যব্যবহৃত ট্যাক্সির চালক মদন সিং। এক রকম প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম বলিয়া ভাবলোকে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা হয় নাই। সমস্ত যখন থিতাইয়া আসিল, উৎসাহ-উত্তেজনা-উদ্দীপনা নিবিয়া ছাই হইল, তখন লিখিলাম "ভুলি নাই"। একটা টুকরা কাগজে লিখিয়াছিলাম, অনাদরে তাহা হারাইয়া গেল অর্থাৎ

ভুলিয়া গেলাম। শ্রদ্ধেয় কবি জীবনময় রায়—আমার জীবনদা যে সে টুকরা কাগজটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা আমার জানা ছিল না। 'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় বৎসরে জীবনদা কবিতাটি একদিন আমাকেই উপহার দিয়া বিস্মিত করিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, সেই দিন সেই সময়ে শৈলজানন্দ, প্রণব, পাঁচুগোপাল ও ফণীন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তখন 'ছায়া' (?) নামক সাময়িক পত্র বাহির করিতেছেন। তাঁহাদের আগ্রহে কবিতাটি তাঁহাদের সমর্পণ করিলাম। সাহিত্যিক বন্ধুদের ও পত্রিকার নাম সম্বন্ধে আমি স্থির-নিশ্চয় নহি, আশ্চর্যের বিষয় আমার ডাইরিতেও এই ঘটনার উল্লেখ নাই। তবে স্মরণ আছে, পত্রিকাটি "ভুলি নাই"-লাঞ্ছিত হওয়াতে পুলিসের কবলে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল এবং জামিনের টাকা দাখিল করিতে না পারিয়া বিলুপ্তও হইয়াছিল। কবিতাটি এই ঃ

যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি' বিক্ষুব্ধ ধূলায়
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায়া জননীর করিল তর্পণ,
মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জন।
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহু লক্ষ পরাধীন আশাহীন জনে
পথ-কুক্কুরের মত পথে পথে তাড়া খেয়ে ফিরি' দীর্ঘদিন
কেহ বা বরিল কারা, কেহ মৃত্যু—মহোল্লাসে প্রেম-আলিঙ্গনে—
স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে জীবনের সর্ব আশা করিল বিলীন।
ক্লেদপঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোক-বার্তাবহ,
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার,
ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদেরে স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ—
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার।

তাদের বুদ্ধিরে ল'য়ে শুনিয়াছি পণ্ডিতেরা করে আলোচনা,
কেহ কহে মূর্খ তারা, দম্ভসার, চলেছিল ভুল পথ ধরি,
জীবনের রাজপথে চলিতে অক্ষম তারা, কৈল আনাগোনা
অলক্ষ্য অরণ্যপথে অন্ধকারে ত্রস্তপদে দিবা-বিভাবরী—

মানব-কল্যাণ লাগি গূঢ়গুহাশায়ী হয়ে অলক্ষিত লোকে
অমৃত-সন্ধানী তারা চিরমৃত্যু-আশঙ্কায় যাপিল জীবন।
মানি না তাদের কথা, আমি জানি অনির্বাণ প্রাণের আলোকে
উদ্ভাসিত ভাল যার, মৃত্যুভীত কাপুরুষ নহে সেই জন।
লক্ষ লক্ষ অক্ষমের অপমানে আপনার অপমান মানি
সুকঠোর দৃঢ়হস্তে যে খুঁজিল প্রতিদিন তার প্রতিকার—
কাপুরুষ অপবাদ নহে তার, কভু নহে ইহা সত্য জানি
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার।

হয়তো করেছে ভুল, হয়তো বা অকস্মাৎ বিনা প্রয়োজনে
করেছে মৃত্যুর পূজা সুনির্মম, চাহে নাই প্রিয়জন পানে—
জননীর আঁখিজল শুকাইল ঝরি ঝরি বিনিদ্র নয়নে,
প্রিয়ার পাণ্ডুর ওষ্ঠ আজো কাঁপে রহি রহি রূঢ় প্রত্যাখ্যানে।
সুকোমল গৃহশয্যা ডাক দিল আজো তবু রয়েছে অম্লান,
মহামৃত্যু-সাধনায় মিটিয়াছে সন্ন্যাসীর অতৃপ্ত পিয়াস,
স্তব্ধ হ'ল আঁখিতারা, যা খুঁজেছে বুঝি তার মিলেছে সন্ধান;
মহাকাল উর্ধ্বে থাকি নেয় বলি, তবু যেন করে উপহাস।
আমরা কাঁপিয়া উঠি অকস্মাৎ বিলম্বিত আরাম-শয্যায়,
আকাশে খসিল তারা, লাভ-ক্ষতি কে গনিবে ধূলির ধরার?
তাদেরে দিও না গালি, হে শঙ্কিত, ঢাকিবারে আপন লজ্জায়,
মৃত্যু বরিয়াছে যারা মৃত্যুভয়ে তাহাদেরে কর নমস্কার।

বন্ধুবর মনোজ বসু দশ বৎসর পরে তাঁহার 'ভুলি নাই' উপন্যাসের মুখবন্ধ হিসাবে কবিতাটিকে স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন এবং বন্ধুকৃত্য হিসাবে তাঁহার গ্রন্থখানি আমাকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কবিতার মূল্য ইহার অধিক কোনও দিনই কামনা করি নাই।

বাহিরে আমি যখন সংগ্রামরত এবং ক্ষতবিক্ষত, পরিমলদা তখন বীরবিক্রমে আমার মৌলিক আশ্রয় এবং চিরদিনের কেল্লা অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে হয়তো নকল এবং আমার পক্ষে আসল বুঁদিগড় রক্ষা করিতেছিলেন। বনফুলের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহাকে সাহায্য

করিবার জন্য আরও অনেক সাহিত্যিক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বরাবরের জন্য শনিগোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছেন।

গোড়াতেই বলিয়াছি, অবলোকন এবং পর্যবেক্ষণ-পর্ব আমার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। দেখিবার অনেক তবু বাকি ছিল; ১৬ই চৈত্র (১৩৪০) তালতলা-সাহিত্য-সম্মেলনীর সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে যোগ দিয়া কিছু দেখিলাম। ডক্টর সুশীলকুমার দে সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে "বর্তমান সাহিত্য-সঙ্কট" শীর্ষক ভাষণ দিলেন। পরবর্তী বৈশাখে 'বঙ্গশ্রী'তে তাহা মুদ্রিত হইল। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রমুখ সুশীলকুমারের কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরিচিত হইলাম। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর সহিত পুরাতন সম্পর্ক ঝালানো হইল। গিরিজাশঙ্কর রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া আমার জীবনে নূতন সঙ্কটের সৃষ্টি করিলেন। সাহিত্য-সঙ্কট নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জীবন-সঙ্কট হইয়া উঠিল। অনেক দেখিলাম, অনেক শিখিলাম।

নূতন কিছু শিক্ষা লাভ হইল সাহিত্যিক-চক্রে বসিয়া। সন্ধ্যায় বসিত গল্পচক্র—পুরোহিত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্থান কখনও 'বঙ্গশ্রী' আপিস এবং কখনও প্রিন্সেপ ঘাটের দুই দিকের দুই সিংহের পৃষ্ঠদেশ। অশোক চট্টোপাধ্যায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান রায়, কবি সুবল মুখোপাধ্যায় ও আমি এই চক্রে শৈলজানন্দের শিষ্য ছিলাম। শিষ্য অশোক রাজা-উজির-মারা গল্পে গুরু শৈলজানন্দের সহিত পাল্লা দিতে পারিতেন। চক্রের উপকরণ ছিল ধূম। শৈলজানন্দের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে আমাদিগকে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল করিয়াছিল, তখনই অবজেকটিভ সাবজেকটিভ হইবার পথ খুঁজিতেছিল।

একটু অধিক রাত্রে বসিত কবিতাচক্র—এই চক্রে প্রেমেন্দ্র প্রধান; নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, কিরণকুমার ও আমি শিষ্য; অধিবেশন বসিত কখনও কালীঘাটে, কখনও হাওড়ায়। ধূম কবিতার বকযন্ত্রে

পরিস্রুত হইয়া তরল-মধুররূপে মদালস-আবেশের সৃষ্টি করিত। আবৃত্তির মুখে কবিতার পংক্তির পর পংক্তি আবর্তিত হইয়া ফিরিত— তাহার মূল সুর হইতেছে—"বহুদিন মনে ছিল আশা—"। হাওড়া হইতে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময় হাওড়ার পুরাতন পন্টুন ব্রিজকে আমাদেরই মত অসংলগ্ন দেখিতাম। গঙ্গা পার হইবার কালে প্রেমেন্দ্র-নৃপেন্দ্রের কাব্যোচ্ছ্বাসে তরণী টলমল করিত। তারকাকামী পতঙ্গের ডানায় ভর করিয়া নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া বাড়ি ফিরিতাম।

এই ধরনের নানা উপকরণসমৃদ্ধ আমার মন ধীরে ধীরে বহির্বিশ্ব হইতে সংবরণ করিয়া অন্তর্লোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রুজি-রুটির ভাবনা প্রায় মিটিয়া আসিয়াছিল বলিয়া অর্থাৎ নিরাপদ হইতেছিলাম বলিয়া আমার চিত্ত আবার অশান্ত হইয়া বিপদ খুঁজিতেছিল। চাকরির ঠুলি-বাঁধা চোখে ঘানির চারিদিকের অভ্যস্ত পথে বারংবার আবর্তিত হইতে হইতে বুকে বিদ্রোহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। দড়ি ছিঁড়িয়া ঠুলি খুলিয়া অনভ্যস্ত পথে উদ্দাম হইয়া ছুটিবার দুষ্প্রবৃত্তি মনের মধ্যে প্রবল হইতেছিল। অমৃতে যাহার অরুচি, কালকূট তাহাকে পান করিতেই হইবে। আত্মদর্শন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল; চারিদিকে যাহা দেখিয়াছিলাম, আমার কবিমানসে তাহাই রূপ লইয়াছিল (ফাল্গুন, ১৩৪০) এইভাবে:

পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
বিলাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলুষিত হয়েছে যাহারা,
লোভে ক্ষোভে জিহ্বা-মুখে যাহাদের ঝরিছে নিয়ত
দূর হতে লালাস্রাবী প্রেম,
লোলুপ ছেলের মত জীবনেরে ভালবাসে যারা,
জীবনেরে ভালবাসে, ভালবাসে আর করে ভয়—
দু কথা তাদেরে কহি, পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।

রৌদ্র নাহি ভালবাসে, মাথার উপরে ঘোরে পাখা,
কেঁদে যায় আকাশের হাওয়া।
ছবির মেঘের বুকে দেখে তারা সিনেমার চাঁদ,
স্টুডিও-উইয়ের-ঢিবি হিমালয়ে করিছে আঁধার।
জলপূর্ণ কাচপাত্রে তাহাদের নীলাম্বু-বিস্তার,
উঠানের টবে হেরে বারিধির উন্মত্ত নর্তন;
সাগরে জলের ঢেউ আছাড়িয়া তটেরে কাঁদায়।

বালুময় বেলাভূমে ছাতার আড়ালে রহে তারা,
সেথাও ড্রইংরুম-প্রেম।
তাদের বসন্ত আসে, ঝরে না গাছের মরা-পাতা,
রঙে সাজে কাগজের ফুল,
নিখুঁত জ্যামিতি-কষা 'বেডে' ফোটে ফুল মরসুমী—
অপরূপ নাম তাহাদের;
সে নাম যাহারা শোনে, মালীরে ধূলার দিয়ে দাম,
তাহাদের কানে কানে শোনাব মৃত্যুর শতনাম।

দশ ধাপ সিঁড়ি উঠে, বেঞ্চ-পাতা 'হলে' যাহাদের
নির্লিঙ্গ দেবতা শোনে চোখ বুজে অর্গ্যানে কোরাস;
তত ধর্ম যত ওঠে হাই,
চর্মের ভ্যানিটি-ব্যাগে দর্পণেতে দেবতার ছায়া,
আমি সেই দেবতার দেখিয়াছি মৃত্যুর স্বরূপ—
ধূলি বালি কর্দম কঙ্কর।
মর্মর-বেদীর 'পরে দেখিয়াছি হাসিছে করোটি—
দেবতা মৃত্যুর পাত্রে পান করে জীবন-আসব—
পান করে, হাসে খলখল।
পমেটম-ক্রীম-ঢাকা চর্মে হায়, লাগে না শিহর,
কর্ণে নাহি পশে অট্টহাসি!
ধর্মের মন্দির-গর্ভে চিতাধূম দেখিয়াছি আমি—
প্রেমের বেদিকামূলে লেলিহান মৃত্যুর রসনা—
মহাকাল-করাল-ভ্রূকুটি।

মায়া-মোহ-যবনিকা ধীরে ধীরে করি উত্তোলন
জীবনের রঙ্গমঞ্চে দেখাব মৃত্যুর অভিনয়—
মৃত্যুরে করিয়া নমস্কার।

স্বার্থের উদ্দাম লীলা লালসার উলঙ্গ মত্ততা,
প্রেমের মুখোশ পরি কি বীভৎস কামের কলুষ!
সন্তান গড়িয়া তোলে অর্থলোভী আয়ার সাধনা;
ক্লীব স্বামী ঔদার্যের ছলে
পত্নীরে তুলিয়া দিয়া পরের মোটরে
পর-অর্থে চালায় সংসার।
... ..., ...
শিশুর পীযূষ-স্তন্য চাটিতেছে দন্তহীন বৃদ্ধের রসনা।
যে মরিবে সে মারিছে যে বাঁচিবে তারে;
গুরুভক্তি পিতৃভক্তি বংশের সম্মান,
বিরূপ বীভৎস হয়ে জীবনের রোধিয়াছে পথ।

একের লালসা—
অর্থবল, লোকবল, অসহায় দরিদ্রেরে অন্ন-দানবল,
পদ-প্রতিপত্তি আর ক্ষুধিতের উদরের ক্ষুধা,
দরিদ্রের স্ত্রীকন্যার বস্ত্র-অলঙ্কারে অভিরুচি,
মোটর-ব্যসন আর হোটেল বিলাস—
সব কিছু মিলিয়াছে মিটাইতে একের লালসা
বহুরে বঞ্চিত করি।
এক কাম-বহ্নি মাঝে বহু প্রেম দিতেছে আহুতি;
দগ্ধ-প্রেম-ভস্মে জন্মে উদরের সামান্য সংস্থান।

রমণীর মাতৃত্বেরে দিকে দিকে করিছে সংহার
পুরুষের বিকল পৌরুষ;
বক্ষে ক্ষীর আসিতে না পায়।
দেহ-বেচা অর্থে মাতা সন্তানের দুগ্ধ করে ক্রয়—
দেহ-জাত হায় রে সন্তান!

যুগযুগান্তর ধরি পৃথিবীর মানবের শিশু
কাঁদিছে মায়ের কোলে বসি—
মাতা অসহায়—
সাম্রাজ্য ফ্যাক্টরি মদ আফিম কোকেন
তাড়িখানা রেস্তোরাঁ হোটেল
পথে পণ্যরমণীর ক্ষুধার্ত ইঙ্গিত—
সভ্যতার রথচক্র ঘর্ঘরিয়া ছুটিছে উদ্দাম।
লোভী ছেলে ছুটে যায় পথে,
জননীর চোখের সম্মুখে
রথচক্রতলে তার ছিন্নভিন্ন দেহ—
রক্তস্রোতে কর্দমাক্ত ধূলি।
সে লোহিত ধূলিজালে দেবতার মহান প্রকাশ—
অপরূপ মৃত্যুর বৈভব।

চারিদিকের এই বীভৎস বিকৃতি এবং আসন্ন ধ্বংসের মধ্যে আমার মন কিন্তু কালকূটপায়ী মৃত্যুঞ্জয়ের সন্ধান পাইয়াছিল। সে দমে নাই বা মুহ্যমান হয় নাই। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছিল :

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়।
দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার শিবের জটাজাল,
আকাশ আঁধার করে অঙ্গের বিভূতি…
দিকে দিকে থৈ থৈ মৃত্যুর তাণ্ডব
তারি মাঝে জীবন-অঙ্কুর
শাখাপত্র পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
প্রলয়ে করে না ভয়, দাঁড়ায়ে মৃত্যুর মুখামুখি
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

এদিকে আমার অশাস্ত্রীয় জীবনযাত্রার কাহিনী পোলক স্ট্রীটের বাসবলোক পর্যন্ত পৌছিয়াছিল, ইঙ্গিতে সতর্কবাণীও আসিয়াছিল ; আমি ভয় পাই নাই। কবিতায় জবাব দিয়াছিলাম—আশ্বিনে (১৩৪১) "বজ্র-আশীর্বাদ" ছাপিয়া। আসলে ইহা আমারই চিরন্তন

দেব-সংস্কারের সঙ্গে বোঝাপড়া—সুখশান্তিময় নন্দনের জীবনের সঙ্গে চিরচলমান শাশ্বত মানবজীবনের আপোসহীন সংগ্রামের কবিতা :

হান বজ্র, বজ্র হান, মেঘলোকবাসী হে বাসব,
বজ্র হান আমাদের শিরে।
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
সুদুর্মদ অহঙ্কারে শূন্যপানে আস্ফালিয়া বাহু,
মেঘলোকে তুলি শির উচ্চকণ্ঠে কহিতেছি ডাকি—
ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি—আর কেহ নাই,
সৃজিয়া নিখিল বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে ;
জন্ম আর মৃত্যু—এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।
ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যের করি না সঞ্চয়,
যাহা আছে, যাহা পাই, মুঠি ভরি উড়াই ফুৎকারে,
অনন্ত কালের বক্ষে ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস!

তোমরা উর্ধ্বেতে থাক হে দেবতা নন্দননিবাসী,
উর্ধ্ব হতে আমাদেরে কর কর বজ্র-আশীর্বাদ—
হান বজ্র আমাদের শিরে।
আমরা মরিতে চাই, মরিয়া বাঁচিতে চাই মোরা—
ধরার মৃত্তিকাবক্ষে পদচিহ্ন নিমেষে মিলায়—
অনন্ত অশেষ প্রেম তাও ধীরে শেষ হয়ে আসে।
ক্ষণকাল পূজা করি অতি ব্যর্থ স্মৃতির মন্দিরে
স্মৃতির শ্মশানভস্ম কালস্রোতে ফেলে দিই টানি।
মনে রাখি, ভুলে যাই, ভালবাসি, ঘৃণা করি, পুন
যাহারে ঠেলিয়া ফেলি তারি লাগি কাঁদিয়া ভাসাই।

যে দুঃখ-দারিদ্র্য বেদনা-পীড়ন ক্ষয়-ক্ষতি-মৃত্যুর মধ্য দিয়া মানুষের পথচলা, সেই সব কিছুকে উপহাস-উপেক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত জয় করিয়াই তাহার গৌরব, তাহার আনন্দ—পূর্বাপর মানুষের ইতিহাস

এই সাক্ষ্যই দিয়াছে। অবলোকন-পর্যবেক্ষণের ফলে আত্মচিন্তা করিয়া আমি ধীরে ধীরে সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছিলাম। ইতিপূর্বে অনিশ্চিত অন্ধকার পথের ভয়হরণ-মন্ত্ররূপে "আমি"র যে স্তুতি উচ্চারণ করিয়াছিলাম, তাহারই পরিণত ও সংহত রূপ এই "বস্ত্র-আশীর্বাদ" :

আপনারে উৎসারিয়া আবরিয়া ফেলি এ নিখিল,
ভেঙে-চুরে চ'লে যাই নিঃশঙ্ক গর্বান্ধ পদাঘাতে,
দলিয়া পিষিয়া মারি নিজ হাতে আপনার জনে ;
নির্মম কুঠার হানি সম্মুখে রচিয়া চলি পথ,
পিছু ফিরে অকারণ খলখল হাসি অট্টহাসি।

সবারে পশ্চাতে ফেলি দূরে গিয়ে ফেলি অশ্রুজল।
হতাশায় ভেঙে পড়ি, পথ ছেড়ে হই যে বৈরাগী ;
মনে হয় মিথ্যা সব, কিছুতে নাহিক প্রয়োজন।
চোখে পুন লাগে রঙ, ধরা পড়ি, করি যে শিকার,
প্রিয়ে করি প্রিয়তর, প্রেয়সীরে প্রিয়তমা করি।
মদিরাবিহ্বল নেত্রে মধ্যরাত্রে পূজি বারাঙ্গনা,
শুচিস্নান করি প্রাতে দেবীর মন্দিরে দিই পূজা।

এও ক্ষণিকের খেলা, মৃত্যুর বধির অন্ধকারে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই অলক্ষিতে সহসা একদা।
ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ, এক যায়, পুন আর আসে,
শ্মশানের শুষ্ক চরে পলি পড়ে, ফসল গজায়—
পাষাণে জলের লেখা—মানুষের এই ইতিহাস।

মানুষের মহামানবীয় রূপ তাহার মৃত্যুর মধ্যে ; মৃত্যুকে সে যেখানে ভয় করে নাই সেখানেই সে বাঁচিয়াছে। নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে, প্রগল্ভ বিলাসের মধ্যে এই সত্য সেদিন উপলব্ধি করিয়া আমার আত্মঘাতী মানুষ-সত্তা নিজেকে নিঃসহায়-নিরাবরণ সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আর একবার আত্মপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত

হইতেছিল। সঙ্কটের রকমটা তাহার জানা ছিল না, শুধু আরামটা তাহার সহিতেছিল না। এক কথায়, বিপদ ডাকিয়া আনিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। নিজেকে সাহস দিবার জন্যই যেন লিখিয়াছিলাম :

শাশ্বত নন্দনে তব, হে বাসব, কে আছে দেবতা—
পড়ে পাষাণের লেখা, গনে মর-জীবনের ঢেউ ?
কেহ নাই, নিঃসঙ্কোচে হান হান হান বজ্রবাণ,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
মরিতে করি না ভয়, যুগে যুগে মরিয়াছি আমি—
আমার গগনস্পর্শী স্পর্ধা কত মিশিল ধূলায়—
কত উর, বাবিলন, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কার্থেজ,
যুগে যুগে কত জাতি জন্ম নিল, মরিল নিঃশেষে—
ফারাও, কাইসার কত, শার্লমেন, চেঙ্গীজ, তৈমুর—
পাষাণ-মর্মর মূর্তি কারো আছে, কারো পড়ে ভেঙে,
স্মৃতি সে পাষাণ-ভার বিস্মৃতির প্রত্যন্ত-সীমায়।
বাঁচিবারে চাহি নাই, বাঁচি নাই শামুকের খোলে,
শাখা ত্যজি ধরাপৃষ্ঠে নামিয়াছি মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায়,
মেঘচুম্বী দেবলোকে মুহুর্মুহু হানিতে কুঠার
করেছি আকাশ-যাত্রা কামনার ডানা ঝাপটিয়া।
সাগরে ভাসাই তরী, ডুবিয়াছি গহন গভীরে
অতিকায় জলসর্প শুয়ে যেথা প্রবাল-শয্যায়।
মরুপথে অভিযান, ঘনারণ্যে শ্বাপদ-গুহায়,
মর্ত্যের মৃত্তিকা খুঁড়ি নন্দনের মাণিক্য-সন্ধান,
হিমাচল-শৈলচূড়ে মৃত্যুসাথে যুঝি বারম্বার,
তুষারেতে পদচিহ্ন মুছে যায় হিমমেরুপথে।
বহ্নিরে করেছি বন্দী, অশনি শোনায় মোরে গান,
সে গানের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ মৃত মানবের
উঠিতেছে অবিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী জয়োল্লাসধ্বনি!
তুমি কি শুনিতে পাও, হে বাসব, সে জয়-সঙ্গীত?
তোমারে উপেক্ষা করি মানবের এই অভিযান

স্নেহচক্ষে দেখিয়াছ, অতি লুব্ধ মানব-সন্তানে—
আমারে—করেছ ক্ষমা ?

দেখিয়াছ, হে দেবতা, যুগে যুগে কর আশীর্বাদ,
রূঢ় বজ্র হানিয়াছ বারম্বার মানবের শিরে—
আজো হানিতেছ তাহা উর্ধ্বে থাকি প্রবল বিক্ষেপে,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
স্পর্ধা মোর ভাসায়েছ কতবার প্রলয় প্লাবনে,
ফুঁসিয়া বাসুকী তব বারম্বার নাড়িয়াছে মাথা,
আমারে ঢাকিয়া গেছে লাভাস্রোত আগ্নেয়গিরির,
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কত তরী ডুবিল অতলে,
কত গৃহ উড়িল ঝঞ্ঝায়—
কত বজ্র হানিয়াছ যুগে যুগে মহামারী-রূপে।
কি তাতে হয়েছে ক্ষতি, হে বাসব ? এরি মাঝখানে
আমার প্রচণ্ড দম্ভ বারম্বার হাসে অট্টহাসি।
এরি মাঝখানে
মহাযুদ্ধে বারম্বার আপনারে করেছি হনন···
শ্যামল ধরণীবক্ষ করিয়াছি মৃতের শ্মশান।
আত্মঘাতী দম্ভে মোর, হে দেবতা, ওঠ না শিহরি ?
কর নাকি বজ্র-আশীর্বাদ—
তোমার প্রচণ্ড বজ্র পড়ে নাকি নিষ্ফল-হুঙ্কারে
অসতর্ক অসহায় আবরণহীন এই মানুষের শিরে ?

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

। নির্ঘণ্ট ।